প্রকাশক
মালা পাবলিকেশন্‌স্‌
আশিসকুমার বর্ধন
৫১, কালীনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রকাশকাল—জন্মাষ্টমী—১৩৫২

মূল্য—কুড়ি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

লেখকের কথা

দম্পতি যেখানে দাম্পত্য কলহও সেখানেই। একঘেয়ে জীবনে দাম্পত্য কলহ টনিকের কাজ করে। রাগ অনুরাগ, মান অভিমান, ঝর ঝর অশ্রুজল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস--বেদনা বিধুর করে তোলে ওদের। আর তখনই পরস্পরের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে ওরা। ওদের মিলন ঘটে। এই ঘটনাকে উপজীব্য করে নানা ভাষায় কত শত কাব্যকাহিনী, গল্প গাঁথা রচিত হয়েছে আদি কাল থেকে।

কিন্তু বর্তমান প্রগতির যুগে এর ব্যতিক্রম প্রায়শঃই চোখে পড়ে। এই মতান্তর ঘৃণা বিদ্বেষে পরিণত হয়ে মনান্তর ঘটায়, বিচ্ছেদের সূচনা করে। তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে দু'জনের মধ্যে এক তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশই এর প্রধান কারণ। বন্ধুভাবে দম্পতির জীবনে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ গোপন বাসনা চরিতার্থ করতে বিভ্রম সৃষ্টি করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে, ছেদ ঘটাবার প্রয়াস পায়।

রমা, দিবাকর ও কাজলকে নিয়ে এই ত্রিকোণ কাহিনী রচিত হলেও প্রাসঙ্গিক ভাবে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে তথাকথিত চরিত্রহীনা অপর্ণা, এসেছে মনসুর আলী, এসেছেন পাঁচ আলির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মহালদার খান সাহেব। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে এদের কারুর অতীতই পরিচ্ছন্ন নয়। তাই বলে এঁরা অসৎ নয় মোটেও। বরঞ্চ মানবিকতা ও হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে সাধারণ থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে বিচরণ করেন এঁরা।

দেশ বিভাগের করুণ কাহিনী এর পশ্চাদ্‌পট। ছোট্ট একটি সত্যকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ঘটনা প্রবাহ—আগমন ও নিষ্ক্রমণ ঘটেছে পাত্র পাত্রীর।

বিদগ্ধ পাঠক সমাজে এ কাহিনী প্রবেশের ছাড়পত্র কখনই পেতো না, যদি শ্রীমান আশিস বর্ধন উৎসাহ ভরে প্রকাশনার দায়ীত্ব ঘাড়ে তুলে না নিতেন, এ জন্য অপরিসীম কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছে। কৃতজ্ঞতা জানাই ইন্দ্রলেখা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পরেশ পান মহাশয় এবং তাঁর প্রেসের কর্মীবৃন্দকে।

২০ শে শ্রাবণ রবীন্দ্র বাগচী

কল্যাণি,

অবসর সময়ে আপন খেয়ালে পাতার পর পাতা লিখে ঘরের কোণে জঞ্জালই জড়ো করেছি, সম্পূর্ণ করিনি কোনটাই।

সেই জঞ্জাল ঘেঁটে ছিন্নভিন্ন অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি কুড়িয়ে এনে সম্পূর্ণ করার জন্য তাগিদের পর তাগিদ দিয়ে এসেছ। বাধ্য হয়ে কলম হাতে নিয়েছি।

তারই প্রথম ফসল "ঝড়ের পরে" তোমার হাতেই তুলে দিলুম।

তোমারই

রবীন্দ্র বাগচী

"না দিদি ভাই, আর দেরী করা যায় না। রাত অনেক হলো। আজ বরং আমরা উঠি। জামাইবাবুকে বলে রেখো রোববার সকালের দিকেই আমরা আসছি—"

"আর একটু বসে যা ভাই। ওর আসবার সময় হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে—" নিখিলের দিকে চেয়ে রমা বলে। রমার কথায় সায় দিয়ে কাজল বলে– "এতক্ষণই যখন বস্‌তে পেরেছি—আরও আধ ঘণ্টা বস্‌তে দোষ কি ? সাড়ে আটটা মোটে বাজে—" বল্‌তে না বল্‌তেই দূরে মটর বাইকের গর্জন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রমা বলে, "ঐ সে আস্‌ছে" —তারপর ম্লান হাসি হেসে বলে, "এই হয়েছে এক যন্ত্রণা। কিছুদিন আগেও এমন ছিল না। সময় মতো কাজে বেরুনো, বাড়ী ফেরা—এ অভ্যাস যে কোথায় উবে গেল ভগবানই জানেন। টাকার নেশায় মেতে উঠেছে। ক্লাব নিয়ে এক সময় মাতামাতি করতেন—বিরক্ত হতাম বাড়াবাড়ি দেখে। কিন্তু সে পাট কবে উঠে গেছে— ।"

মটর বাইক ঠেলে বারান্দায় তুলে দিবাকর ঘরে এসে ঢোকে। রমার সঙ্গে আলাপচারী দুটি তরুণকে দেখে চমকে ওঠে দিবাকর। কিছুদিন আগেও রমার প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল জলসা বা গান বাজনার আসর, চল্‌তি ভাষায় যাকে বলা হয় বিচিত্রানুষ্ঠান অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সে কোন উপায়ে সব রকম বাধা বিপত্তি এড়িয়ে এই সব অনুষ্ঠানে এগিয়ে যাবার ওর ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি। এর জন্যে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে অনেকবারই ; তবু পিছিয়ে আসেনি রমা। সৌভাগ্যের কথা, বিগত দেড় বছর ধরে এ নেশা স্তিমিত হয়ে এসেছে কার্য-কারণে। কিন্তু যা স্বভাব আবার নতুন করে জড়িয়ে পড়লে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই অপরিচিত দুই তরুণকে দেখে একটু ভাবিত হয় দিবাকর।

ঘরে ঢুকতেই রমা বলে, "বড্ড দেরী করছো বাড়ী ফিরতে আজকাল। এঁরা তখন থেকে বসে আছেন তোমার জন্যে। এসো, বসো, পরিচয় করিয়ে দিই। এই যে দেখ্‌ছো—এ হলো নিখিল মজুমদার–, গানুর বন্ধু ছেলেবেলা থেকে। তখন আমাদের বাড়ীই ছিল এর ঠিকানা।

এখন কিন্তু মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ গ্ল্যাকসোর—। আর এই কাজল ব্যানার্জী গানুর পরিচিত ও বন্ধু। এখানে নিউ ইণ্ডিয়া এস্যুরেন্সের বর্তমান ফিল্ড অফিসার। মাস কয়েক আগে জয়েন করেছেন—" তারপর দিবাকরের দিকে ইঙ্গিত করে বলে— "আর ইনি হলেন—" কথা শেষ করতে পারে না। বাঁধা দিয়ে কাজল বলে— "আর বল্‌তে হবে না। আমরা এমনিতেই বুঝে নিয়েছি।" উঠে দাঁড়িয়ে বলে— "নমস্কার দাদা, গানুবাবুর সঙ্গে দার্জিলিংয়ে দেখা ও পরিচয়। আমি ডিব্রুগড়ে আছি আর নিখিলও এখানেই কাজে যোগ দিচ্ছে, তাই আপনার নামে চিঠি দিয়ে বল্লেন—"। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে দিবাকর। উৎসাহের সঙ্গে বলে—"ঠিক আছে—ঠিক আছে—চিঠির প্রয়োজন কি? গানুর বন্ধু এ পরিচয়ই যথেষ্ট? কি বলো রুমা—এক ঘেয়ে নিরামিশ জীবনে একটু অম্ল মধুর স্বাদ!" "না দাদা। সে গুড়ে বালি। নিখিলের কথা আলাদা, আমি কিন্তু এসেই বৌদি-ঠাকুরপো সম্পর্ক চালু করে দিয়েছি—" সুদর্শন কালোপানা ছেলেটি হেসে বলে।

"তাই বুঝি? হায় রে কপাল আমার" —হতাশার সুরে বলে দিবাকর। সবাই সমস্বরে হেসে ওঠে। দিবাকর বলে, "তোমরা একটু বসো ভাই। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় জামা পাল্টে আসি।"

আত্মীয়তার জের টেনে এ বাড়ীতে তাদের আনাগোনা শুরু হলো। দিবাকর কাজের মানুষ—। বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে কাজে কর্মে—ঘরের বাইরে! বৈচিত্র্যহীন জীবনে এদের আগমন, রমার জীবনে আনে নূতনত্বের স্বাদ।

সহরের অপর প্রান্তে এক নাম গোত্রহীন হোটেলে আপাততঃ এদের বাস। মনোমত ছোটখাটো বাড়ী পেলে—দুজনে মিলে থাকবে তাই তাদের ইচ্ছে। রমার তাড়নায় দিবাকর ওদের আশ্বাস দিয়েছে যে সুবিধা মত বাড়ী খুঁজে দেবে।

অবশেষে একদিন বাড়ীতে পা দিয়ে দিবাকর রমাকে জানালো যে বাড়ী একটা পাওয়া গেছে। ওদের পেছনের বাড়ীটাই খালি হয়ে যাচ্ছে এ মাসেই। ওরা দেখুক। যদি পছন্দ হয়—তবে সহজেই বাড়ীটা পাওয়া যাবে। একটু পুরনো বটে, তবে মেরামত করে নিলে খুব খারাপ হ'বে না।

বাড়ীটা পছন্দ হলো। প্রয়োজনীয় মেরামত সেরে কাজল ও নিখিল এসে বাড়ীর দখল নিল। সংসারের হাল ধরলো বৃদ্ধ দীননাথ, দিবাকরেরই পরিচিত লোক। কিন্তু বাড়ী সাজানোর ব্যাপারে রমার অবদান অনেক খানি। রান্নাঘরের উনুন থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র মায় খাট, চেয়ার টেবিল আয়না, কোনটা কোথায় থাক্‌বে, কি রংয়ের পর্দা হবে—সবই রমার নির্দেশ মতোই হলো।

কাছে আসার পর, ওদের বিশেষ করে কাজলের যাতায়াত হলো নিয়মিত ও অবারিত। সময় অসময়ের রইলো না কোন বালাই। কাজের ধান্ধায় ওদের বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। সারা আপার আসাম ওদের এলাকা। এক নাগাড়ে দশ পনেরো দিন বাইরে ঘুরে, ঘরে ফিরে আসে ওরা। তারপরই শুরু হয় বিশ্রামের কাল। এই সময়ই ওরা তৈরী করে কাজের রিপোর্ট, পাঠায় হেড অফিসে—। সঙ্গে সঙ্গে বসে রমা বৌদির বাড়ীতে চা বা কফির কাপ সামনে নিয়ে চুটিয়ে আড্ডা।

দুপুরে বাড়ী এসে দিবাকর যেদিন দেখে রান্নাবান্না তখনও শেষ হয়নি রমার, বুঝতে পারে কাজল বা নিখিলের বিশ্রামের কাল হয়েছে শুরু। তাড়া দিয়ে গেছে ওদের কেউ। তাই সময় মতো রান্না করে উঠতে পারেনি রমা।

এই উৎপাতের জন্য মাঝে মাঝে মৃদু বিরক্তিপ্রকাশ করেছে দিবাকর। কিন্তু রমা বলে, "আহা, একা নিঃসঙ্গ ওরা! আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এই দূর বিদেশে একটু স্নেহের আশ্বাস পেয়ে যদি ওরা আসে—, কি এমন ক্ষতি হবে? হাজার হলেও ওরা তো গানুরই বন্ধু?" কথাটা যুক্তিহীন নয়। তাই শুধু বিরক্তি চেপে যাওয়াই নয়, রমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও রান্নাবান্নার জন্য সুখেনকে কাজে বহাল করে দিবাকর।

সংসারের দায়-দায়িত্ব সবই রমার। ঝি একটি আছে বটে—কিন্তু তার পেছনে লেগে না থাক্‌লে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না। বাঁধা সময়ের কাজ। সময় হলেই 'যাই, যাই' শুরু হয়। আছে রামলাল—ছাপড়া জেলার লোক। বাজার হাট করে, ফাই ফরমাস ঘাটে, দীপুকে

স্কুলে নিয়ে যায়—নিয়ে আসে। তাছাড়া বাড়ীর সংলগ্ন খালি জমিতে তরি-তরকারী ও ফুলের বাগানের তদারকি করে সে। বাড়ীর পেছন দিকে ছন বাঁশের কাঁচা ঝুপড়ী ঘরে ওর আস্তানা। স্বপাকে আহার করে। সুখেন নিজের বাড়ীতেই থাকে। সময় মত দুবেলা আসে যায়। ভোরে এসে চা জলখাবার দিয়ে রান্না চাপায়। দুপুরে সবাইকে খাইয়ে এবং নিজে খেয়ে বাড়ী চলে যায়। বিকেলে এসে চা জলখাবার খাইয়ে রাতের রান্না শেষ করে টেবিলে সাজিয়ে, খেয়ে দেয়ে নিজের বাড়ী চলে যায় রাত নটা সাড়ে নটায়। রমার দায়িত্ব এদের উপর তদারকি করার। তাড়া দিয়েও তা সম্পন্ন করতে অসুবিধা হয় না রমার।

সঙ্গীতে অসাধারণ কুশলতা আছে, কিন্তু চর্চ্চার নেই উৎসাহ। সু-কণ্ঠ সুরেলা গলার জন্যে সুনাম অর্জন করেছে। ফলে সহরের এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে প্রধান শিল্পীর ভূমিকায় তার নাম বাঁধা। রমা মুখিয়েই থাকে। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো প্রশংসা ও হাততালি পাবার নেশায় যেন সে মাতাল। তখন কোথায় সংসার, কোথায় কি ?

প্রাক-বিবাহ জীবনের কঠিন বাধা নিষেধের ডোরে দিন কেটেছে তার। স্কুল ছাড়ার পর সঙ্গী সাথীরা যখন নামী দামী কলেজগুলিতে ভর্তি হয়েছে। সহশিক্ষার ফুরফুরে হাওয়ায় প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়িয়েছে, তখন দল ছাড়া করে একমাত্র তাকেই ভর্তি করে দেওয়া হলো বাড়ীর ধারের এক কলেজে, সেখানে শুধু মেয়েরাই পড়ে।

অদ্ভুত সুন্দর সুরেলা মিষ্টি গলা। সহজেই গলায় গান তুলে নেবার অপরিসীম ক্ষমতা। কিন্তু অভিভাবকদের নিস্পৃহতায়, উপযুক্ত যত্নের অভাবে সঙ্গীত সাধনা হলো না সার্থক। তখন সদ্য নারী প্রগতির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু হলে কি হবে ? প্রাচীন-পন্থী অভিভাবকবৃন্দ চাননি তাঁদের অপরূপ রূপসী এই কন্যাটি দলে পড়ে বয়ে যাক্। ফলে এলেন এক পক্ককেশ বৃদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষক। কিছু ভজন ও ভাঙা কীর্তন শিখলো রমা এঁরই তত্ত্বাবধানে। কিন্তু রেডিও ও গ্রামোফোন শুনেই শেখা হলো রবীন্দ্র সঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গান। যদিও গলা ছেড়ে সে সব গান গাইবার ছিল না যথেষ্ট সাহস।

পাড়ার পূজো বা অন্য কোন উৎসবে গান গাইবার আহ্বান এসেছে কিন্তু অনুমতি মেলেনি অভিভাবকবৃন্দের। পারিপার্শ্বিক প্রগতিশীল দুনিয়ায় বাস করেও প্রাচীন রীতি-নীতির মধ্যে সে বুড় হলো। তারপর মাত্র এক বছর কলেজের পড়া শেষ হ'তে না হতেই বিয়েরই পিঁড়িতে বসতে হলো তাকে।

মেয়ের পছন্দ-অপছন্দের দিকে নজর দেবার তাগিদ ছিল না অভিভাবকদের। তাঁরা দেখেছিলেন শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ও সম্পদ-শালী পাত্র যার হাতে পড়ে দুধে ভাতে থাকবে তাঁদের মেয়ে। পুরুষের আবার রূপের বালাই আছে নাকি? শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান হলেই হলো। নাই বা হলো কটা রং, টেরী বাগানো রাজপুত্রের মত চেহারা। এসব কি ধুয়ে খাবে? ছেলের স্বাস্থ্য অতি চমৎকার, দীর্ঘদেহ, পুরুষালি চেহারা, উপার্জন ভাল, বংশ ভাল, আর আছে পুরুষানুক্রমিক বিপুল সম্পত্তি ও সম্পদের ভার। আর কি চাই? মেয়ের পছন্দ? "ঐটুকু মেয়ের আবার পছন্দ কি? ভাল-মন্দের কি বোঝে সে? আমাদেরই মেয়ে তো সে? সুতরাং তার শুভাশুভের দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা কি মরে গেছি?"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ভয়াবহ কোলকাতা-দাঙ্গার ঠিক পরে উনিশে নভেম্বর সন্ধ্যায় সপ্তদশী রমা অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্র দিবাকরের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে তাকে স্বামীত্বে বরণ করলো।

শ্বশুরবাড়ীও আধুনিক নয়। যৌথ পরিবার। শাশুড়ী ননদিনী পরিবৃতা হয়ে একহাত ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকিয়েই দিন কাটে তার। দিনমানে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা কথা বলা এঁদের পারিপারিক রীতি বিরুদ্ধ। ওকে জব্দ করতেই সবাই যেন ওৎ পেতে আছে। সামান্য-সুযোগে ছোবল মারতে কারুরই বাঁধে না। ভয়ে উৎকণ্ঠায় দুরু দুরু বুকে কাটে তার দিন।

শুধু গভীর রাত্রে স্বামীর বিশাল বুকে মুখ গুঁজে শান্তি পায় সে। এই একটি লোক যার পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সাহচর্য্য তার বদ্ধ জীবনের একমাত্র মুক্ত অঙ্গন। শাল প্রাংশু বিশাল দেহভার—বিরাট বিস্তীর্ণ বক্ষ পট, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কালো সতেজ চোখের করুণাঘন দৃষ্টি মেলে

সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর —তার স্বামী। শুভদৃষ্টির সময় যে মুখ দেখে আশাহত রমা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; ঘরে ফিরে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেটে বান্ধবীদের করুণার পাত্রী হয়েছিল—আজ সেই মুখখানাই অতি প্রিয়, একান্ত আপনজন বলে মনে হলো তার।

দেশবিভাগের ফলে এই বৃহৎ পরিবার ভেঙ্গে ধুয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই অবকাশে বাপের বাড়ী কোলকাতায় প্রায় একটি বছর কাটিয়ে স্বামীর নতুন কর্মস্থল আসামের সুদূর প্রান্তে এই সহরে এলো রমা। এখানেই ঘোমটা ছেড়ে স্বাধীনভাবে সংসার করার সুযোগ পেলো সে। প্রাচুর্য্য দূরে থাক্—সামান্য সচ্ছলতাটুকু সুলভ ছিল না প্রথম প্রথম। তবু মনের স্ফূর্তি হারায়নি রমা, নিজের কর্তৃত্বে সংসার করার উৎসাহে মেতে ওঠে সে। নিজের কর্ম দক্ষতা প্রমাণ করে অবাক করে দিতে চায় দিবাকারকে। আর এই অপরূপ রূপসী স্ত্রীকে কত শিগ্‌গীর হেঁসেল তোলা, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করার মেহনৎ থেকে মুক্ত করবে সেই ভাবনায় দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মমুখর হয়ে ওঠে দিবাকর।

এম. এ এবং ল পড়তে পড়তেই যুদ্ধের বাজারে মুনাফা লোটার হাতছানি এড়াতে পারেনি দিবাকর। ভারতের পূর্ব সীমান্তে ইণ্ডিয়া-বার্মা রোড মেরামতি ও প্রশস্ত করার ঠিকা নিয়ে কোহিমার কাছে ক্যাম্প করে বসে সে। কয়েক মাসেই প্রচুর এবং আশাতীত সঞ্চয় করে বাড়ী ফেরে এবং মিলিটারী সাপ্লাইয়ের কাজে নেমে পড়ে। এ কাজে আগের মত লাভ না হলেও যথেষ্ট আয় ছিল। যুদ্ধ শেষে চাল ও আলুর কারবারে নেমে পড়ে। এই সময়ই কোলকাতা গিয়ে স্থায়ী ব্যবসা ফাঁদবার পরিকল্পনা মনে এলো তার। ঠিক তখনই গুরুজনদের বিশেষ করে মা ও দাদার পীড়াপীড়িতে বিয়েতে সম্মতি জানাতে হলো তাকে।

পাত্রী সে নিজে দেখেনি, কোন আগ্রহও প্রকাশ করেনি। পাত্র হিসেবে নিজেকে সে কোনদিনও গুরুত্ব দেয়নি, মূল্যবানও মনে করেনি। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলা স্বাস্থ্য ছাড়া তার চেহারা ছবিতে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ছিল না। উপার্জনের ক্ষেত্রেও আগন্তুক

মাত্র সে, প্রতিষ্ঠিত নয় কখনই। প্রস্তাবিত শ্বশুরকুল বহুদিন কোলকাতা প্রবাসী এবং কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক ও ভাগ্যবিধাতা। এই বৈবাহিক সম্পর্কের খাতিরে কোলকাতায় কোন স্থায়ী ব্যবসা গড়ে তোলা সম্ভব হবে—এই সম্ভাবনায় সে এ বিয়েতে বাদ সাধেনি। দেখে শুনে যাঁরা তাকে জামাতারূপে বরণ করতে ইচ্ছুক—শ্বশুরকূলের সেই কন্যাটিও সব দিক দিয়ে তারই উপযুক্ত হবে এ কথাই তার মনে হয়েছিল।

কিন্তু ভুল ভাঙলো। শুভদৃষ্টির সময় রমাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিল সে। সুন্দর যে এত সুন্দর হ'তে পারে কে তা জানতো? মেয়েটির সৌন্দর্য্য তার কল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে। রমাকে দেখেই সে ভালবেসে ফেলেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির জন্য গভীর বেদনা অনুভব করেছিল। বুঝে ছিল 'বানরের গলায় মুক্তোর মালা' এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর কিছুই হ'তে পারে না।

শুধু সৌন্দর্য্যই নয় বয়সের দিক থেকেও যে সে বড় বে-মানান সে উপলব্ধিও তার ঘটেছিল। আলাপের সূত্রপাতে কেন যে পাত্রী দেখে এ বিয়ে সে নাকচ করলো না—সে কথা ভেবে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না দিবাকর। যে কোন মূল্যে এই মেয়েটির সব বেদনা মুছে দিয়ে সুখী-করার সঙ্কল্প নিয়ে নিজের ঘাটতি পূরণের শপথ নিল দিবাকর। নিজের বাড়ীতে নববধূ রমার অসহায় অবস্থা সে পরিপূর্ণ মমতার সঙ্গে অনুভব করেছিল এবং পরম স্নেহে এগিয়ে এসে রমার মনের খেদ ধুয়ে দেবার প্রয়াস পেয়ে ছিল।

ইতিমধ্যে দেশে উৎকট সাম্প্রদায়িকতার ফলে চাল ও আলু চালানের ফলাও ব্যবসায়ে দিবাকরের বড় রকমের ক্ষতি ঘটে গেল। আর ঠিক তারপরই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাবে পারিবারিক দুর্গতি চরমে উঠ্‌লো। ভয়ে এসে ব্যক্তিগত স্বার্থ-রক্ষার প্রবণতায় যৌথ পবিবারের ভিত নড়ে গেল। যে কোন উপায়ে ব্যক্তিগত সংস্থান সংগ্রহের চেষ্টায় গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে বিরাট আথিক ক্ষতির সম্মুখীন হলো বেশীর ভাগ শরিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে রমাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক বিরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একক প্রচেষ্টায়

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রমার কলঙ্ক মোচনের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গুরুজনদের বিশেষ করে দাদা-বৌদির নিষেধ সত্ত্বেও রমাকে সাময়িকভাবে তার বাপের বাড়ী কোলকাতায় পাঠিয়ে নিজে চলে এলো ডিব্রুগড় সহরে সামান্য পুঁজি সম্বল করে। শ্বশুরকূলের সাহায্যের প্রস্তাবও সে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

যুদ্ধের সময় মিলিটারী সাপ্লাইয়ের কাজে এই সহরে অনেকবারই আসতে হয়েছে তাকে। তাই দেশ ছাড়া হয়ে ডিব্রুগড়ের কথাই তার মনে হয়েছিল সর্ব প্রথম।

সহরের আশেপাশে বিস্তর চা বাগান আছে। আসলে চা-বাগান-গুলির দৌলতে ডিব্রু নদীর তীরে এ সহর গড়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদী দক্ষিণবাহিনী হয়ে ডিব্রু নদীকে গ্রাস করে বর্তমানে সহরের উত্তর প্রান্তে ভীম বেগে বয়ে চলেছে। পৃথিবীর চায়ের বাজারে বিদেশী পরিচালিত বেশ কয়েকটি চা-বাগানের কল্যাণে ভারতীয় চায়ের বৈশিষ্ট্য তখনও অব্যাহত ছিল।

দেশবিভাগের দরুণ বিশৃঙ্খলার ফলে রেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত মালগাড়ী সরবরাহে অপরাগ ছিলেন। পরিবহণের এই সঙ্কট এড়াতে মটর-লরী করে চা বাগানগুলি থেকে নিকটবর্তী ডিব্রুগড় ষ্টীমার ঘাট এবং ষ্টীমার ঘাট থেকে বাগানগুলি পর্যন্ত মালমত্র আনা-নেয়ার কাজে কয়েকটি প্রাইভেট পরিবহণ সংস্থা গড়ে ওঠে। ভাগ্য ও সামান্য পুঁজি সম্বল করে দিবাকর এমনি একটি সংস্থা গড়ে তোলে নিজের চেষ্টায়। সংস্থার নাম "রুমা ট্রানস্পোর্ট এজেন্সি।" রুমা হলো তার দেওয়া রমার আদরের ডাক নাম—। চা-বাগানের সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না তার। যুদ্ধের কাজে সহায়তা, মিত্র বাহিনীর অফিসার মহলের সঙ্গে দহরম মহরম এবং তাঁদের দেওয়া পরিচয় ও প্রশংসা পত্রগুলি খুবই কাজে এলো এ ব্যাপারে। বছর খানেকের মধ্যেই সে মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেল।—শান্তি পাড়ায় ছোটখাটো বাড়ী ভাড়া করে, কোলকাতা গিয়ে রমাকে নিয়ে এলো।

ডিব্রুগড়ে স্থিতি হবার পর পঞ্চাশের ভূমিকম্পের কয়েকদিন পরই তাদের প্রথম সন্তান দোলার জন্ম হয়। কিন্তু বিধাতার অকরুণ বিধানে

ভুল চিকিৎসার ফলে, ফুলের মত সুন্দর চারমাসের শিশু কন্যাটি অকালে ঝরে যায়। শোকে দুঃখে রীতিমত ভেঙ্গে পড়ে রমা। আত্মীয় পরিজন থেকে দূরে প্রায় বিদেশে শোকাহত রমাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে দিবাকর। নিজের কাজ কর্ম ক্ষতি করে রমাকে যে ভাবেই হোক সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পায় সে। এক সময় কিছুদিনের জন্য কোলকাতা পাঠিয়ে দেবার কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চিন্তা বাতিল করে দেয়। প্রথম পোয়াতি রমাকে কোলকাতায় তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য মা ও দাদার অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছিল সে—। এখন রমা যদি কোলকাতায় তার বাপের বাড়ী গিয়ে থাকে—তাতে মা ও দাদার চরম অসম্মান ও অবমাননা হবে। রমা নিজেও গোঁ ধরেছিল যে-দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে সে বাপের বাড়ী কিছুতেই যাবে না।

এতকাল ডিব্রুগড়ের নিরিবিলি গৃহকোণে রমার গানের একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিল দিবাকর। তখনই সে উপলব্ধি করে রমার প্রতিভায় কোন খাদ নেই—। রমার গানে মুগ্ধ হয়ে উৎসাহ ভরে হারমোনিয়াম যোগাড় করেছিল। যোগাড় করেছিল রেডিও, গ্রামোফোন ও কিছু ভাল রেকর্ড। এর জন্য কিছু ধার দেনা করতে হয়েছিল তাকে—কিন্তু তা গায়ে মাখেনি দিবাকর।

সন্তান বিয়োগ ব্যথায় বিধূরা রমা এত মুষড়ে পড়েছিল যে শত সাধ্য সাধনায় তাকে গান গাওয়াতে পারে নি দিবাকর। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে এক অভিনব উপায়ে রমাকে চাঙ্গা করে তোলার উদ্যোগ নিল দিবাকর।

স্থানীয় বেঙ্গলী এ্যামেচার ক্লাবের মেম্বার দিবাকর। ক্লাবের কিছু উৎসাহী বন্ধুবান্ধবের সহৃদায়তায় সেবার পূজোয় অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য ক্লাবের বিশেষ আমন্ত্রণ লিপি এনে রমার সামনে মেলে ধরে সে। বিস্মিত রমা বারবার চিঠিখানা দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলে, "আমি গান জানি এ কথা ওঁরা জানলেন কি করে?"

"জানি না। তবে বাড়ীতে বসে যখন গান কর—রাস্তা থেকে যে তা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়—সে কথা জানি।"

"কিন্তু কি গাইব? এ সময় গান গাওয়া যায়? গান গাইতে একদম ভাল লাগ্‌ছে না—।"

"সে কথা আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি বার বার। তবু ওঁরা জোর করে চিঠিখানা গছিয়ে দিলেন। আচ্ছা ঠিক আছে—কাল জানিয়ে দেবো—"

"দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি—।"

রমা গান গেয়েছিল। রবীন্দ্র সঙ্গীত। জীবনে এই প্রথমবার জনসাধারণের সাম্‌নে বসে গান গাইবার সুযোগ এলো। সঙ্কোচ ও ত্রাস, পুলক ও উৎসাহ এবং ব্যথা ও বেদনার মধ্যে দুল্‌তে দুল্‌তে এই অগ্নিপরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে উদ্যোগী রমা সন্তান শোকের হাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পেলো।

তার গানে সেদিন উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই দীপ্ত প্রতিভা এতকাল কি করে আত্মগোপন করেছিল সর্বসাধারণের মনে এ প্রশ্ন অনিবার্য্য ভাবে জেগেছিল। তাই শুধু দু'খানা গান নয়। এরপরও আরও চারখানা গান গেয়ে অনুরোধের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল রমা। বিদগ্ধ শ্রোতাদের প্রশংসায় উদ্বেল তার মন। রমার জীবনে নবদিগন্ত উদ্ভাসিত হলো। স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায় ভরে ওঠে রমার মন। পত্নীগর্বে স্ফীত দিবাকরও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

প্রথম প্রথম এই সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের একমাত্র পাদপীঠ ছিল ঐ বেঙ্গলী এ্যামেচার ক্লাব, দিবাকর যার একনিষ্ঠ সভ্য। কিন্তু শুধু এতে সন্তুষ্ট নয় রমা। কদাচিৎ কোন অনুষ্ঠানের আশায় বসে দিন গুণ্‌তে রাজী নয় সে। বাঁধ ভাঙা নদীর স্রোতের মতো মন হয়েছে তার উধাও। সে চায় ছড়িয়ে পড়তে—, মেলে দিতে নিজেকে দিগদিগন্তে।

সুযোগও ঘটে গেল। রমার খ্যাতি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় বিহু-উৎসবের নামী দামী এক কর্তাব্যক্তি বাড়ী বয়ে তাঁদের আয়োজিত বিহু সাংস্কৃতিক সম্মেলনে রমাকে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের আমন্ত্রণ জানালেন। আসামের জাতীয় উৎসবে অসমীয়া না হয়েও আমন্ত্রিত হওয়া তুচ্ছ ঘটনা নয়। দিবাকর সহজেই সম্মত হলো।

খোলা ময়দানে সামিয়ানার নীচে বসে কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের মুহূর্মুহূ অনুরোধে পর পর পাঁচ-ছয়খানা রবীন্দ্র-গীতি গেয়ে অজস্র প্রশংসা কুড়ালো রমা।

এই সূত্র ধরে ডিব্রুগড়ের সাংস্কৃতিক মানসে পাকা আসন গেড়ে বস্‌লো রমা। আর তারই জের টেনে নানান সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ভীড় করতে শুরু করলো দোর গোড়ায়। এতকাল কণ্ঠরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল কঠিন বাধা ও নিষেধের বাঁধনে। ভগীরথ দিবাকর সে বাঁধা অপসারিত করলো। সুরধ্বনির বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতে গা এলিয়ে দিল রমা। সেই থেকে শুরু।

প্রারম্ভে দিবাকরের সস্নেহ সম্মতি ছিল ঠিকই। কিন্তু এই সব হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলির আচার আচরণ, রীতিনীতি ও ধরন ধারণে ক্রমশঃ তিক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে দিবাকর। পঁচিশে বৈশাখ, তেইশে জানুয়ারী, দুর্গাপূজা, কালীপূজা-সরস্বতীপূজায় এই সব সঙ্ঘ হাই তুলে জেগে উঠ্‌তো। মিটিং করে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাজেট রচনা করে শুরু হতো চাঁদা তোলার হিড়িক। দুর্ভাগ্যবশতঃ, উৎসাহের তোড়ে এমন কয়েকটি সঙ্ঘে রমা হয় সভাপতি, নয় সহ-সভাপতি অথবা সম্পাদকের পদে অধীন। দরাজ হাতে চাঁদা দেওয়াই শুধু নয়, শুধু গান গাওয়াও নয়—সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হতো রমা চৌধুরীকেই।

পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, বিশৃঙ্খল এই সব অনুষ্ঠানগুলি আর সহ্য করতে পারে না দিবাকর। দেখা গেছে—অনুষ্ঠান শেষে কর্তা-ব্যক্তিদের পাতা নেই। নিজ নিজ জরুরী কাজের তাগিদে সবাই প্রায় সহরের বাইরে। অথচ প্যাণ্ডেল তৈরীর বকেয়া পাওনা—যান বাহনের লম্বা খরচের তালিকা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পাওনা দারদের ভীড়; শেষ পর্যন্ত সম্মান বাঁচাতে দিবাকরই টাকা দিয়ে দেনা পরিশোধ করে রক্ষা করে রমাকে।

তীব্র প্রতিবাদ করে দিবাকর। তার মত হলো সীমিত গণ্ডীর মধ্যে অভিজাত্য বজায় রেখে আপম প্রতিভার বিকাশ সম্মানজনক। যেখানে সেখানে মাথা মুড়িয়ে বসা তার পছন্দ নয়। এই নিয়ে শুরু হয় বাদ

প্রতিবাদ, ঝড়। অর্জিত স্বাধীনতা হারাতে রাজী নয় রমা। তাই সে রুখে দাঁড়ায়। কথার তোড়ে একদা শান্ত স্বভাবের স্বল্পভাষিণী রমা হিংস্র হয়ে ওঠে। রূঢ় ভাষায় দিবাকরের এই পশ্চাদপসরণের বিরূপ সমালোচনা করে সে এবং বলেই বসে যে রমার জনপ্রিয়তা ও সুনামে ঈর্ষান্বিত হয়েই আজ দিবাকরের এই নতুন প্রস্তাব। ব্যথিত দিবাকর প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

অবশ্য নিজেকে গুটিয়ে নেবার আরও বড় কারণও ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। পঞ্চাশের ভূমিকম্পের পর অনিবার্য্য কারণে ব্রহ্মপুত্র নদীর গভীরতা হ্রাস পেল। ডিব্রুগড় পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল, এই পরিপ্রেক্ষিতে দিবাকরের পরিবহণ সংস্থার কার্য্যক্ষেত্র শিবসাগরের ডিসাংমুখ, জোড়হাটের নিয়ামতি ঘাট, এমন কি সুদূর গৌহাটী পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। ফলে কাজের চাপ গেল বেড়ে। পরিস্থিতির চাপে দিবাকরের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না, রমার খামখেয়ালিতে মদত দিয়ে এই সব অনুষ্ঠানে সহযোগীতা করা। কিন্তু এই বাস্তব অসুবিধা প্রনিধান করার মত মানসিকতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে রমা। "এ সবই, নিজে দূরে সরে থেকে, আমায় অপমানিত করার ছল"—এই হলো রমার মন্তব্য। আর তাই একদা সহানুভূতিশীল সহৃদয় এই মানুষটিকে বিরোধী শিবিরভুক্ত অন্যতম প্রতিপক্ষ বলে মনে করতে বাঁধে না তার।

প্রেমেপড়া বা ভালবাসার কোন সুযোগই রমার জীবনে ঘটেনি। যৌবনের দুয়ারে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দিবাকরের সঙ্গে পরিচয়। দিনের পর দিন একসঙ্গে থেকে সে দেখেছে স্নেহ, মায়া মমতা দিয়ে বর্মের মত তাকে আগলে আছে দিবাকর সকল অশুভ শঙ্কা দূরে সরিয়ে দিয়ে। দেখেছে তার সামান্য ইচ্ছাটিক পূর্ণ করার জন্য দিবাকরের ব্যগ্র প্রতীক্ষা। রূপের দীনতা বা বয়সের পার্থক্য যাই থাক্ না কেন, সে অনুভব করেছে, ঐ দেহের আধারে যে মানুষটি বাস করে তার মনের উদার প্রসারতা। দেখে মুগ্ধ হয়েছে মানুষটির স্বচ্ছ মনের সৌন্দর্য্য। তাই বাইরের কুশ্রীতাকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছিল এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য যার মায়ায় আকুল হয়ে ওঠে রমার মন। নিজেকে নিঃশেষে দিবাকরের হাতে সঁপে দিয়ে সুখ স্বপ্নে বিভোর ছিল সে। তাই দিবাকরের হঠাৎ

এভাবে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ায় রমার মনের মুকুরে সূক্ষ্ম চিড় পড়ে গেল তার নিজেরই অগোচরে।

দীপুর জন্মের বছর খানেক পর্যন্ত দিবাকরের আপত্তি তুচ্ছ করে এই সব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল রমা। অবশ্য শুধু শিল্পী হিসেবেই। কর্মজগতে বাঁধা পড়ে দিবাকরের সাধ্য ছিল না সহযোগীতার হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসা। অগত্যা অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রেরিত গাড়ীতে তাঁদেরই প্রেরিত ব্যক্তির হেপাজতে যাতায়াত করতে হয় রমাকে। আর তখন থেকেই ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে যে শুধু সঙ্গীত প্রতিভা নয়—তার চেয়েও জোরদার আরও কিন্তু প্রত্যাশা আছে ওদের। কথায় বার্তায় হাবে-ভাবে এর আভাস পেয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠছিল রমা—আর তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল।

চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রায় মাঝ রাতে শেষ হওয়া এক অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় দেখা গেল কর্ম কর্তারা কেউ আসে পাশে নেই। দিশেহারা রমা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না—, এমন সময় কর্মকর্তা নন কিন্তু অনুষ্ঠানের শান্তিরক্ষার কাজে জড়িত দুই ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে ওদের সাহায্য ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় রমা। এরা আশ্বাস দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। সময় কেটে যায়—। একে একে মঞ্চখালি করে সবাই প্রায় চলে গেছে। এমন সময় ট্যাক্সি নিয়ে ওরা দুজন এলেন। পেছনের সিটে ওর পাশেই দুজনে উঠে বস্‌লেন। কথাবার্তার ধরন ও গন্ধ পেয়েই আঁচ করতে পেরেছিল রমা যে ওরা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। ভাগ্য ভাল, বাড়াবাড়ির মুহূর্তে ট্যাক্সির পাঞ্জাবী ড্রাইভারের সবল প্রতিরোধে ওরা দুজন মাঝ পথে গাড়ী থেকে নেমে যেতে বাধ্য হলেন। নিরাপদে বাড়ী ফিরে এসে—সেদিনই সে প্রতিজ্ঞা করলো খুব চেনা জানা না হলো বাইরের কোন অনুষ্ঠানে আর সে যোগ দেবে না। সঙ্কল্পে অটল ছিল রমা। অবশ্য এ ঘটনা ঘূর্ণাক্ষরেও দিবাকরকে জানতে দেয়নি।

জান্‌তে দেয়নি আরও একটি ঘটনা। ডাঃ মুখার্জির কীর্তি! জানতে পারলে ছেড়ে কথা কইতো না দিবাকর। মুখে কিছু বলার

চেয়ে পেশীবহুল বাহুর ভাষাই সহজে প্রয়োগ করিতে অভ্যস্থ সে। সে ভয়েই ব্যাপারটা চেপে যায় রমা।

তখন ডাঃ সমর মুখার্জি চৌধুরী-বাড়ীর গৃহ চিকিৎসক। বছর দুয়েকের দীপুকে নিয়ে শান্তিপাড়া ছেড়ে এ পাড়ায় ওরা এসেছে—তখনকার ঘটনা। ভুল চিকিৎসার ফলে ওদের চার মাসের শিশু কন্যাটি অকালে ঝরে যায় মেজিনজাইটিস্ রোগে। শান্তিপাড়ার এক বৃদ্ধ ডাক্তারের হাতে তার চিকিৎসার ভার ছিল। রোগ ধরতে পারেন নি —তবু চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। প্রায় শেষ অবস্থায় হাল ছাড়লেন তিনি। সহরের অন্যতম স্বনাম খ্যাত ডাক্তার সমর মুখার্জির দ্বারস্থ হলো দিবাকর। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকেই দিবাকরের সংসারে ডাঃ মুখার্জি গৃহ-চিকিৎসক রূপে রয়ে গেলেন। এঁরই তত্ত্বাবধানে দীপুর জন্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।

পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই ডাক্তারের সবিশেষ মনোযোগ বিব্রত করে তুলেছিল রমাকে। রমার সামান্যতম শারীরিক অস্বস্তি দৃষ্টি এড়ায় না ডাঃ মুখার্জির। যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং সময় অসময়ে খোঁজ খবর নেবার তাড়া বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে রমার। গৃহ চিকিৎসক হিসেবে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ তার আছে এবং সে সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেন নি কখনও ডাঃ মুখার্জি। শুধু তাই নয়, কোন না কোন ছলে রমার সৌন্দর্য্য ও গুণপনায় মুখর হয়েছেন। ডাক্তারের এই হ্যাংলামি রমার আদৌ পছন্দ নয়। শুধু ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে রূঢ় হ'তে পারেনি রমা।

দীপুর সর্দি-কাশি এবং সেই সঙ্গে জ্বরের জন্য ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণতঃ খুব জরুরী না হলে সন্ধ্যার পরই তিনি আসেন। সকালে তাঁর চেম্বার থাকে; দুপুরে সহরের আশেপাশে কয়েকটি চা-বাগানের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে দৈনন্দিন পরিদর্শনে বের হতেই হয়। ফিরে এসে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর সহরের রুগী দেখতে বের হোন তিনি।

বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঝি না আসা পর্যন্ত দীপুকে নিয়ে একাই বাড়ীতে থাকে রমা। রাম লালের থাকার কথা তার আস্তানায়,

কিন্তু মাঝে মাঝে তা সে থাকে না। বড় রাস্তার মোড়ে দেশায়ালী ভাই বেরাদার সঙ্গে আড্ডায় জ'মে যায় সে প্রায়ই।

ডাক্তার এলেন, তখন একটা বাজে। দীপু ঘুমুচ্ছে। রমা রহস্য উপন্যাসের পাতায় ডুবে গেছে। গাড়ী থামার শব্দ, গেট খোলার শব্দ এবং পরক্ষণেই সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে বিরমি বোধ করে রমা। দরজা খুল্‌তেই বিগলিত হাসি হেসে ডাক্তার বলেন, "কি বিরক্ত করলুম ? উপায় নেই। একটু দূরে যেতে হ'বে—ফিরতে রাত হ'বে। তাই ভাবলুম—যাবার পথেই দেখে যাই। হাজার হোক বাচ্চা তো ?" উত্তরের প্রতীক্ষা না করে গট্‌গট করে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। দীপুকে পরীক্ষা করে, "ও কিছু নয়—ছ'দাগ ওষুধ পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে—" আশ্বাস সূচক বানী শুনিয়ে কাগজ কলম বের করে ব্যবস্থাপত্র লিখে রমার হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চলে যাবেন এবার। কিন্তু না। হঠাৎ বসে পড়লেন। চেয়ারে গা এলিয়ে বললেন, "জল, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল—"

"শুধু জল ? সঙ্গে কিছু" —রমার কথা শেষ করার আগেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছ'হাত নেড়ে ডাক্তার বল্লেন, "ন্‌ না—, শুধু জল—এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।" কুজো থেকে কাঁচের গ্লাসে জল গড়িয়ে ঘরে এসে ঢোকে রমা। ডাক্তার হাত বাড়ালেন—রমা হাতে ধরা গ্লাস বাড়িয়ে দিল। গ্লাস শুদ্ধ রমার হাতখানা ডাক্তারের মুঠোর মধ্যে। হতবাক রমা ভাবে এ আবার কি ঢং ? বল্লো—"এ কী ? ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন। লাগছে—।" হাত ছাড়েন না ডাক্তার। অপর হাতে গ্লাস মাটিতে নামিয়ে রাখেন ডাক্তার। তারপর সেই হাত দিয়েই রমার কোমর বেষ্টন করে রমাকে টেনে আনেন কোলের কাছে, বিগলিত সুরে বলেন, "আঃ দিন দিন কি সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছো তুমি—"

"এ কী ? ছিঃ ? কি হ'চ্ছে ছাড়ুন,—ছেড়ে দিন—" ত্রস্ত, ভীত কাঁপা কাঁপা গলায় বলে রমা।

"প্লীজ, ? বাঁধা দিয়ো না। শুধু একটি বার—কেউ জান্‌বে না—" ডাক্তারের হাত উঠে আসে রমার বুকে। মরিয়া হয়ে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, কষে চড় মারে রমা ডাক্তারের গালে। ডাক্তারের চশমা ছিট্‌কে

পড়ে। হতচকিত ডাক্তারের বাহু বন্ধন শিথিল হয়। এই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে দরজার দিকে ছুটে যায় রমা। কিন্তু বৃথা এ চেষ্টা। লাফিয়ে উঠে পলায়মানা রমার শাড়ীর আঁচল ধরে টেনে রমাকে আপন বাহু বন্ধনে বেঁধে ফেলেন।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়া রমার কাতর মিনতি উপেক্ষা করে—রমার ব্লাউজ টেনে ছিঁড়ে, ব্রার বাঁধন আলগা করে—বিছানার দিকে টেনে হিঁছড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলেন—"সুন্দরকে কোনদিন উপেক্ষা করেনি এ শর্মা। ঐ কুৎসিত গরিলাটা তোমায় ভোগ করবে—আর দূরে বসে তাই দেখ্‌বো? আমি? কখনই নয়—।" সবলে রমাকে বিছানায় ঠেসে ধরেন ডাক্তার।

অসহায় রমা। তবু প্রাণপণে শক্তি দিয়ে ডাক্তারের হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করার নিস্ফল প্রয়াস চালিয়ে যায়। এই অঞ্চলের বাড়ীগুলি বড় দূরে দূরে। এমন নয় যে চিৎকার শুনে পাশের বাড়ীর লোক ছুটে আস্‌বে। চিৎকার করলে শুন্‌তেই পাবে না—। শুধু একমাত্র ভরসা রামলাল। কিন্তু সে কি বাড়ী আছে? যদি না থাকে তবে পরিত্রাণের কোন আশাই নেই। তবু শেষ চেষ্টায় আর্তকণ্ঠে মুখর হয়ে ওঠে রমা, "রামলাল রামলাল, এই রামলাল, জলদি একটা ডাণ্ডা নিয়ে এ ঘরে এসো।" কোমরের বেল্ট আল্‌গা করায় ব্যস্ত ডাক্তার রমার মুখ চেপে ধরার আগেই তু'বছরের শিশু দীপু ভয়ে চম্‌কে জেগে উঠে তারস্বরে কান্না জুড়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রামলালের দরাজ গলার হাঁক, "আতে হুঁ বহুদিদি।" ওর চালাঘরের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা যায়।

সন্ত্রস্ত ডাক্তার উঠে দাঁড়ান। এক হাতে প্যান্ট টেনে ধরে অপর হাতে ডাক্তারী ব্যাগ ও বেল্ট তুলে নিয়ে পড়ি কি মরি ছুটে বেরিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলেন ডাক্তার। ভাঙ্গা চশমা তুলে নেবাবত ফুরসৎ হলো না তার।

বাড়ীর পেছনের দরজা বন্ধ। দরজা খুলতে না পেরে শোবার ঘরের জানালার পাশে এসে ডেকে বলে রামলাল, "পিছওয়ালি দরয়োজা বন্ধ্ বহুদিদি, হম্ সামনাওয়ালা দরয়োজা সে আঁতে হে।" হাতে তার পেতল

বাঁধানো বিরাট এক লাঠি। শাড়ীর আঁচলে শরীর ঢেকে দীপুকে কোলে করে জানালার পর্দা তুলে হাস্‌তে হাস্‌তে রমা বলে, "না, রামলাল, আর দরকার হ'বে না। তুমি বিশ্রাম করো গে। ওটা পালিয়েছে—।"

"ভাগ্ গিয়া ? উয়ে কৌন থি বহুদিদি ?"

"ছুঁচো। বাইরের নালা থেকে ছুঁচোটা ফাঁক পেয়ে ঘরে ঢুকেছিল। বেরিয়ে গেছে ওটা।"

"চুহা ?" হাঁ হাঁ করে হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে যায় রামলাল।

দিবাকরকে রমা বলেছে ডাক্তারের হাব-ভাব চাল-চলন মোটেই সুবিধের নয়। ওঁর জায়গায় অন্য কোন ভাল ডাক্তার ডাকাই ভাল। ডাঃ মুখার্জি আর কোনও দিন এ মুখো হোন্‌নি। এরাও ডাকেনি সেই থেকে আর। ভাঙা চশমা আর ছেঁড়া-ব্যবস্থাপত্র সাম্‌নের নর্দমার পাঁকে তলিয়ে গেছে।

সঙ্গীত দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে স্বভাবও পাল্টে গেছে রমার। মুখ চোরা লাজুক শান্তভাব আর নেই। সাহস বেড়েছে, সে সঙ্গে দাপটও। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মোহ কেটে গেছে কিন্তু মোহ রয়ে গেছে নিজেকে প্রকট করার। তারই ফলে জন-সেবামূলক এক মহিলা সমিতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রমা। বন্যা, মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলের নরনারী ও শিশুদের জন্য এবং কর্মহীন দুঃস্থ পরিবারের মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য মিটিং করা, চাঁদা তোলা, সংগৃহীত অর্থ-বস্ত্রের বিলি ব্যবস্থা, কুটীর শিল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ পরিবারের মহিলাদের জন্য কাজ যোগাড় করার ব্যাপারে সে হয়ে ওঠে সমর্পিত প্রাণ। প্রতিষ্ঠানে মুখপাত্রী হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবী পেশ করে সরকারী অনুদানের পরিমাণ বাড়াবার সফল প্রয়াস চালিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেদিনের সেই লাজুক, স্বল্পভাষী ভীরু মেয়েটি যেন কোন যাদুকাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে নতুন সাজে, নতুন রূপে, নেত্রীর ভূমিকায়। অপার বিস্ময় দিবাকরের চোখে।

সত্যিই কর্তব্যপরায়ণ নিরলস কর্মী হিসেবে সে সর্বজন স্বীকৃত। মেয়েদের মধ্যে সহসা এমনটি পাওয়া যায় না। সে মুহূর্তের নোটিশে কর্ম-

যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে যে কোন সময়ে। এর ফলে দীপুর খুবই কষ্ট হয়। বাধ্য হয়ে আয়া রাখতে হলো দিবাকরকে। খাসিয়া আয়ার হাতে দীপুকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বের হয়ে যায় রমা। কিন্তু সংসার? তা সংসার এলোমেলো হয় বৈ কি! সময় অসময়ের থাকে না কোন সীমারেখা। মাঝে মাঝে দিবাকর ক্ষুব্ধ হয়, সরব প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু কতক্ষণ? রমার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা হয় না তার।

অশান্ত রমা। কোন কিছুই বেশীদিন ভাল লাগে না তার। পুরাতনকে ছেড়ে নতুনের দিকেই তার মোহ। নতুন কিছু করা চাই। এবার তার ঝোঁক চাপলো বি. এ. পাস করতে হ'বে। শুনে খুশী হয়ে দিবাকর বলে, "খুব ভাল কথা। ভাল প্রফেসার রেখে দিচ্ছি, প্রাইভেটে—।" না, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে সে পড়বে না। অনর্থক টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ। নিজেই চেষ্টা করে স্থানীয় কানৈ কলেজে ভর্তি হলো। বই-পুঁথি, খাতা পেন্সিল কেনা হলো। মাস দেড়েক অসম্ভব কষ্ট করে ক্লাসও করলো। মাঝে মাঝেই পুঁথি-পত্তর খুলে দিবাকরের কাছে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেয়, পড়ে রাত জেগে। ব্যস্ ঐ পর্যন্তই উৎসাহে ভাঁটা পড়তে দেরী হলো না।

বিক্ষিপ্ত রমার মন। কী যে সে চায়, নিজেই বুঝতে পারে না। সঙ্গীত-চর্চা মাঠে মারা গেল। কোন সুসংবদ্ধ প্রণালীর মাধ্যমে সঙ্গীত চর্চা করা গেল না। ওস্তাদজী নির্ধারিত সময়ে প্রায়ই ছাত্রীকে না পেয়ে অথবা অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে কয়েক সপ্তাহ দেখে আর এ মুখো হলেন না। গীটারের বেলাও তাই। ধূলি ধূসরিত গীটারের কেসটা দেখ্‌লেই দীর্ঘ অব্যবহারের হদিস মেলে। সেই মহিলা প্রতিষ্ঠানেও আর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার উৎসাহ নেই। কারণ দেখা গেল, তারই পরিশ্রমলব্ধ সুবিধা-সুযোগগুলি আত্মসাৎ করে বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী মহিলা সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছেন; তাকে তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে ঘরে বসে নিজের মন্দভাগ্যের জন্যে আক্ষেপ করে এবং এর জন্য দিবাকরকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করে দিন কাটে তার।

নিজেকে ব্যস্ত রাখার প্রচেষ্টায় শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে রমার মন। সব ব্যাপারেই এগিয়ে যায় জেদের বশে। প্রাণ ঢেলে মেতে ওঠে কাজের নেশায়। তারপরই নৈরাশ্য ও অবসাদের শিকার হয়ে ঘরে বসে থাকে, চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খায়।

চিন্তা তার দিবাকরকে কেন্দ্র করে। দিবাকর কেন সব সময় তার পাশে থাকে না? তার চলা-ফেরা যদি পছন্দ নাই হয়, কেন বকে-ঝকে তাকে শাসন করে না? কেন সে এত নিশ্চিত নির্বিকার? প্রথম দিকে দিবাকর মাঝে মাঝে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রমার দাবড়ানি খেয়ে সেই যে চুপ করে গেল আর কোন সাড়াই মেলেনি তার। এমনি করে দূরে সরে যাচ্ছে কেন দিবাকর? কেন তার এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ভাব?

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলীর ফলে আপন রূপ ও সৌন্দর্য্য সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে রমা। অথচ গোড়ার দিকে এই সচেতনতা তার আদৌ ছিল না। সুকণ্ঠী গায়িকা হিসেবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমন্ত্রিত হয়ে নিজের গুণপণার জন্য গর্ব অনুভব করেছে সে। কালে কালে তার জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখনই সে আবিষ্কার করে সব অনুষ্ঠানেই তার আমন্ত্রণ শুধু সু-গায়িকা বলেই নয়, আসলে তার সৌন্দর্য্যসুধা পান ও সঙ্গলাভের লোভও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেদিন ট্যাক্সির ঐ ঘটনাই শুধু নয় গায়ে পড়া হয়ে ঘনিষ্ঠ হবার প্রচেষ্টাও কম ঘটেনি।

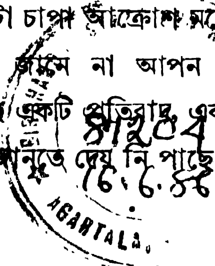
কিন্তু দিবাকর? এই রূপ মুগ্ধতা তার কোথায়? এই সব হাভাতে অনুষ্ঠান থেকে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখে, নিরুদ্বেগে ছেলেকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে দিবাকর। ঘরে পা দিতেই উঠে বসে এক গাল হেসে বলবে, "খুব ধকল গেছে তো? ক'টা গান গাইতে হলো আজ? কোন গানগুলি গাইলে। নাঃ, রাত অনেক হলো কাপড়-জামা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে এসো। খেতে খেতে সব শুনবো।" চোখে-মুখে ঈর্ষা বা সন্দেহ দূরে থাক্ রাগ বা বিরক্তির আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। কি করে নির্বিকার থাকে সে নিজের রূপসী স্ত্রীকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এক ঝাঁক ছদ্মবেশী হায়েনার মুখে ছেড়ে দিয়ে? তবে কি ভাব-ভালবাসার

খামতি ঘটেছে দিবাকরের মনে ? জবাব পায় না। যেচে গিয়ে প্রশ্ন করে জেনে-নিতে। কিন্তু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানা-পোড়েনে জ্বলে পুড়ে পিছিয়ে আসে রমা।

ত্বনিয়ায় প্রত্যেক পরিবারের পুরুষেরা অর্থ উপার্জন করে আবার রসিয়ে রসিয়ে জীবন উপভোগও করে। ঐ যে মিঃ ও মিসেস ডেকা। ভদ্রলোকও তো ব্যবসা করেন। কিন্তু প্রায়ই কোন ভাল ছবি, নাটক, যাত্রা অথবা অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠানে কর্তাগিন্নীকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। সন্ধ্যের পর ওঁদের বাড়ী গেলে পান তাম্বুলের বাটা নিয়ে বসে হাস্য পরিহাসে মগ্ন দেখা যায়। শুধু ডেকারাই বা কেন ? বড়ুয়া, দত্ত, সেনাদের বাড়ীতেও তো ঐ একই ছবি। ব্যতিক্রম বুঝি শুধু চৌধুরী বাড়ীর বেলাই ? কর্তার সময় নেই। ভাল ছবি এসেছে হাঁপাতে হাঁপাতে টিকিট দিয়ে বললেন, "ভীষণ কাজে জড়িয়ে পড়েছি রুমি। অফিসে লোক বসে আছে। লক্ষ্মীটি দীপুকে নিয়ে তুমি চলে যাও। আজই শেষ রাত। মোহনের রিক্সা বলে এসেছি, দেরী করো না। তৈরী হয়ে নাও।" বলেই বাইক নিয়ে হাওয়া, এর নাম কর্তব্য করা ? অমন কর্তব্য না করলেই বা কি ? একরাশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে, সে চাকরের ঢালাও ব্যবস্থা করে দিয়েই সে মনে করে কর্তব্য করা হয়ে গেল। শুধু প্রাচুর্য্যই কি জীবনে শান্তির একমাত্র উপায় ? রমা তো মানুষ। তার মনের চাহিদা বলেও তো কিছু আছে ? ত্বদণ্ড পাশে বসা, একটু হাসি, একটু গল্প, একটু আশা করাও কি ত্বরাশা ?

সে কি শুধু খেলাঘরের পুতুল ? শাড়ী কাপড় গয়নাগাটি দিয়ে সাজিয়ে রাখার জিনিস ? তার মন বলে কিছু নেই ? সেই মনের কোন চাহিদা নেই ? সে চাহিদা মেটাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা কি দিবাকরের আছে ? সে কি শুধু দিবাকরের সংসারে সাজানো পুতুল ?

দিনের পর দিন এভাবেই দিবাকরকে বিচার বিশ্লেষণ করে চলেছে রমা। ফলে একটা চাপা আক্রোশ মনের কোণে দানা বেঁধে উঠেছে তার। কিন্তু সে জানে না আপন কাজ নিয়ে দিবাকরের মত্ততার পেছনে কাজ করছে একটি প্রতিবাদ, একটি প্রতিজ্ঞা। দিবাকর রমাকে এ কথাটা কখনও জানতে দেয় নি পাছে সে আঘাত পায়।



বিয়ের পরই দিবাকরের চাল ও আলু চালানের ব্যবসায় চরম ক্ষতির সংবাদ এলো হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অসহযোগীতার ফলে। এর কিছুদিনের পরই এলো দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা দানের মাউণ্ট ব্যাটন প্রস্তাব। ঘর ছাড়া হবার সম্ভাবনায় ভীত সন্ত্রস্ত এই যৌথ পরিবারের শরিকে শরিকে শুরু হলো বাদ বিসম্বাদ, ষড়যন্ত্র ও আড়াআড়ি। শরিকদের বঞ্চনা করে কে কত বেশী টাকা সম্বল করে অন্যত্র পাড়ি জমাবে তারই প্রতিযোগীতা। এর ফলে দিবানাথ ও দিবাকর সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হলো। দাদা দিবানাথ ব্যাঙ্কের অফিসার। সুতরাং তাঁর দাঁড়াবার উপায় ছিল। কিন্তু দিবাকর! সে তো প্রায় স্বর্ব-স্বান্ত। এই সংসারে পা দিতে না দিতেই সোনার সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে তলিয়ে যাওয়াতে, শঙ্কিত মা, মাসী ও বোন কথা প্রসঙ্গে রমাকেই দায়ী করেছিলেন এবং অলক্ষ্মী বলে অবিহিত করেছিলেন। জ্বলে উঠেছিল দিবাকর, শুরু হলো পরিবারের সবার সঙ্গে মন কষাকষির পালা। সেদিন সবার সাম্‌নে এই অন্যায় মন্তব্যের জন্যে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল দিবাকর এবং জোর গলায় বলেছিল সে প্রমাণ করবে রমা অলক্ষ্মী নয়। শুধু তারই নয়, সারা সংসারের লক্ষ্মী সে। সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতেই দাদা-বৌদির সাগ্রহ অনুনয় তুচ্ছ করে, রমাকে নিয়ে নিঃসম্বল, নিঃসহায় দিবাকর ভেসে পড়েছিল, পাড়ি দিয়েছিল আসামের এই সুদূর প্রান্তে। প্রতিজ্ঞা এখনও পূর্ণ হয়নি কিন্তু হ'তেও দেরী নেই আর। কোলকাতায় বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। আগামী দু'তিন বছরেই যে তা রূপায়িত হবে তা একরকম নিশ্চিত। আজ পায়ের নীচে শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের ছবি দেখে সে। এই আনন্দেই মশগুল সে। পঞ্চাশের ভূমিকম্প তার কাছে শাপে বর হয়ে এসে ত্বরান্বিত করেছে তার স্বপ্নপূরণের আশা। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলে তবেই সে রমাকে সব কথা খুলে বলবে।

রমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এতকাল কাজের পেছনে ছুটেছে দিবাকর। কিন্তু এখন কাজই তার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই

দিবাকর ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। বাড়তি এ সুযোগ হেলায় হারাতে ভয় পায়, পাছে লক্ষ্মী বিমুখ হোন। মুখে কিছু বলে না কিন্তু মনে মনে হিসেব করে চলেছে দিবাকর। অদূর ভবিষ্যতে বড়দার জায়গায় বৌদি এবং বর্তমানে এক মাড়োয়াড়ী ফার্মে কর্ম নিযুক্ত ছোট ভাই দিনান্তকে অংশীদার করে বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করবে সে।

রমা এসব জানে না। তাই দিবাকরের এই কর্মব্যস্ততাকে তার প্রতি অবহেলা বলে মনে করে সে ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মান। এখানে হিসেবে ভুল করেছিল দিবাকর।

অশান্ত মনের টানা-পোড়েনে যখন প্রায় বিধ্বস্ত রমা, তখনই কাজল ও নিখিলের অনুপ্রবেশ ঘট্‌লো এ সংসারে। হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলো রমা। ডিব্রুগড়ের মত দ্রুত উন্নতিশীল সহরে এতো লোকের মাঝেও বড় নিঃসঙ্গ মনে হতো নিজেকে। যারা কাছাকাছি আস্‌তে চায় তারা কেউ তার পছন্দের মানুষ নয়। তাই কাজল ও নিখিলের আগমন খুশীর জোয়ার বইয়ে দেয় তার প্রাণে।

নিখিল রমার ছোট ভাই গানুর সহপাঠী ও প্রাণের বন্ধু। ছোট-খাটো, শান্ত-শিষ্ট নির্বিরোধী মানুষ। ভীষণ লাজুক। ছেলেবেলা থেকেই দিদি বলে ডেকে এসেছে। এখনও তাই ডাকে এবং সমীহ করে আগের মতই।

কিন্তু কাজল স্বতন্ত্র। বয়সে গানু বা নিখিলের চেয়ে বেশ বড় হয়ত রমারও বড়। অত্যন্ত প্রাণবন্ত, চঞ্চল ও স্ফূর্তিবাজ। নাতিদীর্ঘ এবং একটু মোটাসোটা হলেও অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা। গায়ের রং নামের মর্যাদা রেখেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যহানি হয়নি মোটেও।

নিখিল মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই সারা আপার আসামের সহর, গ্রাম, গঞ্জ চষে বেড়ায় ব্যবসার ধান্দায়। যে ক'দিন সহরে থাকে, সকাল সন্ধ্যা মেডিক্যাল কলেজ, ডাক্তারদের চেম্বার এবং সহরের ওষুধের দোকানগুলি টহল দিয়ে কাটিয়ে দেয়। সে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই। বাপ-মায়ের বড় ছেলে। অনেক-গুলি ভাইবোন নিয়ে বিব্রত বাবাকে সাহায্য করতে হয় তাকে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে হঠাৎ এক একদিন দিদির কাছে আসে। সামান্য আদর যত্নে গলে যায় সে।

কাজলের অবসর অফুরন্ত। প্রথম দিকে কয়েক মাস তাকে খুবই ঘুরতে হয়েছে, এজেন্টদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে, নতুন এজেন্ট নিয়োগ করতে, পার্টিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকি-বহাল হ'তে। এখন সহর ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে যায় সে। বাড়ীতেই তার অফিস। মাঝে মাঝে লোকজন আসে, নিজের লড়বড়ে টাইপ রাইটারে দুচারখানা চিঠি টাইপ করেই ক্লান্ত হয়ে ছুটে চলে আসে তার "মিষ্টি বৌদির" দরবারে চা বা কফির তৃষ্ণা নিয়ে। একটু আয়াসী ও আড্ডাবাজ তো বটেই, বেপরোয়াও কম নয়। চাকরী আছে ভাল কথা, যদি যায়-যাক্ কোন মাথা ব্যথা নেই তার। এজেন্টদের মারফৎ কাজ পায়। দরকার হলে ওঁরাই বাড়ীতে এসে যোগাযোগ করে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিবাকরও। তারই সুপারিশে বেশ কয়েকটি এদেশীয় চা-কোম্পানী, স্থানীয় গুদাম ও কারখানার বীমা করিয়ে হেড অফিসের প্রশংসা অর্জন করে আনন্দ ধরে না তার। নিয়মরক্ষা করতে মাস দুমাসে সাত আটদিন সহর ছেড়ে বাইরে যেতে হয় নেহাৎ অনিচ্ছা স্বত্বে, সহরে যখন থাকে মিষ্টি বৌদির বাড়ীই তার ঠিকানা। ভাল গান গায়। গল্পে গানে সরগরম রাখে বাড়ী।

ফলে রমাও ঘরবন্দী হয়ে পড়েছে। আগে যদিও বা বাইরের দু'একটা বাছাই অনুষ্ঠানে গান করতে যেতো, এখন কোন না কোন অজুহাতে সেগুলি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। দেখে শুনে দিবাকর খুশী হয়। আরও খুশী হয় রমার স্বভাবের পরিবর্তনে। কথায় কথায় তর্ক করা বা দোষারোপ করার প্রবণতা খুবই স্তিমিত। হাসি, গল্প, গানে বাড়ীর আবহাওয়া পাল্টে গেছে। সব কিছুই খুব সহজ ও সুন্দর মনে হয় দিবাকরের কাছে।

কদাচিৎ হলেও এমন লোক সংসারে মাঝে মাঝে দেখা যায় যারা মুহূর্তে পরকে আপান করে নিতে পারে। কাজল তেমনি একজন। এলাম, দেখলাম, জয় করলাম গোছের। দু'দিনের পরিচয়ে যেন ঘরের লোক হয়ে গেছে। কথায়-বার্তায় হাস্য-পরিহাসে তার জুড়ি নেই। তাছাড়া গান? আবৃত্তি? বসে শোনার মত। আপন পর ভেদ নেই। দরকার হলে নিজেই গিয়ে চা বা কফি তৈরী করছে, ময়দা মেখে বেলুন

চাকি নিয়ে বসে গেছে লুচি পরোটা ভাজতে। হঠাৎ কোনদিন হাতে একটা মুরগী বা একতাল হরিণের মাংস এনে নিজের হাতে কেটে-কুটে বসে যায় মাংস রান্না করতে। এক কথায় সে রীতিমত ঘরোয়া হয়ে গেছে ক'দিনের পরিচয়েই। এখানেই নিখিলের সঙ্গে তার বিরাট ফারাক।

দিবাকর তো মুগ্ধ! কি সুন্দর, সহজ সরল স্বভাব ছেলেটির? কি সুন্দর গলা? রবি ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ, নজরুলকে যেন গুলে খেয়েছে। সত্যি এমন ছেলে দেখা যায় না। প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দিবাকর। তাই একদিন রমা যখন নতুন উৎসাহে গান শেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে, খুশী হয়ে দিবাকর বলে, "কাজের মত কাজ হ'বে! এ সুযোগ ছেড়ো না।"

শুরু হলো গান শেখা। অবশ্য নিয়ম করে সময় বেঁধে গান শিখতে বসা নয়। যখন খুশী, তখন। দীপু স্কুলে চলে যাবার পর ঢালাও অবসর রমার। কাজল হঠাৎ এলো, হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে শুরু হলো গান শেখানো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অসুবিধের কিছু নেই। বাড়ীতে কাজের লোকের তো অভাব নেই। আবার এমনও হয়েছে কাজলের মেজাজ নেই। ফষ্টি-নষ্টি করে পর পর কয়েক কাপ চা বা কফি ধ্বংস করে চলে গেছে। কোনও দিন হয়ত সন্ধ্যের পর এলো গান শেখাতে। মোট কথা, কাজলের গান শেখানো নির্ভর করে তার মন ও মর্জির ওপর। রমা কিন্তু বিরক্তি হয় না। বাধ্য ছাত্রীর মতো সে সব সময়ই তৈরী থাকে, তা সে গান শেখানোই হোক বা নির্জলা আড্ডাই হোক্।

এই গান শেখার ফলে কাজলের সাহচর্য্যে নতুন প্রাণ পেয়েছে রমা। কাজলের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, রঙ্গপরিহাস উপভোগ করে সে। এই গান শেখাকে কেন্দ্র করে ওদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে আরও। ওরা বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়া-ঝাঁটি, তর্ক-বিতর্ক, হাসি-ঠাট্টা চলে অবাধে আপন খেয়ালে। স্তম্ভিত জীবনে এই চাঞ্চল্যের সাড়া চাঙ্গা করে তোলে রমার মন। খুশীর ঝিলিক ওর চোখে মুখে। অহেতুক জটিল চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মন হয়েছে উদার। দিবাকরের প্রতি এতকালের অভিযোগগুলি ধীরে ধীরে যেন অস্পষ্ট হয়ে আস্ছে।

রমার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে দিবাকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সত্যিই প্রয়োজনীয় সঙ্গ তো সে দিতে পারে না রমাকে। দিনের পর দিন একা একা আপন মনে নানা চিন্তার জটে জড়িয়ে পড়ে এক বিরূপ মানসিকতার চাপে ক্লিষ্ট হয়ে সে সব সময় মনে করতো যে তাকে বিব্রত ও হেনস্থা করতেই যেন দিবাকর চায়। কাজলের সঙ্গ এই মানসিকতা থেকে রমাকে মুক্ত করে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করে তুলছে। এই প্রতীতি নিয়ে দিবাকর কাজলের আগমনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করে।

গান শেখা এবং তারই ফাঁকে আড্ডা জমানোর মধ্যে কোন বিভ্রম ঘটেনি রমার মনে। কাজলকে আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মত সহজ মনে গ্রহণ করেছে সে। কিন্তু রমার এই সহজ মেলামেশা আলোড়ন সৃষ্টি করে কাজলের মনে। ফাঁক খুঁজে সে নিজের গোপন কামনা প্রকাশ করার সুযোগ। তাই, হঠাৎ যে দিন বেফাঁস কথাটা বলে বসে রমা, কাজল সে সুযোগ হাতছাড়া করে না।

কথা প্রসঙ্গে রমা বলেছিল, "তুমি হচ্ছো কলির কেষ্ট যেমন চেহারায় তেমনি স্বভাবে।" চম্‌কে রমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কাজল বলেছিল, "ঠাট্টা করছো? কতটুকু জানো তুমি আমার সম্বন্ধে?" সন্দেহের ছায়া ওর চোখে। হেসে জবাব দিয়েছিল রমা, "জান্‌বো আবার কি? নিজের চোখেই তো দেখেছি। সেদিন সিনেমা হলে মেয়েগুলি কেমন তাকাচ্ছিল তোমার দিকে?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাজল বলে, "তাকালেই হলো? কলির কেষ্টর পছন্দ মতো একটিও কি ওদের মধ্যে ছিল?"

"ওরে বাবা একটিকেও পছন্দ হয়নি? ভাবনার কথা! বেশ, তা হলো তোমার পছন্দের বহর খুলেই বলো, শুনি। খুঁজে পেতে দেখ্‌বো তেমন মেয়ে পাওয়া যায় কি না?"

"অত কষ্ট করবে কেন? আশে-পাশে চোখ ঘুরিয়ে দেখো—"

"তাই নাকি? আশে-পাশে?" ভুরু কুঁচকে চিন্তার ভান করে বলে, "আশে-পাশে? নাঃ, তেমন তো কেউ চোখে পড়ছে না। তুমিই বলো না ভাই, কে সে?" আহ্লাদের সুরে রমা বলে। রমার চোখে-চোখ রেখে কাজল বলে, "বল্‌বো? না থাক্। চটে যাবে তুমি।"

"না, না, চট্‌বো কেন ? বলো না শুনি কে সে ভাগ্যবতী ?"

"আগে বলো রাগ করবে না।"

"বারে, রাগ করবো কেন ? বলো না—।" ইতস্তত করে কাজল বলে, "যদি বলি, সে তুমি ?" লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রমা। "ধ্যাৎ, অসভ্য কোথাকার" বলে আর দাঁড়ায় না ছুটে পালায়।

কাজলের এই আচম্‌কা উক্তি বিব্রত করেছিল রমাকে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। সমস্ত দিকে বিবেচনা করে সে সিদ্ধান্তে এলো যে বোকার মত তার মন্তব্যের যোগ্য উত্তরই দিয়েছে কাজল। কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয়। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মনের গ্লানি কেটে গেল। স্বাভাবিক হয়ে ওঠে রমা।

তাই পরদিন রমার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করে অবাক হয় কাজল। বিমর্ষ হয় সে। রমাকে বুঝে উঠ্‌তে না পারার যন্ত্রণায় কাতর সে। অথচ প্রথম থেকেই রমার সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ, যদিও পরিচয় ছিল না। পথে-ঘাটে, সিনেমা হলে, বিচিত্রানুষ্ঠানে রমাকে সে দেখেছে। যত দেখেছে ততই মুগ্ধ হয়েছে। এই মহিলার স্বামীই যে স্বনামধন্য দিবাকর চৌধুরী ক্রমে-ক্রমে তাও সে জেনেছিল। কিন্তু পরিচিত হবার সুযোগ ছিল না আর সাহসও ছিল না তার। এর জন্যে আক্ষেপেরও অন্ত ছিল না তার।

ঘটনাচক্রে দার্জিলিংয়ে গানুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একই হোটেলের অতিথি হিসেবে। কথা প্রসঙ্গে জান্‌তে দেরী হলো না ডিব্রুগড়ের দিবাকর চৌধুরী গানুর জামাইবাবু এবং রমা দেবী তার আপন দিদি। গানুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিখিলও শিগ্‌গীরই ডিব্রুগড় আস্‌ছে শুনে উল্লসিত হয়ে ওঠে কাজল। চৌধুরীদের সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে সে প্রস্তাব দেয়, যদি নিখিল সম্মত হয় তবে হোটেলের পোড়া ভাত না খেয়ে দুজনে মিলে বাড়ী ভাড়া করে একসঙ্গে থাক্‌লে প্রবাসী জীবনে স্বস্তিতে এবং আরামে থাকা যাবে। গানু এ প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়েছিল এবং কাজলের পরামর্শ মত দার্জিলিং থেকে নেবে যাবার আগে দিদি জামাই-বাবুর নামে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে বলেছিল, "এ ব্যাপারে জামাইবাবু নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।" কেল্লাফতের আনন্দে মেতে ওঠে কাজল।

গানু ও নিখিলের বন্ধু হিসেবে রমাকে দিদি বলেই ডাকা উচিত ছিল তার। কিন্তু সে পথে গেল না কাজল। প্রথম থেকেই বৌদি শব্দটা উচ্চারণ করেছিল সে এক বিশেষ অভিসন্ধি নিয়ে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে।

এক উদ্বাস্তু পরিবারের সমস্যা নিয়ে দিবাকরের মেতে ওঠার একটা পশ্চাদ্‌পট আছে। ইতিপূর্বে কিছু দুঃস্থ-উদ্বাস্তু ছেলেবুড়োকে সে সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু এনিয়ে মাথা ঘামায়নি তেমন। কারণ তার নিজের অবস্থা তখনও এমন নয় যে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার যথেষ্ট অবকাশ ছিল তার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এক অতি দুঃস্থ উদ্বাস্তু পরিবারের ভার বাধ্য হয়ে কাঁধে নিতে হলো তাকে।

বছর তিনেক আগের কথা। এক সন্ধ্যায় শান্তিপাড়ায় তার অফিসের অসুস্থ একাউণ্টেটকে দেখে ফেরার পথে সে লক্ষ্য করে ফ্রক পরা বেশ বড়সড় একটি মেয়ে পা চালিয়ে প্রায় ছুটে চলেছে। হাতে তার চটের থলি। সম্ভবতঃ ঐ দূরের মুদির দোকান থেকে সওদা করে ফিরছে। মেয়েটির ঠিক পেছনে চার-পাঁচটি অল্প বয়সী ছোকরা অশ্লীল অশ্রাব্য খিস্তি করে চলেছে। পথ নির্জন, প্রায় জনমানবহীন। দু' একটি রিক্সা এবং সাইকেল আরোহী ফাঁকা পথে তীব্র গতিতে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো মেয়েটি খুবই ভীত সন্ত্রস্ত। মাথা নীচু করে রাস্তার ধার ঘেঁষে দ্রুত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে সম্ভাব্য আক্রমণ এড়াতে।

হাত নিশপিস্ করে দিবাকরের। কলেজে পড়ার সময় বৌবাজারে ব্যায়াম সমিতিতে নিয়মিত শরীর চর্চা করেছে; বক্সিং লড়েছে ফোর্টের গোরাদের সঙ্গে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুঠাম দেহের গড়ন আজও তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু না। দেখতে হ'বে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। ধৈর্য্য ধরে নিঃশব্দে ওদের পেছন পেছন এগিয়ে চলে দিবাকর আবছা আলো আঁধারির মধ্যে।

হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে, নালা ডিঙ্গিয়ে পাশের পড়ো জমির দক্ষিণ কোণে এক ঝুপড়ি ঘর লক্ষ্য করে পড়ি-মরি করে ছুটে চলে মেয়েটি। "এ্যাই-এ্যাই পালালো—মাল্‌টাকে ধর্" বল্‌তে বল্‌তে একটি ছেলে মেয়েটির

পেছনে ছুটে চলে। মেয়েটি ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে চলেছে। ততক্ষণে সব ক'টি ছেলে মাঠে নেমে ছুট্‌তে শুরু করেছে। দিবাকরও ওদের পেছন পেছন মাঠে নেবে পড়লো, ঝুপড়ি ঘরের সামনে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে মেয়েটি, "মা, মাগো দরজা খোল ওরা ধরে ফেল্‌লো আমায়।" সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাঁশের দরজা খুলে যায়। লম্ফ হাতে বর্ষিয়সী এক মহিলা বেরিয়ে এসে মেয়েটির হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজা আগ্‌লে বলে ওঠেন, "ছিঃ বাবা, তোমরা কেন আমার মেয়েটির পেছনে এমন করে লেগেছ? আমরা তো কারুর সাতেও থাকি না পাঁচেও থাকি না। বড় বিপদে পড়ে পাকিস্তানে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালিয়ে এসেছি ইজ্জত বাঁচাতে। এখানেও যদি সেই একই উৎপাত ভোগ করতে হয়, তা হলে যাব কোথায়, তোমরাই বলো বাবা?"

"যাবি কেন রে বুড়ি? এখানে থাক্‌তে কে বারণ করেছে? যা একখানা মাল পয়দা করেছিস্‌ তোদের যেতে দিচ্ছে কে? মালটা নিয়ে একটু ফুর্তি-ফার্তা করবো ব্যস্‌—"

"ছিঃ বাবা! এ কী ধরনের কথা তোমাদের? তোমরা আমার ছেলের বয়সী। তোমরাও তো বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ছেলে—"

"এ্যাই চুপ। চুপ কর মাগী। বেশী কথা বল্‌বি না। দে দে মেয়েটাকে বার করে দে। তা না হলে জোর করেই ভেতরে ঢুকবো—" সামনের ছেলেটি তেড়ে এগিয়ে যায়—।

আর চুপ করে সহ্য করা গেল না। এতক্ষণ নিঃশব্দে ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল দিবাকর। দু'হাত দিয়ে দুটো ছেলের গর্দান চেপে ধরে গুরুগম্ভীর সুরে বলে, "কি নাম তোদের? বাবার নাম কি?" ভরাট গলার বজ্রগম্ভীর স্বরে চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকায় ছেলের দল। লম্ফের মৃদু আলোতে দিবাকরকে চিন্‌তে পেরে আঁতকে ওঠে ওরা। "ওরে বাবা, পালা পালা!" সাম্‌নের তিনটে ছেলে সবেগে তিনদিকে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। বন্দী ছেলে দুটো ভয়ে থর থর কাঁপছে। মুখ কাঁচু-মাচু করে বলে, "আর কখনও এমন কাজ করবো না দিবাকরদা। এই নিজের হাতে নাক কান মুলছি।" ঘরের ভেতর থেকে খিলখিল হাসির রেশ ভেসে আসে। মেয়েটি হাস্‌ছে।

শান্তিপাড়ার ছেলেরা চেনে দিবাকরকে। ওরা দেখেছে তার শক্তি ও সাহসের বহর। সেই পঞ্চাশ সালের কথা। দিবাকর তখন শান্তিপাড়ার বাসিন্দা। পনরোই অগাস্ট প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আগেরদিন রাত। অসামিয়া বাঙ্গালী দাঙ্গা বাঁধাবার প্ররোচনায় মদত দিতে পঞ্চাশ ষাটজন গুণ্ডা, বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের পথ ধরে বাঙ্গালী অধ্যুষিত শান্তিপাড়ায় এসে হাজির হয়েছিল। সব ক'টি বাড়ীর আলো নিভিয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বঙ্গ সন্তানদল ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পুলিশের আগমন প্রতীক্ষায় শুক্‌নো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাচ্ছে। ঘরের চালে পাথর ছুঁড়ে, দরজায় লাথি মেরে, অশ্রাব্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে 'বঙ্গালদের হোনর (সোনার) অহম্ (আসাম) ছেড়ে চলে যাবার, জিগির তুলেছিল ঐ গুণ্ডার দল।

মাত্র সাত আটটি বাঙ্গালী ছেলে সঙ্গে নিয়ে ওদের মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে ছিল দিবাকর। বলেছিল, "এই মুহূর্তে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাও কোন আওয়াজ না তুলে। একটি কথা বলেছ কি তোমাদের একজনও বাড়ীর ভাত খাবে না।" তেড়ে এসেছিল গুণ্ডাদলের নেতৃস্থানীয় এক ছোকরা। "কেলা বঙ্গাল"—কিন্তু মুখের কথা শেষ করতে পারেনি সে ছোকরা। দিবাকরের হাতের বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি খেয়ে, "হেরা মরিলুঁ মরিলুঁ" বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আহত সাথীর দিকে ফিরে তাকাবার অবসর ছিল না গোটা দলটির। যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ ধরে নিমেষে কর্পূরের মত উবে গেল দলটি। সঙ্গের ছেলেরা ঐ আহত ছোকরাকে মারতে এগিয়ে যায়। বাধা দেয় দিবাকর। ছেলেটিকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলে নির্ভয়ে।

এবার সদর্পে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বঙ্গ সন্তানদল। আলো ঝলমল করে উঠ্‌লো সারিবদ্ধ বাড়ীগুলি। রাস্তায় নেবে এসে পলায়-মান গুণ্ডাদলকে বিদ্রূপ করে বলে ওঠেন, "পালাছিস্ কেন রে ব্যাটাবা আয় না, দেখি, কত মুরোদ তোদের।" অবাক বিস্ময়ে এই ভেড়ার পালের দিকে তাকিয়ে দেখে দিবাকর বলে, "কোথায় ছিলেন আপনারা ? এতক্ষণ ধরে মা বোন তুলে এতো গালিগালাজ, অশ্লীল খিস্তি করে গেল আপনাদের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ? মা, বোন আর স্ত্রীর পাশে বসে

সে সব খিস্তি শুনে চুপ করে লুকিয়ে রইলেন? লজ্জা করলো না আপনাদের? এক ফোঁটা রক্তও কি দেননি ভগবান আপনাদের? যান্ বাড়ী যান্। অনেক বীরত্ব দেখান হয়েছে আর নয়। ফাঁকা ময়দানে নেচে কুঁদে লোক হাসাবেন না। এক্ষুণি পুলিশ আস্‌ছে হাতের কাছে পেলে সারারাত্রি হাজতবাস করিয়ে ছাড়বে।"

এই হলো দিবাকর। ছেলে ছুটোর চুলের ঝুঁটি ছু'হাতে টেনে ধরে দিবাকর বলে, "খুব সাবধান! আমি রোজ এসে খবর নেব। কোন গোলমাল হয়েছে যদি শুনি তা হলে জেনে রাখিস্, জীবনে সোজা হয়ে হাঁট্‌তে পারবি না তোদের একজনও! মনে রাখিস্, তোদের সবাইকে আমি চিনি। গোলমাল হলে তোদেরকেই ধরবো প্রথম। এখন যা। কিন্তু যাবার আগে পায়ে ধরে এঁকে প্রণাম করে যে জঘন্য ভাষায় এঁর সঙ্গে কথা বলেছিস্, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নে।"

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে এই দৃপ্ত পুরুষটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওরা চলে যেতেই বলে ওঠেন, "বাবা, কি যে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি সে আমিই জানি। খাওয়া পরার ব্যবস্থা নেই, তবু খেয়ে না খেয়ে চুপচাপ এই কোণে পড়ে আছি, কিন্তু উৎপাতের শেষ নেই। মনে হয়, ছেলেগুলিকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ জমি থেকে আমাদের উৎখাত করতে। যেতে তো হবেই কিন্তু কোথায় যাই—!" ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন মহিলা।

দিবাকরকে ভেতরে ডেকে এনে বসিয়ে ছিলেন সেই মহিলা। স্যাঁত স্যাঁতে বিছানার এক পাশে বসেছিল দিবাকর। মেয়েটিকে ডেকে চা করতে বলেন ভদ্রমহিলা। ভাতের মাটির হাঁড়ি নামিয়ে ভাঙ্গা সস্‌প্যান বসায় উনুনে মেয়েটি। সেই উনুনের আগুনের ছটায় দিবাকর দেখেছিল মেয়েটিকে। কালো বটে কিন্তু অপূর্ব সুন্দর চোখ, মুখ, নাকের গড়ন মেয়েটির, যেন খোদাই করা। বয়স পনরো ষোল হ'বে। এই অভাবের সংসারে এমন সু-স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হলো কি করে মেয়েটি, ভেবে পায় না দিবাকর।

উনুনের পাশে ছেঁড়া মাতুর পেতে বসেছিল ছোট একটি দশ বারো বছরের ছেলে। তেল চিট্‌চিটে ছেঁড়া পুঁথি নিয়ে নুয়ে বসে লক্ষের স্বল্প

আলোকে পাঠরত। ভদ্রমহিলার সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান মাধু। কাছে গিয়ে বইখানা কি দেখেছিল দিবাকর। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ তৃতীয় খণ্ড। বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন বই নেই। দিনের পর দিন এ বইটিই একমাত্র সঙ্গী ছেলেটির। পড়ার ইচ্ছা। কিন্তু সঙ্গতির অভাবে সে ইচ্ছা চেপে রেখে একমাত্র সম্বল এই পুঁথিখানাই তার দিন রাতের সঙ্গী। হায় কি দুর্দশা মানুষের।

মেয়েটি হাতল ভাঙ্গা কাপে চা এনে দিবাকরের সামনে ধরেছিল। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে দিবাকরের দিকে। সে দৃষ্টিতে ছিল রক্ষাকর্তা বীরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছোঁয়াচ। অভিভূত দিবাকর চায়ের কাপ এক হাতে তুলে নিয়ে অন্য হাতে কিশোরীর হাত ধরে টেনে এনে পাশে বসিয়ে বলেছিল, "এখানে বোস্। আমি তোর দাদা হই। এখন থেকে আর কোন ভয় নেই তোর।" ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে ছিল মেয়েটি। মা বলেছিলেন, "দাদাকে প্রণাম কর অপর্ণা।" এই মেয়েটিই অপর্ণা।

এরপর ভদ্রমহিলা বিবৃত করলেন এমন এক কাহিনী যা শুনে হতবাক হয়েছিল দিবাকর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার আশুগঞ্জে এদের পৈতৃক ভিটে। মেঘনা নদীর তীরে এঁদের পাঁচ পুরুষের বিরাট চক্‌মিলানো দালান কোঠা। ভৈরব পুলের ওপর থেকে বাড়ীটা স্পষ্ট দেখা যায়। সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ গৃহস্থ। প্রায় হাজার বিঘে জমি ভাগে চাষ হয়, এ ছাড়াও ছিল প্রচুর যুৎ-স্বত্ব ও জলকর। বাৎসরিক আয় ফেলে ছড়িয়ে সে সময়ও নগদ মূল্য চৌদ্দ-পনের হাজার টাকা। চার ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার। দেশ ভাগাভাগির সময় এঁরা দেশ ত্যাগ করেন নি। ঐ অঞ্চলের সকলেরই প্রিয় পাত্র ছিলেন এঁরা। গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের মাতবরেরা এঁদের সর্ব প্রকার নিরপত্তার আশ্বাস দিয়ে দেশ ছেড়ে যেতে নিরস্ত করেন।

পঞ্চাশের দাঙ্গায় যখন ভৈরব পুলের ওপর ট্রেন দাঁড় করিয়ে হিন্দুদের বাছাই করে পাইকারী নিধন-যজ্ঞ শুরু হয়, সেই সময় পরিচিত বন্ধু-স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু লোক নৌকা ও মাছ ধরার জাল নিয়ে পুলের নীচে প্রতীক্ষায় থাক্‌তো মাছ ধরার ভান করে। ছোরা মেরে

বা কুপিয়ে মৃত, অর্ধমৃত বা আহতদের পুলের ওপর থেকে মেঘনার বুকে ছুঁড়ে ফেলা হতো। ওদের জালে সে সব দেহ ধরা পড়তো। মৃতদেহ ও মুমূর্ষদের মধ্যে যাদের বাঁচার সম্ভাবনা কম তাদের দেহগুলি ভাসিয়ে দিয়ে, যারা আহত এবং যাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে তাদের এন তোলা হ'তো চক্রবর্তীদের দালানে। চিকিৎসার পর সুস্থ হলে মুসলমান সহযোগীদের সাহায্যে ওদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হ'তো। এর জন্য যাবতীয় খরচপত্র চক্রবর্তী পরিবারই বহন করতেন।

এমনি ভাবে শেষ এবং তৃতীয় দিন অন্যান্যদের সঙ্গে এক তরুণকে উদ্ধার করা হয়। আঘাত সামান্যই ছিল কিন্তু ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল সে। এ অবস্থায় ডুবে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। তখন পাসপোর্ট বা অন্য কোন বাধা নিষেধ ছিল না। ছেলেটি কোলকাতা থেকে ডিব্রুগড় ফেরার পথে নরসিংদি গ্রামে তার মৃত্যুপথযাত্রী পিসীমাকে দেখতে এসেছিলো। দাঙ্গার সূচনায় পালাবার পথে ভৈরব পুলের ওপর ঘটনাটা ঘটে। সুস্থ হয়ে নিজের নাম ও পরিচয় দিয়ে সে জানায় যে ডিব্রুগড়ে তার বাবার ফলাও ব্যবসা আছে, বাড়ীও আছে। চলে আসার সময় সকৃতজ্ঞ চিত্তে ছেলেটি অনুরোধ করেছিল, যদি তেমন তেমন কিছু ঘটে এবং দেশত্যাগের প্রয়োজন হয় তবে কোন দ্বিধা না করেই সবাই যেন ডিব্রুগড়ে চলে আসেন। সেখানে প্রয়োজন মত সব রকম সাহায্য তার বাবার কাছ থেকে তাঁরা পাবেন। ছেলেটি ডিব্রুগড় পৌঁছানোর পর তাঁর বাবা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করে জানিয়ে ছিলেন যে কোন সময় যে কোনও রকম সাহায্য দিতে তিনি সব সময়ই প্রস্তুত।

এর বছর দুয়েক পরে যখন পূর্ব পাকিস্তানে ভারত বিদ্বেষী ঢেউ প্রবল হয়ে উঠেছে তখন পাকিস্তানে বসবাসকারী সমৃদ্ধ হিন্দুদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চক্রান্তে মেতে ওঠে মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু বিপথগামী যুবক, যাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি একজন বিহারী মুসলমান। তারা চক্রবর্তী পরিবারকে ভারতের চর বলে প্রচার শুরু করে। সেই ভৈরবপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় চক্রবর্তী পরিবারের ভূমিকা নিয়ে জল-ঘোলা করার চেষ্টা শুরু হয়। তাদের আবেদন-নিবেদনে পাকিস্তান সরকার

নানা ভাবে এঁদের বিব্রত করতে আরম্ভ করেন। আরও বছর দুয়েক এভাবেই কেটে যায়। আইনের ম্যার প্যাঁচে বেশ কিছু সম্পত্তি এদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। পুরনো দিনের সেই সব সহৃদয় মুসলিম মাতব্বর-দের মধ্যে অনেকেই গত হয়েছেন। যাঁরা আছেন তাদের পাল থেকে হাওয়া সরে গেছে। জঙ্গী তরুণ মুসলিম নেতারা হাতে লাগাম তুলে নিয়েছেন।

দু' দু'বার ডাকাতির ছলে এদের বসতবাড়ী আক্রান্ত হলো। প্রথমবার অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার দুই অবিবাহিতা ভাসুর-ঝিকে তুলে নিয়ে যায় গুণ্ডার দল। ওদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। কিন্তু পরের বার যা হলো তা তৈমুর-চেঙ্গিসের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাড়ীর পুরুষদের দালানের থামের সঙ্গে বেঁধে সবার সামনে ভদ্রমহিলার নব-বিবাহিতা সুন্দরী অষ্টাদশী জাকে টেনে এনে বিবস্ত্রা করে তার উপর চালায় দলবদ্ধ বলাৎকার। এই পৈশাচিক ক্রিয়ার পর অর্ধমৃতা অচেতন সেই হতভাগিণীর এক এক করে প্রতিটি অঙ্গ টুকরো করে সারা উঠানময় ছড়িয়ে লুটের মাল কাঁধে তুলে নিয়ে বীভৎস উল্লাসে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ডাকাতদল চলে যায়। বল্‌তে বল্‌তে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ভদ্রমহিলা।

ডাকাতদের আগমন বার্তা পেয়ে একমাত্র সক্ষম সহৃদয় মুসলিম মাতব্বর বৃদ্ধ হাজিফ মিঞার সতর্ক প্রহরায় চক্রবর্তী পরিবারের মেয়েদের যখন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল ইজ্জত রক্ষার জন্যে, সেই সময় নব-বিবাহিতা ঐ হতভাগিণী ভয়ে ত্রাসে পথ ভুলে সরাসরি ডাকাতদের কবলে পড়ে যায়।

এরপর আর পাকিস্তানে থাকার অর্থ হয় না। গ্রামের মুষ্টিমেয় হৃদয়বান মাতব্বরেরা আর সাহস পেলেন না। তাঁদের পরামর্শ ও সাহায্যে এঁরা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গতি সম্পন্ন এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ছিন্নমূল হয়ে নানা পথে, নানা উপায়ে ভারতে প্রবেশ করলো।

ডিব্রুগড়ের সেই তরুণের আশ্বাসের উপর ভরসা করে ঐ পরিবারের সমরেন্দ্র চক্রবর্তী ত্রিপুরা হয়ে ডিব্রুগড়ে এসে দেখলেন ঐ তরুণের পিতা

ইতিমধ্যেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে গেছে। ঐ তরুণ এবং তার ভাইয়েরা কার্য কারণে অনেকদিন ডিব্রুগড় ছাড়া।

সহায় সম্বলহীন সমরেন্দ্র চক্রবর্তী চরম দুর্দশায় পড়লেন। শিক্ষা-দীক্ষা সামান্য, যাজনিক ব্যবসা করারও এলেম নেই, বয়স ও হয়েছে। এই পড়ো জমিতে ঘর বেঁধে সামান্য নগদ টাকা এবং লুকিয়ে আনা সোনাদানা ভাঙিয়ে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সোনাদানাও এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। নিজে একটি দোকানে খাতা লিখে পনরো টাকা পান। বড় ছেলে ত্রিশ টাকা বেতনে এক দোকানে ঢুকেছে। এদিকে যাঁর জমিতে ঝুপড়ি বেঁধে আছেন, তিনি চাপ দিচ্ছেন জমিটা ছেড়ে দেবার জন্যে। রিক্ত, নিঃস্ব সুধীরবাবু চিন্তাভাবনায় এখন প্রায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। সব কথা শুনে দিবাকর আশ্বাস দিয়ে এসেছিল একটা ব্যবস্থা সে করে দেবেই।

কথা সে রেখেছিল। শান্তিপাড়াতেই তার বন্ধুস্থানীয় এক ভদ্রলোকের ব্যারাক প্যাটার্নের ভাড়াটে বাড়ীর দু'খানা কামরা ভাড়া করে ওদের নিয়ে তুলেছিল। ওঁদের বড় ছেলে সাধুকে তিনসুকিয়ায় তারই অতি ঘনিষ্ঠবন্ধু এবং রমার সম্পর্কিত দাদা প্রফুল্ল তলাপাত্রের মটর গ্যারেজে মটর মেকানিজম্ ও ড্রাইভিং শিখিয়ে লাইসেন্স করিয়ে একখানা ট্যাক্সি করে দিয়েছিল ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে। ছোট ছেলে মাধু পড়াশুনায় ভাল, আগ্রহও খুব। তাকে স্থানীয় বেঙ্গলী স্কুলে ভর্তি করে দিল। কিন্তু মুশকিল হলো সেই মেয়েটি অর্থাৎ অপর্ণাকে নিয়ে। দেশে মাইনের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল। পঞ্চাশের গোলমালের পর পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ। এখানকার স্কুলে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে পড়তে সে রাজী নয়। লজ্জা করে। কিছুতেই স্কুলে যাবে না। অগত্যা সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করা এবং ফাঁক পেলেই পাড়া বেড়িয়ে বেড়ানো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সুধীরবাবুকে আরও কিছু দোকানে খাতা লেখার কাজ জুটিয়ে দিল দিবাকর।

পরবর্তী দু'টি বছরে অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সাধু নিজের

কাজের লাইন ভালই বোঝে। তার আয়ও বেড়েছে। ব্যাঙ্কের দেনার কিস্তি শোধ করে সংসারে কিছু কিছু টাকা দিচ্ছে। ছেলেটি সৎ, নম্র ও পরিশ্রমী। নিজে পড়াশুনা করার সুযোগ পায় নি বলে ছোট ভাইটিকে বিদ্বান করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মোটামুটি ভাত কাপড়ের অভাব আর তেমন প্রকট নয়। এদের পেছনে দিবাকরের মাসিক ব্যয় এখন প্রায় করতেই হয় না। তবে অভাব ঘুচলেও সচ্ছলতার মুখ এখনও ওঁরা দেখ্‌তে পান নি। তবু মন্দের ভাল। কিন্তু বাদ সাধলো অপর্ণা।

কালো হলে কি হবে? সুন্দর মুখশ্রী এবং সুগঠিত দেহ সৌষ্ঠব, সহজেই লোকের দৃষ্টি কাড়ার মত চেহারা। দোকানে সওদা করা ও পাড়া বেড়ানোর ফলে বে-পাড়ার এক ছোকরার সঙ্গে এখানে ওখানে বেড়ানো, সিনেমা দেখা ইত্যাদি করে বেড়াচ্ছিল। ঘটনাচক্রে পাড়ারই এক ভদ্রলোকের নজরে পড়ে যায়। তিনি সুধীরবাবুকে জানিয়ে দেন। মেয়েটি কিন্তু সব বেমালুম অস্বীকার করে। তার মতে ওদের উন্নতিতে ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে ভদ্রলোক এই মিথ্যা রটনা শুরু করেছেন। কথাটা দিবাকরকে গোপন করে রেখেছিলেন সুধীরবাবু এবং তাঁর স্ত্রী। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হলো না।

একটি দুঃস্থ পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার কৃতিত্বে দিবাকর আত্মতুষ্টিতে ভরপুর। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে মোটেই অবহিত ছিল না সে। বস্তুত, গত দুটো বছর নিজের কাজকর্মের সঙ্গে এই পরিবারের ভাল-মন্দ নিয়ে সে এতো ব্যস্ত ছিল যে নিজের সংসারের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাবার যথেষ্ট অবকাশ তার ছিল না। এ জন্য রমার আক্ষেপের অন্ত ছিল না শুধু নয়, এ পরিবারের প্রতি আক্রোশের পাহাড় জমে উঠেছিল তার মনে।

দিবাকর ফিরছিলো শিয়ালকাটি চা-বাগান থেকে। তখন বেলা আড়াইটে কি তিনটে হ'বে। চালখোয়া রেল স্টেশনের কাছেই এক মস্তান ছোকরার হাত ধরে রেল-লাইন পেরিয়ে এপারে আসছিল অপর্ণা। আর তখনই চোখে পড়ে দিবাকরের। সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে দিবাকর। বাইকের ব্রেক টানার ফলে রাস্তার ঘর্ষণের তীব্র শব্দে

সচকিত হয়ে সাম্‌নের দিকে দৃষ্টি মেলতেই দিবাকরকে দেখে ছেলেটির হাত ছেড়ে সরে আসে অপর্ণা। ছেলেটিও চম্‌কে উঠে, পেছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালায়। ভীত ত্রস্ত অপর্ণা তখন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থরথর কাঁপিছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে চোরা-কারবারী ও সমাজ-বিরোধী অধ্যুষিত অঞ্চলে অপর্ণা? তাও একা নয় সঙ্গে মস্তান চেহারার এক ছোকরা? স্তম্ভিত হয় দিবাকর।

দিবাকর এগিয়ে যায়। কোন কথা বলে না, কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করে না। শুধু হাত ধরে নিয়ে এসে বাইকের পেছনে বসিয়ে শান্তি-পাড়ায় নিয়ে এলো অপর্ণাকে। বাড়ীতে এসে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পায় না দিবাকর। কেঁদে কেটে সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায় অপর্ণা। ছেলেটির পরিচয় ও অপর্ণার সঙ্গে তার পরিচয়ের কোন হদিস পাওয়া গেল না। অগত্যা অপর্ণার মা ও বাবাকে যথেষ্ট সাবধান হ'তে এবং মেয়ের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পরামর্শ দিয়ে দিবাকর নিজের কাজে চলে গেল।

এই পরিবারের জন্য দিবাকরের মাথা ঘামানো আদৌ পছন্দ নয় রমার। তার বক্তব্য হলো, "প্রয়োজন হলে মাস মাস কিছু টাকা বরাদ্দ করে দাও নিজের সামর্থ্য মত। ওদের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে তোমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? ওদের জন্যে বেশী কিছু করা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয় শোভনও নয়। বরঞ্চ সরকারী সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করে দিলেই হয়। ওদের ব্যবস্থা তখন ওরা নিজেরাই করে নিতে পারবে।" কিন্তু দিবাকরের যুক্তি হলো, "একটি ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবার ভেসে যাবে আমাদের নিস্পৃহ অবহেলার জন্যে, তা কখনই উচিত নয়। শুধু অর্থ সাহায্য করে ভিক্ষুকের দল পুষ্ট করে লাভ কি? ভিক্ষুকের সংখ্যা কি দেশে কম? তার চেয়ে সহানুভূতির সঙ্গে উপার্জনের পথ যদি ওদের সাম্‌নে খুলে দেওয়া যায় তবে একদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজেদের ভরণ-পোষণের ভার নিজেরাই নিতে পারবে। এর ফলে আত্মসম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাবে তারা। ভবিষ্যতে এরাই আরও দুটো দুঃস্থ পরিবারকে টেনে তুলবে। এমনি করেই ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে দেশ।"

দিবাকরের হিসেব হয়ত ঠিকই ছিল—শুধু ধারণা ছিল না অপর্ণার বিকার সম্পর্কে। তাই আজ এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে রীতিমত চিন্তিত, শঙ্কিতও। আর এই পরিস্থিতির জন্য মনে মনে সে রমাকেও দায়ী করে।

এই বয়সে ছোট মেয়েদের সঙ্গে নীচু ক্লাসে পড়তে অপর্ণার তীব্র অনিচ্ছা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল দিবাকর। শান্তিপাড়ায় মায়ের ফুটফরমায়েস খাটার নামে বেড়িয়ে বেড়ানো—অপরিণামদর্শী মায়ের আগল-হারা প্রশয়ে মেয়েটি বয়ে যাবে। ঠিকই বুঝেছিল দিবাকর। তাই চেয়েছিল নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্‌বে অপর্ণাকে। রমার শাসন ও তত্ত্বাবধানে ঘরের কাজ কর্মের ফাঁকে কিছু লেখাপড়া শিখতে পারবে মেয়েটি ঘরে বসেই। ঘরের ছোটখাটো কাজকর্মে সাহায্য করে এবং দীপুকে সাম্‌লে রাখলে রমার পরিশ্রম বেশ কিছুটা লাঘব হ'বে ভেবেই অপর্ণাকে এ বাড়ী নিয়ে আসার প্রস্তাব করেছিল দিবাকর। সে সময় স্বাস্থ্যও ভাল ছিলো না—রমাও নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং মোটামুটি রান্নাবান্না ও দীপুকে আগলে রাখলে রমারই সুবিধা হ'বে, এ কথাই মনে হয়েছিল দিবাকরের। অপর্ণার মা-বাবাও খুশী মনেই সম্মতি দিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে। অপর্ণাও খুব উৎসাহী ছিল। কিন্তু বাদ সাধ্‌লো রমা। রমার কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এক কথায় নাকচ করে দিল। তার এই 'না' কে আর 'হাঁ' করানো গেলো না।

প্রথম দিন এ বাড়ীতে পা দিয়ে মুখোমুখী রমাকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ছিল কাজল। দূর থেকে রমাকে আগে সে দেখেছে কিন্তু সে যে এত সুন্দরী বুঝতে পারে নি সে। এ যেন স্বর্গের অপ্সরী! বিকেলের পড়ন্ত রোদে সে দেখেছিল এক মাথা ঘনকৃষ্ণ রেশমী চুল ঢেউ তুলে সারা পিঠ ছেয়ে নেমে এসেছে নিতম্ব ছাড়িয়ে। কপাল ছোট নয়; বড়ও নয় তাই বলে। সেখানে জ্বল্ জ্বল্ সিঁদুরের লাল টিপ্। সরু টানা টানা ভ্রূ দুটো যেন উড়ন্ত পাখীর ডানা। ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁটের রং স্বাভাবিক ভাবেই লাল। ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডল। চোখ দুটো যেন শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা। কাজল ব্যবহার না করেও চোখের ঘন

কালো পক্ষে কাজলের আভাস। দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং গভীর। গায়ের রং গৌর বর্ণে সূর্য্যাস্তের শেষ আভার লালচে ছোঁয়াচ। সাধারণ বেশভূষায় স্বাস্থ্য মেদবিহীন, দীর্ঘাঙ্গী, ক্ষীণ বক্ষ, ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব। পায়ের পাতার চারপাশ এমনিতেই লাল, মনে হয় বুঝি গতকাল আলতা পরা হয়েছিল পায়ে।

কাজল লক্ষ্য করেছে—বেশভূষা, সাজসজ্জা ও প্রসাধনে তেমন আগ্রহী নয় রমা। আসলে তার প্রয়োজনই হয় না। বিধাতা অকৃপণ হাতে সব কিছু ঢেলে সাজিয়েছেন রমার দেহে। পরবর্তী কালে দেখেছে কাজল, বাইরে কোথাও যাবার সময় সাদা খোলের ওপর চওড়া পাড়ের তাঁতের শাড়ী সেই সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ শুধু পরণে। গয়নাগাঁটির ব্যবহার সীমিত। হাতে রুলি, শাঁখা ও সোনা দিয়ে বাঁধানো লোহা, গলায় সরু মফ্ চেনের সঙ্গে লাল পাথরে বাঁধানো পেনডেন্ট, কানে সরু রিং। ডান হাতের অনামিকায় লাল পাথরের আংটি। সাধারণ বেশে অসাধারণ হয়ে ওঠার এমন জ্বলন্ত নিদর্শন এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি কাজলের।

এমন অপরূপার সাক্ষাৎ তার জীবনে ঘটেনি কোন কালেও। ভেবে পায় না কাজল দীর্ঘ বারো তেরো বছর বিবাহিত জীবনে দু' দু'টো সন্তানের জননী হয়ে এই রূপসম্ভার বজায় রেখে চলেছে কি করে রমা? জীবনে বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছে সে, কিন্তু রমার সঙ্গে তাদের কারুর তুলনা হয় না। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আকর্ষণে জর্জরিত সে। মনে আছে, সেই প্রথম দিন দিবাকর এসে যখন বসলো রমার গা ঘেঁসে-ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে উঠেছিল সে। ইচ্ছে হচ্ছিল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে সে দিবাকরকে। কি আছে দিবাকরের? ব্যায়াম পুষ্ট দীর্ঘ বিশাল দেহ, সবল সতেজ চোখের দৃষ্টি আর সফল জীবনে উপার্জ্জিত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। এ ছাড়া আর কি আছে দিবাকরের? অথচ এই রূপবতী নারীটি তারই অঙ্কশায়িনী। বিষ্ট এণ্ড বিউটি—এই হলো যথার্থ উপমা। এই বিষ্টের কবল থেকে এই সুন্দরীকে উদ্ধার করার চিন্তায় বিভোর কাজল শুধু স্বপ্নের জাল বুনে চলে।

কাজল অপাপবিদ্ধ তরুণ নয়। এই বয়সেই বহু নারীর অতি ঘনিষ্ঠ

সংস্পর্শে সে এসেছে। নারীমাত্রই তার কাছে ভোগের সামগ্রী। হাতে-খড়ি হয়েছিল ছয় বছরের বড় ছোট মাসীর কাছে, তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। পূজোর ছুটিতে ছোট মেসোর কর্মস্থল হাজারিবাগ গিয়েছিল বেড়াতে। মোটা দাগের ব্যাপার। স্বামীর অবর্ত্তমানে ছোটমাসী দেহের জ্বালা মিটিয়ে ছিলেন তাকে দিয়ে। সেই থেকেই শুরু। শান্ত-শিষ্ট, আদর্শবাদী, মেধাবী ছেলেটি একেবারে বদলে গেল। মেতে উঠ্‌লো নারী শিকারের নেশায়। প্রেম ভালবাসার ধার সে ধারে না। যে কোন উপায়ে প্রলুব্ধ করে নিজের যৌন লালসা পূর্ণ করাই ছিল তার একমাত্র নেশা। শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া আর কোন ভূমিকায় মা ও বোন ছাড়া অন্য কোন নারীকে সে কল্পনাই করতে পারে না। এ ব্যাপারে ভাগ্যও ছিল তার সহায়, সুদর্শন চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা এবং সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা—এই তিন মূলধন সম্বল করে এ পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়নি তাকে। একের পর এক বহু নারী এসেছে তার জীবনে। জয়ের পর জয় তাকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল। বন্ধু-মহলে "লেডি কীলার" বলে সে খ্যাত। প্রার্থিত নারীকে আকর্ষণ করার সহজাত ক্ষমতা তার আছে, এ তার বদ্ধমূল বিশ্বাস।

কিন্তু সে বিশ্বাসের শেকড় যেন আল্‌গা মনে হচ্ছে এবার। কেন না, পরের দিন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অন্যান্য দিনের মতই গান শিখতে বস্‌লো, হাস্‌লো, গল্প করলো। কিন্তু গতকালের সেই লজ্জারুণ আভা ক্ষণিকের জন্যেও ফুটে উঠ্‌লো না রমাব চোখে মুখে। বড় আশা নিয়ে এসেছিল 'লেডী কীলার' কাজল। কিন্তু নিরাশ হতে হলো তাকে। অস্বস্তিতে মন ভারাক্রান্ত হয় তার। বুঝতে পারে এ বড় কঠিন ঠাঁই। সংস্কার ও বিবেকের গণ্ডী এড়িয়ে সহজে তার ডাকে সাড়া দেবে না এ নারী। এর জন্যে চাই যথেষ্ট সময় নিয়ে ধৈর্য্য সহকারে প্রস্তুতি নেবার পালা।

মাঝে মাঝেই দিবাকরের সমালোচনায় মুখর হয়েছে রমা। বুঝাতে চেয়েছে কাজের নামে রমার সঙ্গ এড়াতে চায় দিবাকর। টাকা পয়সার দরকার সকলেরই। উপার্জনের জন্য সবাইকেই কাজ করতে হয়। কিন্তু তাই বলে ঘর বাড়ী ছেড়ে দিনরাত্রি বাইরে টো টো করে ঘুরতে

হবে ? ঘরে যারা আছে তাদের কথা ভুলে যেতে হবে ? এই যে এতদিন ধরে কাজলরা এসেছে—দেখেছে কখনও দিনান্তে একটি ঘণ্টা বসে গল্প-গুজব করতে ? বা একসঙ্গে কোন সিনেমা দেখতে যেতে ? শুধু কি নিজের ব্যবসা নিয়ে মত্ত ? পরহিতব্রতে অবসর সময়ে ব্যস্ত থাকার নেশাও কি কম ? বাড়ীতে যে একটা মানুষ আছে তার ও যে কিছু ইচ্ছে অনিচ্ছা আছে সে খেয়াল কি আছে ? মাঝে ক্লাব নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু হয়েছিল। ইদানিং এক দুঃস্থ উদ্বাস্তু পরিবারের হিল্লে করার তাগিদে এত ব্যস্ত যে ক্লাবের কথা আর শোনাই যায় না। গল্প করে বলে রমা, "খুব মহত্ত্ব দেখিয়ে তো বাইবে সবার সাম্‌নে গান গাইবার সুযোগ করে দিল। কিন্তু যখন গান শুনে সবাই মুগ্ধ, যখন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্রমাগত ডাক আস্‌তে লাগ্‌লো, মুখের চেহারা পাল্টে গেল বাবুর ! কি রাগ কি রাগ ! কোন অর্থ হয় ?"

"ঠিকই তো ? এ রীতিমত অন্যায়—" রমার পক্ষ টেনে কাজল কথাটা সুরু করতেই মুহূর্তে পাল্টে গেল রমার কথার সুর—"বারে রাগ তো হবেই। কোন নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই। সন্ধ্যে ছটায় শুরু হবার কথা। গিয়ে দেখ তখনও প্যাণ্ডেলের কাজ শেষ হয় নি। লোক এসে গেছে অথচ ভাড়া করা চেয়ার এসে পৌঁছায় নি তখনও। চারদিকে হৈ-হল্লা চিৎকার। রাত আটটায় শুরু হলো অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান লিপি থাক্‌লে কি হ'বে ? এঁর ছেলে, ওঁর মেয়ে, লিষ্ট লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। রাত বারোটায় যখন অনুষ্ঠান শেষ হলো তখন কোথায় রিক্সা, কোথায় কি ? অনেক বারই তোমার দাদা বাইক নিয়ে হাজির না হলে বাড়ী ফেরাই দায় হতো। কি করবে ব্যাচারী ! একা মানুষ, এত বড় একটা অফিস। তিনসুকিয়া, শিবসাগর, জোড়হাট, গৌহাটীতে ব্রাঞ্চ অফিস। একা একা কত পারে মানুষটা ? এক এক দিন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ফেরে—চোখ মুখ বসে গেছে। দেখে এত মায়া হয় !"

এই হলো রমা। কি করে ওর মনের গভীরে প্রবেশ করবে কাজল ? বুঝতে পারে, মুখে যতই বলুক না কেন, আসলে ওর মনের মধ্যে পাকা আসন গেড়ে বসে আছে দিবাকর। এ আসন থেকে টলানো চাট্টিখানি কথা নয়। জয়ের আশা ক্ষীণ—তবু যতক্ষণ শ্বাস,

ততক্ষণ আশ। একদা অজেয় লেডী কীলার কি দোরগোড়া থেকেই বিদায় নেবে? তা কি কখনও হয়? লেগে থাকতে হবে, মাথা গরম করে হঠাৎ কিছু করা চল্‌বে না।

ভেবেছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো। ঝোঁকের বসে ভুলই করে বস্‌লো শেষ পর্যন্ত কাজল। ঘটনাটি ঘটে ছিল "ঝনক্ ঝনক্ পায়েল বাজে" ছবিটা দেখে ফেরার পথে। ছবিটা এসেছে কিছুদিন হলো। কিন্তু দিবাকর সময় করে উঠ্‌তে পারছে না। শেষদিনের সন্ধ্যার শো'র ত্'খানা টিকিট হাতে দিবাকর বলে, "এই দেখো, সখ করে কিনলাম ছবিটা দেখ্‌বো বলে। কিন্তু কি বিপত্তি, আমাকে এখনই জোড়হাট নিয়ামিত ঘাটে যেতেই হ'বে। কাজ সেরে শো-এর আগে এসে পৌছুতে পারবো তেমন ভরসা নেই। আর কাউকে সঙ্গী করে তুমি বরং ছবিটা দেখে এসো।"

"থাক্। সঙ্গীর খোঁজে বাড়ী বাড়ী হানা দিতে পারবো না—"

"আ-হা তুমি চটে যাচ্ছ। বাড়ী বাড়ী হানা দেবে কেন? নিখিল—"

"নিখিল এখানে নেই। নওগাঁ গেছে। কেন, কাল রাতে বলে যায়নি তোমাকে?"

"তাই তো? মনেই ছিল না। তা হলে, কাজল?"

"ছবিটা কাজল দেখেছে। তার ভালও লাগেনি। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত কাজলকে নিয়েই যেতে হ'বে?"

"দোষের কি আছে তাতে? ও তো ঘরের ছেলের মতো"—দিবাকর বলে। অনেক তর্কাতর্কির পর কাজলকে নিয়ে যেতে রাজী হয় রমা।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের সমজদার নয় কাজল। বিশেষ করে গোপীকৃষ্ণের নৃত্যের ছন্দে মাটিতে গড়াগড়ি, হাস্যকর মনে হয়েছিল তার। পাশে বসে ওর নানা মন্তব্য শুনে বিরক্ত রমা অবশেষে বল্‌তে বাধ্য হয়, "ভাল না লাগলে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেতে পার। আমায় বিরক্ত করো না।"

ছবি শেষ হলো। ভীড় এড়িয়ে ওরা যখন নীচে নেবে এলো, তখন মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে। রমার মনে আশা ছিল জোড়হাট থেকে ফিরে

দিবাকর নিশ্চয়ই গাড়ী নিয়ে নীচে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দিবাকরকে না দেখে সে ক্ষুণ্ন হয়। এদিকে দীপুকে রেখে এসেছে রামলালের হেপাজতে। খাবার ও ঘুমোবার সময়ও হয়ে গেছে তার। তাড়াতাড়ি না ফিরলেই নয়।

লোকে লোকারণ্য লাউঞ্জ। দৃষ্টি সীমার মধ্যে কোন রিক্সা চোখে পড়ে না। রমার তাড়ায় এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ভিজে কোন রকমে একটা রিক্সা নিয়ে এলো কাজল।

প্রথমে, বোঝা যায় নি। কিছুদূর আসার পরই বোঝা গেল জরাজীর্ণ এ রিক্সা। চল্‌তে চল্‌তে বার বার চেন খুলে যাচ্ছে। ছাউনির ফুটো দিয়ে জলের কলের ধারার মতো বৃষ্টির জলে ভিজে ওরা জবুথবু। মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় রমার। আপন মনে গজর গজর সুরু হলো তার। কাজল যে এত অপদার্থ আজই প্রথম বুঝতে পারলো রমা। এমন একজনের সঙ্গে এসে যে সে কী ভুল করেছে—সে কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না রমা। প্রতিবাদের সুরে কাজল বলে, “বারে, আমি কি করবো ? এই বৃষ্টিতে কোন রিক্সাই ভাড়া খাট্‌তে রাজী নয়। অথচ তোমার তাড়া, একটুও দেরী করা চল্‌বে না। যত টাকা লাগে লাগুক রিক্সা চাই-ই চাই। এ ব্যাটা রাজী হয়ে গেল। তখন কি অত দেখে শুনে পছন্দ করার সুযোগ ছিল ?”

কাজল রেহাই পেলো বটে কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় এবার শুরু হলো দিবাকরের ওপর আক্রমণ। সারা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে দিবাকর। কাজের দোহাই দিয়ে সিনেমায় না আসা—দীর্ঘ দু'সপ্তাহ ধরে টিকিট কাট্‌তে ভুলে যাওয়া—শেষ দিনে টিকিট কেনা, দুর্য্যোগের দিন বেছে—এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—ভাঙা রিক্সা—ছাউনির ফুটো দিয়ে গড়ানো বৃষ্টির জলে ভিজে একসা হওয়া—এ সব কিছুই দিবাকরের কারসাজি।

ঢুকুর ঢুকুর করে রিক্সা চলেছে। চেন খুল্‌ছে, রিক্সাওয়ালা নেমে চেন লাগাচ্ছে—আর ভেতরে জলের কলের ধারায় ওরা ভিজে একাকার। রিক্সার দুলুনিতে গায়ে গা ঠেক্‌ছে। ক্রমাগত জলে ভিজে আগস্ট মাসেও শীতে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে রমা। পথ একেবারে ফাঁকা চারদিক নীরব নির্জন। কাজলের মনে বিভ্রম ঘটে যায়। রমার একঘেয়ে

বকুনি শুনে এক সময় কাজল বলে ওঠে, "শুধু শুধু বকাবকি করলেই কি অবস্থার সুরাহা হ'বে? অন্য কোন উপায়ে কি এ দুর্যোগকে উপভোগ্য করে তোলা যায় না?"

"আহা কি চমৎকার পরামর্শ—গা জ্বলে যায় শুনে—"

"খারাপ কথা কি বল্লাম। কবিগুরু এমন বাদলার কথা ভেবেই তো লিখেছিলেন, 'এমন দিনে তারে বলা যায়'—"

"যাকে বলা যায় তাকে গিয়েই বলো—"

"তাকেই তো বল্‌ছি"—বলেই দু হাত বাড়িয়ে রমাকে বুকে টেনে এনে রমার গালে নাক ঘষতে ঘষতে মৃদুস্বরে বলে, "কেবলি আঁখি দিয়ে। আঁখির সুধা—"। শেষ করার আগেই কাজলের গালে প্রচণ্ড চড় ক'ষে, চিৎকার করে রমা বলে, "এ্যাই রুখো, জলদি রিক্সা রুখ"। রিক্সা থাম্‌তে না থাম্‌তেই তড়াক করে নেবে যায় রমা। কাজল হতভম্ব। নিজের কৃতকর্মের জন্যে ললাটে করাঘাত করা ছাড়া আর কি আছে? তবু মিটমাট্ করার ক্ষীণ আশায় কাজল বলে ওঠে—"ছিঃ, ঠাট্টাও বোঝ না মিষ্টি বৌদি। নাও, উঠে এসো। ঐ তো সাম্‌নেই কালভার্ট"। "চুপ করো। কোন কথা বলো না। ঘেন্না করে তোমার কথা শুন্‌তে।" কাজল রিক্সা থেকে নেমে আসার উদ্যোগ করতেই গর্জে ওঠে রমা, "খবর্দার। তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে না। কোনদিনও না।" প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই সাম্‌নের দিকে পা বাড়ায় রমা। স্থানুর মত রমার গতি-পথের দিকে তাকিয়ে থাকে কাজল। আর কোন আশা নেই তার।

ভিজে বাড়ী ফিরে এসে সেই কথাই ভাবছিলো কাজল। তার দেখা তাবৎ নারীদের সঙ্গে রমার আদৌ কোন মিল নেই। দিবাকরের নাগপাশ থেকে এ নারীটিকে ছিনিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়, এ কথা সে জানে। তবু সুযোগ ছিল, আশা ছিল। হয়ত খেলিয়ে পারে এনে তোলা সম্ভব হ'তো। কিন্তু এখন সব কিছুই তার হাতের বাইরে। একটা সম্ভাবনার সমাধি সে নিজের হাতেই রচনা করলো মুহূর্তের ভুলে। এরপর মুখ দেখাবারই জো রইল না তার।

কাজলের আচরণে ক্ষুব্ধ রমা ভিজে ভিজে বাড়ী এলো। কাপড়

জামা ছাড়তে না ছাড়তেই দিবাকরও এসে পৌঁছালো। খুশী খুশী সুরে দিবাকর বলে, "ছবিটা দেখেছো তো? কেমন লাগ্‌লো?"

"থাক্, থাক্ আর আদিখ্যেতার দরকার নেই—" স্তম্ভিত দিবাকরের চোখের সাম্‌নে দিয়ে গট্‌গট্ করে রমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

কাজলের এই অবিমৃষ্যকারিতায় রমা ক্ষুণ্ণ, ভীষণ ক্ষুণ্ণ। সুন্দর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক এ ভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সে ভাব্‌তেও পারেনি। আশাভঙ্গের ব্যথায় রমা ম্রিয়মান।

সারারাত বিছানায় ছটফট করেছে সে। পরদিন সকালে দীননাথের কথায় জান্‌তে পারলো ভোরেই টুরে বেরিয়ে গেছে কাজল। ফিরতে দেরী হ'বে।

চালখোয়ার ঘটনার পর অপর্ণা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছে দিবাকর। মেয়েটি আঠোরো পেরিয়েছে। পড়াশুনা নাম মাত্র। সুস্থ রুচি বোধ গড়ে ওঠেনি। শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে পাকিস্তানের নারকীয় ঘটনাবলী যে তাকে প্রভাবিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে এসে অভাব, অনটন ও অপমানের মধ্যে দিনযাপনের গ্লানি ওর মানসিকতাকে বিপথগামী করে তুলেছে। তাছাড়া ওর মায়েরও দোষ যথেষ্ট। অত্যাধিক সন্তান-স্নেহ শাসনের রজ্জু আলগা করে দিয়েছে। ঘরের কাজে ব্যাপৃত মেয়ের হাতের কাজ টেনে নিয়ে, নিজে তা করা। "যা একটু ঘুরে আয়। মন ভাল হ'বে"। —এ ধরনের উক্তি ও প্রশ্রয়। সঙ্গতি থাক্ বা না থাক্ সাজগোজ করার উপকরণের যোগান, সিনেমা দেখার জন্য পয়সা দেওয়া, কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করা, মেয়ের সাম্‌নেই মেয়ের রূপের প্রশংসা করা—এ সব কিছুই অপর্ণার চরিত্র গঠনে সাহায্য করেনি।

এখন আর দেরী না করে মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যে পরিবেশে সে রয়েছে তার পরিবর্তন দরকার। রং ময়লা হলেও দেহের গড়ন ও চেহারা খুবই সুন্দর। বংশ মর্যাদাও কম নয়। মোটামুটি চিঠিপত্র লেখার বিদ্যা আছে। ঘর সংসারের কাজ ও সেলাই জানে ভালো। সেদিন অপর্ণার মা বলছিলেন যে সদৌ অসম

নারীমঙ্গল সমিতিতে সেলাই শেখানোর কাজ জুটিয়েছে সে। মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পায়। সপ্তাহে তিনদিন কাজ। মন্দ কি? সংসারে আয়ের ক্ষেত্রে তুচ্ছ করার মত কিছু নয়! শুধু শুধু পাড়া বেড়ানো, আড্ডা দেওয়ার চেয়ে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা তো ভালই। এই সমিতির পরিচালনায় আছেন মিসেস আয়েসা খাতুন। এঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কিছু রটনা শুনেছে দিবাকর। তবে সেই ত্রিশ বা বত্রিশ দশকের গোড়ায় কি ছিল না ছিল তা নিয়ে পঞ্চাশ দশকে এসে মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি? জীবনের ষাটটি বছর পেরিয়ে বর্তমানে মিসেস খাতুন সহরের অন্যতমা সম্মানিতা মহিলা তো বটে।

চিন্তা অপর্ণারও। যে চক্রে সে জড়িয়ে পড়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কি সম্ভব? সে নষ্ট হয়ে গেছে একেবারেই। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কি সে নিজে? অভাবের সংসার। বাবা ও দাদা কাজের ধান্দায় সকালে বেরিয়ে যান। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তুপুরে বাড়ী এসে তুটি খেয়েই সামান্য বিশ্রাম করে আবার কাজে বেরিয়ে যান। মার সঙ্গে ঘরে থাকে সে আর মাধু। মাধু ছেলেমানুষ তাই দোকান থেকে নূন, তেল, চাল-ডাল আন্‌তে হয় তাকেই মার ফরমায়েস মত। সেই মাঠের ঝুপড়ি ঘরে থাকে তারা তখন। বাবা ও দাদার সামান্য আয়ই সম্বল। কিন্তু সে আয় যে কত তুচ্ছ সবাই সে কথা বুঝলেও মা বুঝতে চান না! সব গেলেও আশুগঞ্জের বড় বাড়ীর জিভের স্বাদ ভুলতে পারেন নি তার মা। সংসারের আয়ে টেনে টুনে কুড়ি দিনের বেশী চলে না। বাকী দশদিন দোকানের বাকীর উপর নির্ভর করতে হয়। এতদিন সঞ্চিত সোনা দানা দিয়ে সে দায় মেটানো গেছে। হালে সোনা দানা তলানিতে এসে ঠেকেছে। বাকীও বেশ কিছু জমে গেছে। বাবাও কেমন জানি মিইয়ে গেছেন। আন্‌ছি, আনবো করে কিছুই আনেন না। দোকানের বাকীর হিসেব তাই বেশ লম্বা হয়ে গেছে। দোকানী বাকীতে জিনিস দিতে রাজী নয়। মার বকুনি খেয়ে অনিচ্ছুক অপর্ণা দোকানে যায়। দোকানী কটু কথা শুনিয়ে ফেরৎ পাঠায় তাকে। নগদ না হলে এ ছটাক জিনিসও সে দেবে না। রেগে মেগে এবার মেয়েকে নিয়ে মা দোকানে যান। দাপটে কথাবার্তা বলেন; ছেলে ও

স্বামী যে অচিরেই বেশী মাইনের কাজে যোগ দেবে সে কথা শুনিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। সগর্বে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, "কী? দেখলি? 'কথার আছে শতেক বাণী, যদি কথা কইতে জানি'। দোকানীর সাম্‌নে মিন্‌মিন্‌ করে থাক্‌লে চল্‌বে?"

"কিন্তু মা, বাবা আর দাদার নতুন চাকরীর কথা তো শুনি নি।"

"আরে দরকার পড়লে সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে বল্‌তে হয়। তোর বাবার না হোক সাধুর বেতন তো একদিন বাড়বে?" এরপর আর কোন কথা যোগায় না অপর্ণার।

মায়ের বকুনী খেয়ে তাকে বারে বারে যেতে হয়েছে। যে কোন উপায়ে জিনিসগুলি আন্‌তেই হ'বে। অপমান, কটূক্তি করে দোকানী তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বারবার। তবু মা তাকে আবার পাঠিয়েছেন সেই দোকানেই। দেবে না কেন দোকানী? কই তিনি নিজে গেলে তো ফিরিয়ে দেয় না দোকানী। তবে? খালি হাতে ফিরলে বকুনি-ঝকুনি, কিল, চড় প্রাপ্য হয় তার। অগত্যা লজ্জা শরমের বালাই ঘুচিয়ে দোকানীর পা ধরে সেধেছে, কেঁদেছেও। অবশেষে দোকানীর যেন দয়া হলো। কিন্তু সে দয়া কি এমনি? "ডাবকো ছুকড়ী" ফ্রক পরলে কি হ'বে? উপ্‌চে পড়া যোবন তো ঐ ফ্রকে ঢাকা পড়ে না। এই যৌবনই প্রলোভিত করে দোকানীকে। মালের দাম উশলের পথ খুঁজে পেল যেন দোকানী।

সকাল সন্ধ্যা দোকানে ভীড় থাকে। দু'হাতে ক্রেতাদের জিনিস মেপে দিতে কূল পায় না দোকানী। হিসেব করবে কখন? কথা বস্‌বে কখন? তাই তাকে বেলা সাড়ে এগারটার পর আস্‌তে বলে। সেই নির্দেশ মতোই দোকানে হাজির হয় অপর্ণা। দোকানী তাকে বল্‌তে বলে। লোটার গরম চা কাঁসার গেলাসে ঢেলে ওর হাতে তুলে দিয়ে "জেরা ঠেড়তে" বলে তাকে। অবশেষে দোকানের কাজ সেরে, সাম্‌নের ঝাঁপ ফেলে, পেছনের কোঠরীর দিকে চলে যায়। হাত মুখ ধুয়ে, তেল চিট্‌চিটে গামছায় গায়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে ইঙ্গিতে অপর্ণাকে ভেতরে আস্‌তে বলে। ইতস্ততঃ করে অপর্ণা। ভেতরে যাবার প্রয়োজন কেন বুঝতে না পেরে সংশয়াকুল চোখে চেয়ে থাকে। দাঁত মুখ খিচিয়ে

দাঁড়ানো। ম্যানেজার প্রশ্ন করেছিল মহিলাটিও কি তরুণটির প্রতি অনুরক্তা। জবাবে শুধু হেসেছিল তরুণটি।

কেঁপে উঠেছিল অপর্ণা। এ কী শুনছে সে? রমা বৌদিকে সে পছন্দ করে না ঠিকই কিন্তু তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ, ছিল না। নির্মল, নিষ্পাপ সে চরিত্র। কিন্তু এ সব কী শুনলো সে? দাদাভাইয়ের জন্য বিচলিত হয়ে পড়ে সে। কিন্তু এই তরুণটি কে? দাদাভাই এবং সেই সঙ্গে রমা বৌদির সঙ্গে পরিচয়ই বা কি করে হলো তরুণটির? রমজানকে পরে প্রশ্ন করে জেনেছিল যে তরুণটি ব্যানার্জি-বাবু বলেই পরিচিত। পুরো নাম সে জানে না, কোথায় থাকে তার তার জানা নেই। নিদারুণ সমস্যায় জরজর অপর্ণা। কি উপায়ে দাদা-ভাইকে সাবধান করবে ভেবে পায় না সে।

দীর্ঘদিন বাইরে কাটিয়ে সহরে ফিরে এসেছে কাজল। কিন্তু রমার মুখোমুখি হবার সাহস তার নেই। নিজের ক্ষণিক মতিচ্ছন্নতায়, যা ঘটলেও ঘটতে পারতো, আর কখনই তা ঘটবে না। এই সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে অসীম নৈরাশ্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে কাজল। মুখোমুখি হবার ভয়ে গলিপথ এড়িয়ে নিজেদের বাড়ীর সামনের সদর রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা করে সে। ঘুর পথ বটে। কিন্তু উপায় কি? বড্ড মন মরা কাজল।

আড্ডা গান গল্প নিয়ে কিছুদিন যাবৎ কাজলের সাহচর্য যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই অভ্যস্থ জীবন চর্চা ব্যহত হওয়ায় রমা বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। গত পনরো দিন একা একা বড্ড ফাঁকা মনে হচ্ছে দিনগুলি। যে তিক্ত মন নিয়ে সেদিন রিক্সা থেকে নেমে এসেছিল ধীরে ধীরে তার তীব্রতা কমে এসেছে। এখন মনে হয় হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে বসেছিল কাজল। মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। উড়নচণ্ডী গোছের ছেলে তো, রসিকতা করতে গিয়ে উৎসাহের চোটে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। তারও এতোটা রূঢ় হওয়া উচিত হয় নি। শান্ত চিত্তে কোথায় ত্রুটি তা কাজলকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। খুব আঘাত পেয়েছে ছেলেটা। দুঃখ অনুভব করে রমা কাজলের জন্যে। অবাক বিস্ময়ে দিবাকর বলে, "সে কী! কাজ

নিয়ে এতো সিরিয়াস হলো যে হঠাৎ কাজল ? ওপর থেকে চাপ দিচ্ছে নাকি ? পনরো দিন কেটে গেল অথচ ট্যুর শেষ হচ্ছে না ভায়ার ? আশ্চর্য্য তো ?" রমা কোন মন্তব্য করে না।

নিখিলের মুখে কাজলের ফিরে আসার সংবাদ জেনেছিল রমা। কিন্তু এরপরও চার-পাঁচ দিনে কেটে যাওয়ার পরও কাজল এ মুখো হলো না দেখে একদিন নিখিলকেই প্রশ্ন করেছিল, "হ্যাঁ রে কাজলের ব্যাপার স্যাপার কি ? ও কি এখানে নেই ?"

"বারে, এই তো মাত্র সেদিন লম্বা ট্যুরে সেরে এলো। এখন কোথায় যাবে ?"

"ওর কি হয়েছে রে ? একেবারেই দেখা যায় না তাকে ?"

"কি আর হবে ? খুব কাজের চাপ পড়েছে। প্রায়ই তো এজেন্টদের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে। বাকী সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে খটাখট টাইপ করছে। প্রশ্ন করলে বলে খুব চাপ পড়েছে।"

রমা অনুমান করতে পারে কাজলের অবস্থা। আহা বেচারী সেদিনের সেই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে দিকভ্রান্ত হয়েছিল। কোন অসৎ উদ্দেশ্য তার ছিল না। আসলে ছেলেটা খারাপ নয় ? একটু পরিহাস করতে গিয়ে মাত্রা হারিয়ে দুষ্কর্মটা করে বসেছিল। এখন বুঝতে পেরে লজ্জা ঘৃণায় মরমে মরে আছে ছেলেটা। করুণায় নম্র হয় রমার মন। নিজের অজান্তেই কাজলকে মনে প্রাণে ক্ষমা করে বসে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ধের্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তার। নিজেই এগিয়ে গেল রমা কাজলের অভিমান ভাঙাতে।

সকাল বেলা দীপুকে স্কুলে রওনা করে দিয়ে গলি পথ ধীরে সোজা কাজল-নিখিলের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায় রমা। বাড়ীর সামনের বারান্দায় ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল কাজল রাস্তার দিকে চেয়ে। "কী হলো কালাচাঁদ বাবুর ?" চমকে ওঠে কাজল। কার কণ্ঠস্বর ? ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায় সে। এক মুখ মিষ্টি হাসি নিয়ে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রমা। চকিতে একটা ভাবনা, একটা প্রত্যাশা খেলে যায় কাজলের মনে। তবে কি অল্ ইজ নট্

নষ্ট? কিছুই হারায় নি সে? উচ্ছ্বসিত আনন্দে কিছু বল্‌বার আগেই রমা বলে, "কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত্ না?"

"কি করবো? তোমার কাছে যেতে নিষেধ করেছ, আমার কথা শুন্‌তে নাকি তোমার ঘেন্না করে"—অভিমানের সুর কাজলের কণ্ঠে।

"যখন বলেছিলাম তখন ঠিকই বলেছিলাম প্রয়োজন ছিল বলেই। এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে সুতরাং—"

"ও মিষ্টি বৌ—তুমি এতো ভাল। আমি তোমায় ভালবাসি—" প্রবল উচ্ছ্বাসে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে কাজল। পেছনে সরে যেতে যেতে রমা বলে, "জানি তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু সব ভালবাসাই কি একই রকম?" রমার কথায় উৎসাহ থিতিয়ে যায় কাজলের। দু পা পিছিয়ে আসে সে। রমা বলে চলে, "আমার স্বামী দিবাকরকে আমি ভালবাসি, আমার ছেলে দীপুকেও ভালবাসি। তাই বলে কি এই দুই ভালবাসার বহিরঙ্গ এক? তোমায় ভালবাসি আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো। সেই ধরনের ভালবাসাই তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা। কমও নয়, বেশীও নয়।"

অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে কথাগুলি শোনে কাজল। অদ্ভুত অনুভূতির জোয়ারে ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে ওর সর্বাঙ্গ; তারপরই জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছুটে এসে নতজানু হয়ে রমার পায়ে হাত রেখে কাজল বলে, "আমায় ক্ষমা করো মিষ্টি বৌদি।"

প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত রমা। ডান হাত দিয়ে কাজলের চুল মুঠ করে টেনে বলে, "হয়েছে, হয়েছে। এবার ওঠো। ক্ষমা টমা আবার কি? ভুল মানুষ মাত্রেই করে। ও সব কথা এখন থাক্। ওঠো দিকি, অনেক দিন একসঙ্গে বসে কফি খাওয়া হয়নি। চলো এখনই দুজনে বসে গুলজার করে খাই।" রমার পিছু পিছু এ বাড়ীতে আসে কাজল। মেঘ কেটে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজো এসে গেল। বেঙ্গলী এ্যামেচার ক্লাবের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে দিবাকরের দল এবার ভারী। সম্পাদক মশাই দিবাকরকে স্নেহ করেন ছোট ভাইয়ের মতো। নাট্য-সম্পাদক সুকুমার দিবাকরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রস্তাবটা সেই দিল। সম্ভবপর হলে

রমা কি রবীন্দ্রনাথের কোন নৃত্য-নাট্য মঞ্চস্থ করার ভার নেবে? দলগত রেশারেশির ফলে গত দু'বছর ক্লাবের কোন অনুষ্ঠানে রমাকে ডাকা হয় নি। এমন কি রবীন্দ্র সঙ্গীতে এ সহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হওয়া স্বত্বেও রেবা মুখার্জি প্রযোজিত শাপমোচনে রমাকে ডাকা হয়নি। সেবারে সেই শাপমোচন অনেকেরই ভাঃ লাগে নি। তা স্বত্বেও কিছু স্তাবকদের পাল্লায় পড়ে ডিগবয় ইণ্ডিয়া ক্লাবে শাপমোচন মঞ্চস্থ করে রীতিমত নাজেহাল হয়েছিলেন রেবা মুখার্জি।

কথাটা মনে ধরে দিবাকরের। সহযোগীতা করে না চলে একটা চাপা অভিমান আছে রমার মনে। এবার সে ভুল ভেঙ্গে দিবে দিবাকর। তাছাড়া যে হীন ষড়যন্ত্র করে গত দু'বছর রমাকে ক্লাবের সব অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবার তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হ'বে। সে নিজেই স্থির করে এবার শাপমোচনই মঞ্চস্থ করা হ'বে। সর্বশক্তি নিয়ে সে দাঁড়াবে পেছনে। যে করেই হোক রমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গত অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হ'বে।

বাড়ীতে এসে কাজলকে দেখে খুশী হয় দিবাকর, বলে, "তুমি আছ, ভালই হলো। আমার বন্ধু সুকুমার এবার ড্রামা সেক্রেটারী। সে খুব ধরেছে রমাকে দিয়ে একটা নৃত্য-নাট্যে পূজোয় নামাতে। আমি রাজী হয়েছি—"

"কেন? আমায় কেন? তোমাদের রেবা দেবীকে গিয়ে বলো" —রমা বলে। "তাঁকে বল্‌তে যাব কেন? যা কেরদানী দেখালেন, তাকে ডাক্‌তে যাবে কে? এবার আমরা দলে ভারি। কাউন্সিলে এবার সুকুমার ছাড়া আমি আর ভৈরবও আছি।"

"ও কাউন্সিলে ঢুকে পড়েছে? সময় আছে হাতে, না?"

"দূর ছাই, কিছুই বুঝতে চাও না। আমায় জোর করে—"

"তাই বলো? আমি ছাড়া আর সবার জোর খাটে তোমার ওপর, না?" শ্লেষের সঙ্গে বলে রমা।

"বাঃ কি কথার কি জবাব। যাক্‌গে সুকুমার এলে যা বল্‌বার বলো। এ ব্যাপারে আমার নাক না গলানোই ভাল।" অভিমানের স্বরে কথাগুলি ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দিবাকর।

"বারে যাচ্ছ কোথায় ? চলো খাবার টেবিলে গিয়ে বসি—" নরম সুরে বলে রমা।

খাবার টেবিলে বসে এবার প্রসঙ্গটা তোলে রমা নিজে। উৎসাহ ভরে দিবাকর বলে, "স্টেজের সেটসেটিং আর লাইটে এমন খেল্ দেখাব যে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে। কমলিকার গানগুলি তুমি, আর অরুণেশ্বরের গান গাইবে কাজল। উঃ, যা জম্‌বে না—" চোখে মুখে কথা বলছে যেন দিবাকর, খুব ভাল লাগে রমার। ওখানে বসেই ঠিক হলো যে শাপমোচনই করা হ'বে খুব জাঁক জমকের সঙ্গে, সময় নিয়ে রিহার্সেল দিয়ে।

যথাসময়ে সুকুমার এসে যথারীতি অনুরোধ জানিয়ে গেল রমাকে। রমাও রাজী হলো শুরু হলো শিল্পী নির্বাচনের পালা। দু'দিন পর নাচ গানের জন্য শিল্পীদের লিষ্ট অনুযায়ী বাড়ী বাড়ী ঘুরে দিবাকর ও রমা অভিভাবকদের সম্মতি ও অনুমতি নিয়ে এলো। দিবাকর যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজী করিয়ে এলো।

প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে দিবাকর মেতে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজের তিনটি প্রত্যাশা সে পূরণ করতে চায়। এক, হলো রমাকে তার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। দুই, হলো রমার কাছে এ কথা প্রমাণ করা যে উপযুক্ত স্থানে ও সময়ে সে রমার সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগীতা করতে প্রস্তুত। আর তিন, হলো যেখানে সেখানে গান করতে যাওয়ার মানসিকতা থেকে রমাকে বিরত করা।

দু'চার দিনের মধ্যে নিয়ম করে দৈনন্দিন রিহার্সেল শুরু হলো রমার বাড়ীতে। সাধুর গাড়ীতে মেয়েদের আনা নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। খরচ দিবাকরের।

কাজলও উৎসাহ নিয়ে মেতে উঠ্‌লো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেদিন অভিভূতের মত রমার কথায় বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে সন্তুষ্ট বলে মনে হলেও সে তার ঈপ্সিত লক্ষ্য থেকে সরে আস্‌তে পারছে না। কামজ তৃষ্ণার গতি নিয়ন্ত্রণ তার সাধ্যাতীত। রমার মত নারীরত্নকে নিজের করে পাবার দুর্নিবার লোভ সে মন থেকে দূর করতে পারে না। বন্ধু কি কালক্রমে প্রেমিকে রূপান্তরিত হতে পারে না ? চেষ্টা করতে দোষ

কি ? এ আশা মনে নিয়ে রমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ গড়ে নিতে উঠে প'ড়ে রমার পাশে এসে দাঁড়ায় সে।

পূজোর আর দেরী নেই মাত্র পনেরো দিন বাকী। রিহার্সেলের সময় হয়ে গেছে। বাড়ী যাবার জন্য অফিস থেকে বেরিয়ে সবে মাত্র বাইকে বসে ষ্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় সুধীরবাবু এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক রীতিমত কাঁপ্‌ছেন। কাঁপা কাঁপা গলায় যা বললেন, তা এই যে বেলা বারোটায় সময় পাড়ায় এক বান্ধবীর বাড়ী যাচ্ছে এবং সেখান থেকে ম্যাটিনী শোতে সিনেমা দেখে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবে বলে বেরিয়েছিল অপর্ণা। এখন সাতটা বাজে কিন্তু এখনও সে ফেরেনি। যে সব বাড়ীতে সে সাধারণতঃ যায় খবর নিয়ে দেখা গেছে সে আদৌ সেই সব বাড়ীতে যায় নি। ধমকের সুরে দিবাকর বলে, "কি যা তা কথা বলছেন ? যে বন্ধুর বাড়ী সে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সেই বন্ধুর বাড়ীতে খোঁজ নিয়েছেন আপনারা ?"

"হ্যাঁ, সে তো প্রথমেই নেওয়া হয়েছিল। মেয়েটি বলেছে কয়েক দিন যাবৎ অপর্ণা তাদের বাড়ী একটি বারের জন্যে যায় নি। তাই আজ সিনেমায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

"সদৌ অসম নারীমঙ্গল সমিতি ?"

"আজ সেখানে যাবার কথা নয়। তবু নিজে খবর করতে গিয়াছিলাম। দেখলাম সমিতি আজ বন্ধ।"

"তা হলে ?" নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে দিবাকর। একটা ঢোঁক গিলে সুধীরবাবু আবার বলেন, "একটু আগে মাধুর কাছে পাড়ার গগন-বাবুর ছেলে বলেছে যে গুণ্ডা মতো দুটো ছোকরার সঙ্গে রিক্সা করে আজ দুপুর বেলা অপর্ণাকে চৌকীডিঙ্গার দিকে যেতে দেখেছে সে নিজে। "ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এখন কোথায় খুঁজবো তাকে ? অন্য কোন পথ নেই। চলুন থানায় যাই।"

"না, না, বাবা। থানা পুলিশ করলে লোক জানাজানি হ'বে।" কথাটা সত্যিই। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি ? ক্ষেপে ওঠে দিবাকর বলে, "সব কিছুর জন্য আপনি আর মাসীমা দায়ী। বারবার বলেছি সাবধানে চোখে চোখে রাখুন। কোন কথাই কানে নিতে চান নি।

আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন মেয়েকে এখন আমি কি করবো? অপেক্ষা করুণ হয়ত রাত্রে ফিরে আস্‌বে।” “বাবা—বৃদ্ধের কান্না ভেজা কণ্ঠস্বরে সচকিত হয় দিবাকর। হঠাৎ মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই চালাখোয়ার ঘটনা। ভেসে ওঠে সেই মস্তানের চেহারা। মনে হয় পাঁচআলির পথে এ চেহারা সে দেখেছে। হয়ত আজও সেই ছেলেটার সঙ্গেই অপর্ণা বেরিয়েছে। আর তক্ষুণি মনে পড়লো মনসুর আলির কথা। মনসুর আলি লোকটিকে তার ভাল লাগে। খুব খাতির করে সে দিবাকরকে। ব্যবসা সূত্রে পরিচয় হয়েছে। ইদানিং বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে দুজন। মনসুর আলিও এই পাঁচ-আলির লোক। মনস্থির করে বাইক থেকে নেমে তালা খুলে নিজের অফিসে এসে বসে দিবাকর। ফোন তুলে বাড়ীর নম্বর চায়। ও পাশ থেকে রমা সাড়া দেয়। দিবাকর বলে হঠাৎ একটা কাজের ভার ঘাড় চেপেছে। সে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদি ফিরতে দেরী হয় তবে কাজলকে সঙ্গে দিয়ে মেয়েদের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা যেন করে রমা।

মাত্র আগের দিনই বাড়ীতে ফোন এসেছে। ক্রমাগত বছর দেড়েক চেষ্টার পর ফোনটা পেয়েছে সে। রমা কী খুশী! হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত চমক দেবার জন্যে দিবাকরকে তার “কি যে ভাল লাগে।”

সব শুনে মনসুর বলে, “শান্ত হয়ে বসো দেখি। ব্যবস্থা একটা হ'বেই। বসে বসে চা খাও আর ম্যাগাজিনগুলির পাতাও ওল্টাও। কোন চিন্তা করো না। আমি ছেলেদের ডেকে পাঠাচ্ছি।”

একটু পরে আট দশটি ছেলে এলো। মার্কা মারা ছেলের দল। সবাই উঠ্‌তি মস্তান। পাশের ঘরে এদের সঙ্গে শলা-পবামর্শ করে দুজন করে এক এক দিকে পাঠিয়ে এ ঘরে এলো মনসুর বলল, “বুঝতেই পারছো দিরদা এরা সবাই উঠতি মস্তান। এরা সব খবরই রাখে। এরাই বল্লো যে ইব্রাহিম ও রমজান নামে দুটি ছেলে কয়েকমাস যাবৎ সুন্দরী কালোপানা লম্বা ছিপ্‌ছিপে্ একটি মেয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। আমার মনে হয় যে দুটো গুণ্ডার সঙ্গে তোমার বোনকে দেখা গেছে এরাই সেই ইব্রাহিম ও রমজান। কিচ্ছু ভেবো না। ছেলেরা খবর করতে গেছে এবং খবর ওরা এনে দিবেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো পাওয়া গেলে কি করবে?”

"কি আর করবো ? ঐ অলক্ষ্মী মেয়েটাকে ওর মা বাবার হাতে তুলে দিয়ে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে বাড়ী ফিরে যাব—" বিরক্তির সুরে দিবাকর বলে। "তা বললে চলবে কেন ? এ ভাবে কি সমস্যার সমাধান হয় ? মেয়েটা একবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। ছেলেগুলি তো খারাপই। তাই এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যার ফলে মেয়েটির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আর না থাকে। তা না হলে আবার মেয়েটিকে ফাঁদে ফেলে একেবারে বাজারী করে ছেড়ে দেবে।"

"তুমি কি আইন আদালতের কথা বলছো ? না, ভাই, এই নোংরা ব্যাপারে আমি জড়াতে চাই না।"

"না, না, আইন আদালতের কথা বলছি না। ও ভাবে কি কোন কিছুর সুরাহা হয়েছে কোনদিন ? আমি বল্‌ছি, ওদের নিয়ে আমাদের মহালদারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা। এ তল্লাটে তাঁর কথাই শেষ কথা। তুমি আমার নিজের লোক বলেই বল্‌ছি। মহালদারের কথা নির্বিচারে সবাই মান্‌তে বাধ্য। তাঁর কথাই আইন। এতে লোক জানাজানি হবারও সম্ভাবনা নেই।"

মনসুর নিজেও এক কালে দুর্দান্ত গুণ্ডা ছিল। তাকে ভয় করতো না কে ? এখন সে শান্ত, ভদ্র। কাজ কারবারে মন দিয়েছে। বিয়েও করেছে। দুটি সন্তানের জনক। দু'খানা লরীর মালিক। সেই সূত্রেই দিবাকরের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এখন সে দিবাকরের অন্যতম গুণমুগ্ধ বন্ধু।

ঘণ্টাখানেক পর বাইরে রিক্সা ও সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে কিছু কথাবার্তাও শোনা গেলো। "ঐ, ওরা এসে গেছে, একটু অপেক্ষা করো—" ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় মনসুর। বাইরে ধমক, গালাগালি ও চড়-চাপড়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরে স্খলিত চরণ বিত্রস্ত বসন অপর্ণাকে আগ্‌লে মনসুর ঘরে ঢোকে। লম্বা সোফায় বসিয়ে দেয় নেশাগ্রস্ত অপর্ণাকে। হতভম্ব দিবাকর। এ কি দেখ্‌ছে সে ? মনসুর বলে, "পাওয়া গেছে চোকীডিঙ্গার এক নতুন গজিয়ে ওঠা হোটেল 'গোল্ডেন ঈগলের' এক কামরায়। সব কটাই মাতাল হয়ে পড়ে ছিল। বেতামিজ দুটো তোমার বোনকেও গিলিয়ে এই হাল করেছে। সে যাক, এখন বলো কি করতে চাও ?"

"তুমি যে পরামর্শ দিবে তাই করবো—" দিবাকর বলে।

"তবে ওঠো। মহালদারের বৈঠকখানায় বসবার সময় হয়ে এলো। আগে ভাগে গেলে তাড়াতাড়ি কাজ চুকে যাবে। বোন এখানেই থাক্ —আমার স্ত্রী তাকে দেখে রাখ্‌বেন। আমরা ফিরে এসে তাকে সুস্থ দেখবো আশা করি।" ভেতরে গিয়ে তার স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসে দিবাকরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মনসুর।

ঘরের বাইরে এসে ইব্রাহিমকে দেখে চিন্‌তে পারে। চালখোলা স্টেশনে একেই সে দেখেছিল! চোখ ফিরিয়ে নেয় দিবাকর। দশটি ছেলের প্রহরায় দুই আসামী পেছনে পেছনে আস্‌ছে।

মহালদারের কাছারী বাড়ীর চত্বরে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে। কেউ সিমেন্টের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছে—পেছনে ও পাশে বেঞ্চে কিছু লোক বসেছে। দিবাকরকে পাশের বেঞ্চে বসিয়ে মনসুর মহালদারের কাছারী বাড়ীতে ঢুকে গেল। দশ পনরো মিনিট পরে ফিরে এসে দিবাকরকে ডেকে কাছারী বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলো।

বিরাট দশাসই দেহ সোফায় এলিয়ে বসেছেন মহালদার। হ্যাঁ চেহারা বটে! ব্যক্তিত্ব এবং প্রভুত্বের ছাপ স্পষ্ট। জীবন শুরু করেন কাঠুরে হিসেবে। পরে মুহুরী এবং সর্দার। পরে গুণ্ডার সর্দার ও বে-আইনি কাজি (আদমি) ব্যবসায়ী হয়ে সম্পদ সংগ্রহ করে এখন জঙ্গলের ইজারা নিয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। প্রচণ্ড দাপট, কিন্তু আদব কায়দায় ও ব্যবহারে অতি মার্জিত ও ভদ্র। অবাক হয়ে ভাবে দিবাকর। ভাবে পাঁচ-আলির লোকগুলি কোন ধাতুতে গড়া? যৌবনে এরা দুর্বিনীত, দুর্বার, বলদৃপ্ত। খুনোখুনি, মারদাঙ্গা, লুটপাট, নারী হরণ ও নারী মাংসের ব্যবসা নিয়ে মত্ত থাকে। কিন্তু বয়স সীমার একটা স্তরে পৌঁছে ভোল পাল্টে যায়। ওরা তখন শান্ত, নম্র, ভদ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে বন্ধু ও অতিথি বৎসল এবং সজ্জন।

সময় মতো মহালদার কাছারী বাড়ীর উঁচু বারান্দায় এসে দাঁড়ান। ইতস্ততঃ ছড়ানো জনতা উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানায়। অভিবাদন গ্রহণ করে উঁচু বিরাট চেয়ারে বসে মনসুরকে

কাছে ডাকেন এবং তার আরজি সবার সাম্‌নে ব্যক্ত করতে আদেশ দেন। মনসুর সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করে। মহালদার এবার উঠে দিবাকরকে কাছে ডেকে পাশের চেয়ারে সসম্মানে বসিয়ে ভাঙ্গা বাংলায় বলেন, "বে-ফিকির থাকুন চৌধুরী সাব্। চিন্তার কুছু নেই।"

রমজান ও ইব্রাহিমকে হাজির করা হ'লো। জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হলো। ওর ভয়ে কুঁক্‌চে গেছে, হাত জোড় করে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগ্‌লো। কিন্তু শাস্তি ওদের নিতেই হ'বে, সুতরাং সবার সাম্‌নে জুতো পেটা, লাঠি পেটা করা হলো। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে উর্দু মেশানো অসমীয়া ভাষায় মহালদার বললেন, "একদম্ হুঁশিয়ার। দ্বিতীয়বার যদি শুনি মনসুর আলির দোস্ত এই চৌধুরী সাবের বোনের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রেখেছে তোমাদের কেউ—রমজান বা ইব্রাহিম শুধু নয়, এ মহল্লার যে কোন লোক, তবে তার বা তাদের লাস ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাস্‌বে। এই আমার শেষ কথা।" এবার ওঁর হুকুমে রমজান ও ইব্রাহিম নতজানু হয়ে দিবাকরের পায়ে চুম্বন করে এবং নিজের হাতে নিজের কান মুলে কসম খেলো কস্মিনকালেও চৌধুরী বাবুর পরিবারের কারোর প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে না এবং চৌধুরীবাবুর এই বোনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখবে না। মহালদার উঠে দাঁড়িয়ে দিবাকরকে আলিঙ্গন করে বল্লেন, "আপনি ইমানদার আদ্‌মি। মনসুর আলির কাছে আপনার সম্বন্ধে সব কথা আমি শুনেছি। আপনি বে-ফিকির থাকুন।" তারপর নিজের বুকে সশব্দে চাপড় মেরে বলেন, "যদ্দিন খোদার বান্দা এই মুহম্মদ আকবর খান বেঁচে থাক্‌বে জানবেন, সপরিবারে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। আজ থেকে আমাকে আপনার দোস্ত বলেই জানবেন। আমার নিজের লোক সব সময় আপনার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখবে। খোদা হাফেজ।" মহালদারকে ধন্যবাদ এবং যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ও অভিবাদন করে মনসুরের সঙ্গে বেরিয়ে এলো দিবাকর।

মটর বাইকের পেছনে বসিয়ে আনার অবস্থা নয় অপর্ণার, অগত্যা রিক্সা নিতে হলো। নিজের লোক দিয়ে মটর বাইক শান্তিপাড়ায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো মনসুর আলি। নেশার ঘোরে ঢুলে ঢুলে

পড়ছে অপর্ণা। বাধ্য হয়ে দুহাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে ধরে দিবাকর। ওর মাথা লুটিয়ে পড়েছে দিবাকরের বুকে।

রিহার্সেলের পর মেয়েদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে কাজল সাধুর গাড়ী ছেড়ে দিয়ে রেল স্টেশনের উল্টোদিকে পথের পাশে দাঁড়িয়ে তার এক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছিলো। রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। রাস্তার আলোতে রিক্সার ভেতরে দিবাকরকে স্পষ্ট ঠাওর করতে পারলো কাজল। কিন্তু দিবাকরের বুকে এলিয়ে পড়া মেয়েটি কে? রিক্‌সা যখন আরও কাছে এলো মেয়েটিকে চিন্‌তে পারলো সে। আশ্চর্য—এতো রঞ্জনা? কিন্তু দিবাকর মেয়েটার সঙ্গে? এভাবে? কি করে সম্ভব হলো? এ সহরে সকলের মুখে দিবাকরের চরিত্রের প্রশংসাই শুনে আস্‌ছে। সে সবই কি মিথ্যা? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হ'চ্ছে। যাতে দিবাকরের নজরে না পড়্‌তে হয় তাই অতি সন্তর্পণে ল্যাম্পপোস্টের তলায় সরে এসে পেছন ফিরে দাঁড়ায় কাজল।

ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্যাপারটা নিজে আপন মনে পর্যালোচনা করে কাজল। দিবাকরের যে সুনাম শোনা যায় আসলে তা মিথ্যে। তলে তলে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তা না হলে মিথ্যে অজুহাতে রিহার্সেলে উপস্থিত না থেকে কোথাও স্ফূর্তি করে রাত সাড়ে দশটায় নির্জন পথে এভাবে জড়াজড়ি করে ফিরবে কেন দিবাকর! হায় মিষ্টি বৌদি কোন স্বর্গে বাস করছো তুমি! দিগন্তে নতুন আশার আলো ঝিলিক দেয় কাজলের চোখে। শান্তিতে চোখ বুজে সে। দিন আগত ঐ।

অপর্ণাকে এ অবস্থায় দেখে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন, তার মা। বাবা নির্বাক, নিস্পন্দ। ভদ্রমহিলাকে এক ধমকে থামিয়ে দেয় দিবাকর। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বিব্রত করে বলে, "এরপরও যদি সাবধান না হোন তবে আমাকে এই নোংরা ব্যাপারে আর কখনই ডাক্‌বেন না।" বাড়ীতে ফিরে এলো যখন, এগারটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। বারান্দায় উৎকণ্ঠিত রমা দাঁড়িয়েই ছিল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতেই উদ্বিগ্ন রমা জিজ্ঞেস করে, "এ তো দেরী হলো?"

"আর বলো কেন? একসিডেণ্ট। কখন যে কী ঘটে আগে ভাগে তো জানা যায় না।"

পরদিন কাজলের প্রশ্নের উত্তরে রমা বলে, "কম দায়ীত্ব তো মাথার উপর নেই বেচারীর। কখন কোথায় কোন লরি উল্টে গেল, মালপত্র নষ্ট হলো কিনা দেখা। সেগুলি সরিয়ে নিয়ে আসা। এ সব কি কম ইজ্জতের ব্যাপার? সময় মত গিয়ে না পড়লে মোটা দরের খেসারতের বোঝা তো ওরই মাথায় পড়বে?" বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কাজল চেপে যায় গত রাত্রের ঘটনা। হিতে বিপরীত বলে একটা কথা আছে না? কিছুদিন আগের ঘটনা তো ভোলার নয়। নতুন করে বিচ্ছেদের সূচনা করতে সে আপাততঃ চায় না। তার মনে অনেক আশা।

তাই ভালমানুষের মতো রমার কথায় সায় দিয়ে বলে, "ঠিকই তো! একসিডেণ্ট বলে কথা! মালের দায়ীত্ব তো দাদারই ঘাড়ে।" মনে মনে হাসে আর বলে, "আহা, কি মাল রে! বুকে করে রাত বিরেতে ঘুরে বেড়ানো।"

কথাটা চেপে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করে। হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় আসে তার। ব্রহ্মাস্ত্র হাতে এসেছে তার। ঠিক সময় মতো প্রয়োগ করতে পারলে জয় অনিবার্য। খুশী হয়ে ওঠে সে।

রমার মনে কোন আক্ষেপ নেই। খুশীর জোয়ারে সে ভাস্‌ছে। মনোমত একটা অনুষ্ঠানের কর্ণধার সে। পাশে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আছে দিবাকর। গত কয়েক বছর এমনটি কখনও ঘটেনি। দিবাকরের উদ্দীপনা ও পরামর্শ স্বতঃস্ফুর্ত। এর চেয়ে বেশী আর কি পাবার আছে রমার?

ভাল লাগে সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে কাজলও সক্রিয়। সেই সেদিনের অপ্রিয় ঘটনার রেশ নিঃশেষে মুছে আবার পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। চাল চলন ও কথাবার্তায় কাজল খুব সজাগ ও সতর্ক। এই তো সে চেয়েছে। নির্মল বন্ধুত্ব। রমা খুশী, খুব খুশী। হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানিতে ঝল্‌মল্ করে ওঠে রমা।

এতকাল দিবাকরের কাছে নিজেকে বামন বলে মনে হতো কাজলের। দৈহিক বলই শুধু নয় চারিত্রিক বলেও অভ্রংলিহ ছিল

দিবাকর। সে ভয় কেটে গেছে কাজলের। সে প্রত্যক্ষ করেছে আপন স্বরূপে দিবাকরকে। ব্যবহারে ব্যবহারে বড় পুরনো হয়ে গেছে রমা। তাই নতুনের নেশায় জড়িয়ে পড়েছে পণ্যা-নারী রঞ্জনার পাল্লায়। আজ হঠাৎ রমাকে দিয়ে নৃত্য-নাট্য পরিচালনায় এত উত্তাল উৎসাহ কেন দিবাকরের? সে তো শুধু রমার দৃষ্টি এড়িয়ে জীবন উপভোগের কামনায়। সত্যি ভগবান করুণাময়। তা না হলে এমন হ'বে কেন! হারতে হারতে জিতে যাওয়া? কিন্তু এ নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। পুরষকারকে জাগ্রত করে চরম বিজয় ছিনিয়ে নেবার জন্যে কাজে নাম্‌তে হ'বে।

একথা সে চূড়ান্ত ভাবে জেনেছে রমার মনের মানুষটি আসলে দিবাকরই। মুখে মানুষটি সম্পর্কে নানা নালিশ করে বটে কিন্তু তা করে শুধু মানুষটাকে ভালবাসে বলেই। এক কোপে এই ভালবাসার মূল ছিন্ন করা যাবে না। এরজন্য প্রয়োজন সময় ও ধৈর্য্য নিয়ে ধীরে ধীরে দিবাকরের স্বরূপ মেলে ধরা রমার চোখের সামনে, যাতে দিবাকরের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে রমার মন।

আর তার জন্য সর্বপ্রথম সেই রঞ্জনার সন্ধান করা প্রয়োজন। সেদিন রাত্রে অনুসরণ করে দিবাকরের রিক্‌সাকে শান্তিপাড়ার দিকে মোড় নিতে দেখেছে। ইচ্ছে স্বত্বেও আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে সাহস পায় নি কাজল। তবে সহজেই অনুমান করা যায় শান্তিপাড়াতেই থাকে রঞ্জনা। মেয়েটা বাঙ্গালী বলেই সে জানে।

কিন্তু শুধু অনুমান করলেই তো চল্‌বে না। জান্‌তে হ'বে মেয়েটির সঠিক আস্তানার হদিস্‌। প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করতে হ'বে। তাই শুরু হলো কাজলের শান্তিপাড়া পরিক্রমা। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও বা রিক্‌সায়। আর সেই সূত্রেই তারক সরকারের সঙ্গে হলো ঘনিষ্ঠতা।

যে ব্যাঙ্কের মারফৎ কাজলের বীমা কোম্পানীর কাজকর্ম হয় সেই ব্যাঙ্কেই কাজ করে তারক। নতুন বদলী হয়ে এসেছে এই ব্রাঞ্চে। বাইরের লোক নয় তারক। এই সহরেই জন্ম হয়েছে তার, কেটেছে শৈশব ও কৈশোর কাল। বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর রেলের কর্মী

তুই দাদার কর্মস্থলে পড়াশুনার সুবিধা না থাকায়, কোলকাতায় মাসীর বাড়ী থেকে পড়াশুনা শেষ করে এই ব্যাঙ্কের চাকরীতে ঢুকেছে তিন বছর আগেই। ইতিমধ্যে রেলের চাকুরে তুই দাদা ডিব্রুগড়ে বদলী হয়ে এলেন। জমি বাবাই খরিদ করে গেছলেন। ডিব্রুগড়ে স্থিতু হয়ে বাড়ী করে চেষ্টা চরিত্র করে ছোট ভাইকে এখানকার ব্রাঞ্চে বদলী করে আনিয়েছেন মাস তিনেক হলো।

তারক বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান যুবক। চেহারা তেমন আহা মরি নয়। ভাবুক, একটু মুখ-চোরা। নিজে থেকে পরিচয় করতে পারে না সহজে। কিন্তু প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর মুখর হয়ে ওঠে। ব্যাঙ্কের কাজে এর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হয় কাজলকে। ফলে ওরা পরিচিত।

এমন প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ঘটে যে পরিচয়ের সূত্রপাতেই হঠাৎ একজনকে বড় ভাল লেগে যায়। তারকেরও ভাল লেগেছিল কাজলকে। বাড়ীর কাছেই কাজলকে দেখে উৎসাহ ভরে টেনে নিয়ে যায় নিজের বাড়ীতে। সেদিন ছিল ছুটির দিন। দীর্ঘকাল বসে আড্ডা দেয় দুজনে। ঘটনাচক্রে সেখানে বসেই রঞ্জনার বাড়ীর হদিস পেলো কাজল। সুতরাং ঘনঘন এ পাড়ায় আসার তাগিদে—তারকের প্রয়োজন অব্যাহত রইলো।

কাজলের মতো প্রাণবন্ত, দিল খোলা বন্ধু পেয়ে এবং মরমিয়া শ্রোতা পেয়ে মুখের আগল খুল্‌লো তারক। কাজল জান্‌তে পারলো রাস্তার উল্টো দিকে একটা বাঁয়ে ঘেঁষা ব্যারাক বাড়ীতে আছে একটি মেয়ে—কালো কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী। সেই মেয়েটিকে ভালবাসে। সে যদিও মেয়েটির কাছে প্রকাশ করতে পারছে না সে কথা। কেন না মেয়েটি যেন তাকে গ্রাহ্যই করে না।

আরও জান্‌তে পারলো ঐ বাড়ীতে প্রায়ই যিনি আসেন সেই দিবাকর চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রমা একদা তারকের খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিল। রাঙাদা ও রাঙা বৌদি বলে তাদের ডাক্‌তো তারক। রাঙা বৌদির জন্য কি না করেছে সে? বনেবাদাড়ে ঘুরে কাঁচা আম, কুল সংগ্রহ করে এনেছে। টুকিটাকি নানা ফরমায়েস খেটেছে। রাঙা বৌদিও কী যে ভালবাস্‌তেন তাকে। আজও রাঙা বৌদির হাতে বোনা

সোয়েটার, গায়ে হয় না, তবু যত্ন করে সে রেখে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হলো কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাঙা বৌদির সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু রাঙা বৌদি যেন চিন্‌তেই পারলেন না তাঁকে। রাঙাদাও নিতান্ত অপরিচিতের মত ব্যবহার করেছেন ব্যাঙ্কে। অনাদরের অভিমানে তারক তাই ক্ষুব্ধ।

তারকের ক্ষুব্ধতার সুযোগ নেয় কাজল। বলে যে 'অর্থই-অনর্থের মূল' কথাটার জ্বলন্ত নিদর্শন এই দিবাকর চৌধুরী। দিবাকর অতীতে কি ছিল সে জানে না। যে দিবাকর চৌধুরীকে সে জানে—সে হলো এক অর্থ-পিশাচ, চরিত্রহীন, বিকৃতরুচির মানুষ। নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে তুচ্ছ করে এক পণ্যা নারীকে নিয়ে রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা অনুভব করে না। অনেকেই নির্জন পথে বে-সামাল অবস্থায় তাকে দেখেছে। ক'দিন আগে স্টেশন রোডের নির্জন পথে রাত সাড়ে দশটায় সে নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছে। উড়ে বেড়াবার সখ হয়েছে। ঘরে মন বসে না হঠাৎ বড়লোক হওয়া দিবাকর চৌধুরীর। তাই এলেম নেই, তবু ক্লাবের আসন্ন নৃত্যনাট্যের পরিচালিকা করে রমা দেবীকে ভুলিয়ে উড়ে বেড়াবার ফন্দি দিবাকরের।

রমা দেবী সম্পর্কে সবিশেষ সে জানে না। বাড়ীর পাশেই বাড়ী হলেও বড় বাড়ী ও ছোট বাড়ীর ব্যবধান তো থাক্‌বেই। তবে গান জানে বলে এই নৃত্যনাট্যে গান গাইবার জন্যে ডাক পড়েছে তার। এর মধ্যে যতটুকু বুঝতে পেরেছে মনে হয় বড় দেমাকী সে ভদ্রমহিলা। সে দেমাক রূপের দেমাক। বড্ড উন্নাসিক। এর চেয়ে বেশী বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঘটনাচক্রে এসব কথার ঠিক পরের দিনই সকালে ওরা আড্ডা দিচ্ছিল। শেষ কাপে চুমুক দিয়ে তারক চানে যাবে, অফিসের সময় হয়ে এলো—ঠিক তখনই অপর্ণা সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে এলো। চায়ের কাপ রেখে উদ্‌গ্রীব তারক উঠে দাঁড়ায় অপর্ণাকে ভাল করে দেখবার জন্যে। আর তখনই চরম আঘাত হান্‌লো কাজল। বলল, "আরে এ যে দেখছি সেই মেয়েটি যাকে নিয়ে দিবাকর চৌধুরী পাগল—"। "কি যা তা বল্‌ছেন। এতো হলো ঐ ব্যারাক বাড়ীতে যে মেয়েটির কথা আপনাকে বলেছি। এর নাম অপর্ণা।"

"কি নাম, কোথায় থাকে—এতো কথা জান্‌বো কি করে আমি? জান্‌বার দরকারই বা কি? কিন্তু সেদিন এই মেয়েটিকেই বুকে বুকে জড়িয়ে রাত সাড়ে দশটায় রিক্সা করে দিবাকর বাবুকে যেতে দেখেছি আমি নিজের চোখে।

"তা কি করে হ'বে। এদের জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন। ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন।"

"হ্যাঁ তা না হয় করেছেন। কিন্তু সে কি বিনা স্বার্থে? তুমি যাই বলো, ভাই আমি কিন্তু হাণ্ড্রেড পারসেন্ট সিওর যে এই মেয়েটিই সেদিন রাত্রে দিবাকরবাবুর বুকে লেপ্টে ছিল। আমি লাখ টাকা বাজী ধরতে রাজী আছি।" ঘৃতাহুতি পড়তে দেরী হলো না! তারক কাজলের হাতের মুঠোয় এসে গেল।

রাতারাতি তারকের মতিগতি পরিবর্তন হয়েছে। নিজ কূট-কৌশলের মহিমায় নিজেই মুগ্ধ কাজল। একদিন সত্য প্রকাশ পাবে সত্যিই। কিন্তু তার আগেই অভিষ্ট সিদ্ধ করে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে কাজল।

সামনা সামনি যা বলা বা করা সম্ভব নয় আড়াল থেকে চোরাগোপ্তা পথে তা' করতে উদ্যত হলো কাজল। এনিয়ে একটা কাজের ছক সে মনে মনে এঁকে ফেলেছে। তারকের ব্যক্তিগত ইমপোর্টেড টাইপ রাইটারের সাহায্যের দরকার হবে।

তারক সহজেই সম্মত হয়। কাজল বলেছে অপর্ণার সঙ্গে দিবাকরের যোগাযোগের কথা যদি রমা জান্‌তে পারে তবে একমাত্র তার দাপটেই দিবাকর পিছিয়ে যাবে আর তা হলেই অপর্ণা সহজলভ্য হ'বে তারকের। কাজল সযত্নে অপর্ণার রঞ্জনা-ভূমিকার কথা গোপন রাখে তারকের কাছে। কারণ সে কথা শুনে তারক পিছিয়ে গেলে মতলব হাঁসিলের আর পথ খোলা থাক্‌বে না।

অবশেষে চিঠিখানা খদড়া হলো, টাইপও হলো। দু'লাইনের চিঠি। ইংরিজিতে দামী কাগজে নিভু'ল টাইপ করা। তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়— "আপনার স্বামীর গতিবিধি দাম্পত্য জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক। স্বামীর গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখুন—বন্ধু।"

চিঠিখানা পেয়ে অবাক হলেও বিচলিত হয় না রমা। কারণ দিবাকরকে সে জানে। রাগের বশে অনুযোগ অভিযোগ যাই করুক না কেন দিবাকরের সম্পর্কে কোন সন্দেহই তার মনে জাগে না। সে ধরে নেয় এ একটা চক্রান্ত। "শাপমোচন" বানচাল করার জন্যে মুখার্জি দম্পতির হীন প্রচেষ্টা।

চালখোয়ার ঘটনার পর থেকেই দিবাকর উঠে পড়ে লেগেছিল অপর্ণার বিয়ের ব্যবস্থায়। নানা জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু সাড়াও পাওয়া গেছলো। কিছু পাত্রপক্ষ মেয়েও দেখে গেছেন। কিন্তু ফিরে গিয়ে ওরা কোন যোগাযোগ না করায়, খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল পাড়ার লোকের মুখে নানা কথা শুনেই ওঁরা পিছিয়ে গেছেন। তখন প্রফুল্লই পরামর্শ দিল যে পাত্রী দেখানোর ব্যাপারটা ডিব্রুগড়ে কনের বাড়ীতে না করে তিনসুকিয়ায় প্রফুল্লের বাড়ীতে করলেই বোধহয় ভাল হয়। প্রফুল্লের এ পরামর্শ ভালই মনে হলো।

পূজোর সপ্তাহ খানেকও দেরী নেই। এই অনুষ্ঠানের জন্য দিবাকর একসেট মাইক ও দু'তিনটে স্পট লাইট কিনে ফেলেছে। এই জন্যে দু'দিন ষ্টেজ রিহার্সেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম ষ্টেজ রিহার্সেলের দিন সকালে অফিসে প্রফুল্ল ফোনে জানালো যে সেদিনই সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। পাত্র সেণ্ট্রাল এক্সাইজ ইনস্পেক্টার। বিসাকুপি বাগানে কোয়ার্টার। বাবা নেই। মাকে নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে থাকে। ছেলেটি খুবই ভাল। মা ও দুই ছেলের সংসার। বড় ভাই বিবাহিত। পুলিশে বড় চাকরী করে, ধুবড়ীতে থাকে। পাত্রের মা ছেলের জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। খুবই ব্যস্ত। চেষ্টা চরিত্র করে সেদিনই সন্ধ্যায় মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। মা বা বাবা সহ অপর্ণাকে নিয়ে সন্ধ্যার আগেই দিবাকরের চলে আসা দরকার।

মহা সমস্যা দিবাকরের। একদিন আগেও খবর পেলে কোন অসুবিধাই হ'তো না। নতুন মাইক ও স্পষ্ট লাইট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নাটকের দলকে পাঠিয়ে ষ্টেজের ব্যবস্থা করেছে সে। অবশ্য ভৈরব ও সাঙ্গপাঙ্গরাই এগুলি ব্যবহার করবে। কিন্তু নিজে

দাঁড়িয়ে না দেখলে স্বস্তি পাবে না দিবাকর। সব ব্যবস্থা করে দিবাকর উপস্থিত থাক্‌বে না রমা সহজে মেনে নেবে না। সত্যি কথাও বলা যাবে না রমাকে। অপর্ণাকে তার বাবা মার সঙ্গে পাঠানোও সম্ভব নয়। কথাবার্তা বল্‌তে জানেন না, গ্রাম্যভাব এখনও দূর হয় নি তাঁদের। কি বল্‌তে কি বল্‌বেন, ফলে হয়ত আলাপটাই হাত ছাড়া হ'বে। অগত্যা যাওয়াই স্থির করলো রমাকে মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে।

পাঁচটায় রওনা হবার কথা তিনসুকিয়ায়। চারটের সময় ফোনে রমাকে জানালো সে দুটো চা বোঝাই লরি আট্‌কেছে সেণ্ট্রাল একসাইজের লোক তিনসুকিয়ায়। এগুলি ছাড়তে তাকে এখনই তিনসুকিয়া যেতে হ'বে। যত তাড়াতাড়ি পারে সে ফিরতে চেষ্টা করবে। তার অবর্তমানে যাতে সব সুষ্ঠুভাবে হয় সেদিকে রমা যেন খেয়াল রাখে। দায়িত্ব পেয়ে রমা বর্তে যায়। এ জন্য কোন অনুযোগই সে করে না।

রিহার্সেল মোটামুটি ভালই হলো। নতুন যন্ত্রপতির ব্যবহারে দেখা গেল ভৈরব বা তার সাগরেদরা একেবারে আনাড়ী নয়। দু'একটা ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে ছিল বটে তা' ওরা নিজেরাই শুধরে নিলো। রাত সাড়ে নটায় রিহার্সেল শেষ হবার পরও যখন দিবাকর ফিরলো না, মেজাজ ধীরে ধীরে চড়াতে সুরু করে রমার। অবশেষে গায়ে পড়ে দিবাকরের স্বপক্ষে সওয়াল করে রমাকে শান্ত করে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে—শান্তিপাড়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় কাজল। দিবাকর বাড়ী ফিরলো প্রায় সাড়ে দশটায়। দেরীর কারণ কাজল যা বলেছে তাই। সুতরাং এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করে না রমা।

পাঁচটায় গাড়ী নিয়ে অপর্ণাদের বাড়ীতে গিয়ে বিব্রত হয় দিবাকর। সুধীরবাবু প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে কার্জ থেকে ফিরেছেন একটু আগে। মাথা ব্যথা ও বমি করে রীতিমত কাতর। অগত্যা অপর্ণাকে নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে দিবাকর।

নিজের ঘরের জানালা দিয়ে আগাগোড়া লক্ষ্য করছে তারক। কাজলের কাছে ফোনে আগেই ব্যাপারটা জেনেছে সে। দিবাকরের ফোনের সময় কাজল সেখানেই উপস্থিত ছিল। রমা রিহার্সেলে যাবার

জন্যে বেশবাস বদলাতে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করতেই—ওদের ফোন তুলেই ব্যাঙ্কে তারককে ব্যাপারটা জানায় কাজল।

বিয়ের আলাপটা পছন্দ সই। পাত্রটি মোট্যমুটি সুপুরুষ, বিনয়ী ও নম্র। মনে হয় অপর্ণাকে মনে ধরেছে। পাত্রের মামুকও খুব ভাল লাগলো দিবাকরের। খোলাখুলি জানালো এ পর্যন্ত যত মেয়ে দেখেছেন—এ মেয়েটি তাদের সবার থেকে ভাল লেগেছে তার। মেয়ের গায়ের রং নিয়েও কোন প্রশ্ন তোলেন না। তবে পাকা কথা দিতে এখনই রাজী হলেন না। কারণ এখন ও আরো কিছু মেয়ে দেখা বাকী। ওঁদের কথা দেওয়া আছে, সুতরাং ঐ আলাপগুলি দেখার পরেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। কোন দাবী-দাওয়া নেই—শুধু মেয়েটিকেই চান তারা।

দুদিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং শেষ ষ্টেজ রিহার্সেলের দিন আবার আরেকখানা উড়ো চিঠি পেলো রমা। সেই একই ধরনের কাগজ, একই টাইপ। লিখেছে— "মঙ্গলবার পাঁচটায় শান্তিপাড়ার কালো ছিপছিপে সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে ৫৮২৫ নম্বর ট্যাক্সিতে কোথায় গিয়েছিলেন দিবাকরবাবু? কখনই বা বাড়ী ফিরলেন তিনি? দেরী হলো কেন? এখন ও সাবধান হোন বন্ধু।"

অবাক হয় রমা। আশ্চর্য ধৈর্য তো মুখার্জি দম্পতির? ট্যাক্সি নম্বর এবং ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী মেয়ের অবতারণা করে এমন ভাবে বক্তব্য রচনা করা হয়েছে যেন ঘটনাটা সত্যি। ওঁদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? অত সহজে রমাকে টলাবেন তারা? মনে মনে হাসে রমা। এসব বাজে চিঠি নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়েই গেছে তার।

ষ্টেজ বা ড্রেস রিহার্সেল সব দিক থেকেই সার্থক হয়েছিল। লাইটের কারচুপি ও সেটসেটিং সাজিয়ে ষ্টেজে এমন মনোরম পরিবেশ রচনা করেছিল দিবাকর ও ভৈরব যে আনন্দ মুখর হয়ে পড়েছিল সবাই। অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলার জন্য দিবাকরের এই নিরালস পরিশ্রম ও চিন্তাভাবনা মুগ্ধ করে রমাকে। এক অচিন্তনীয় মধুর রূপে যেন দিবাকরের নব-আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার জীবনে। আনন্দে টলমল করে ওঠে রমার মন।

বাড়ীতে ফিরে খেতে বসে হাল্কা মেজাজে হেসে রমা বলে, "কি গো

মঙ্গলবার ৫৮২৫ নম্বর ট্যাক্সিতে তিনসুকিয়া গেছলে ?” “অবাক কাণ্ড। গাড়ীর নম্বর নির্ভুল ভাবে বল্লে কি করে গো ? ইদ্রিসের ট্যাক্সির নম্বর তাই বটে। কিন্তু কি করে জানলে ? গুণতে জানো নাকি ?” রসিকতা করে বলে দিবাকর।

“হুঁম্—তা একটু জানি বই কি ? আরো বলবো ? সে গাড়ীতে সুন্দরী ছিপছিপে একটি মেয়ে ! —কি বলো ? ঠিক হ'চ্ছে কিনা ?” কোনরকমে আত্মসংবরণ করে দিবাকর। এত কথা জানলো কি করে রমা ? কিন্তু যে ভাবেই জানুক কিছুতেই স্বীকার করা যাবে না এই মুহূর্তে। রমার কথা বলার ভঙ্গীতে কৌতুকের আমেজ। তাই রমার সুরে সুর মিলিয়ে ভুরু উঁচু করে দিবাকর বলে, “আর কে ছিলো বলো তো ?”

“আর কে থাকবে ? থাকা উচিত ?” খিল খিল করে হাসে রমা।

“কি সর্বনাশ ? কোন কথা গোপন রাখা যায় না দেখছি তোমার কাছে ?” মুখে কৃত্রিম হতাশার ভাব ফুটিয়ে বলে দিবাকর। মেজাজ পুরোপুরি শরিফ রমার। দিবাকরের গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, “এই সব খবর কে আর দেবে—তোমার বন্ধু সমর মুখার্জি ছাড়া ?” “সমর মুখার্জি ?” এবার অবাক হওয়ার পালা দিবাকরের। “হ্যাঁ গো, হ্যা ! সমর মুখার্জি। দেখবে ?” রমা উঠে গিয়ে ভ্যানটি ব্যাগ নিয়ে এসে হাতড়ে চিঠি দুটো বার করে দিবাকরের হাতে তুলে দেয়। চিঠি দুটো পড়ে মুখ গম্ভীর হয় দিবাকরের। মুখ তুলে বলে, “চিঠি দুটো চেপে রেখেছিলে কেন ?”

“চাপলুম কোথায় ? প্রথম চিঠিখানা পড়ে ভেবেছিলুম ছিঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেব। ভুলে গেলাম। দ্বিতীয়খানা তো আজই পেলাম। কি হা করে চেয়ে আছ ? এ কথাটা মাথায় ঢুকছে না—আমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্যে মুখার্জিরা উঠে পড়ে লেগেছেন। এমন জঘন্য মানুষও থাকে দুনিয়াতে ?”

কিন্তু চিন্তিত হয় দিবাকর। আর যেই হোক মুখার্জিরা এ চিঠি দেয়নি—এ বিষয়ে সে স্থির নিশ্চয়। প্রথম চিঠির কথা বাদ দিলেও, দ্বিতীয় চিঠিতে বর্ণিত মোক্ষম সময়, গাড়ীর নম্বর—এ সব জানবে কেমন

করে সমর মুখার্জী ? না, সমর মুখার্জী নয়। খুব কাছের লোক—যে তার প্রতিটি পদক্ষেপ নজরে রাখছে। কিন্তু কে সে ? দিবাকর বলে, "না রুমি—তোমার অনুমান নির্ভুল নয়। এ চিঠি দুটোর উদ্দেশ্য তোমার অনুষ্ঠান বানচাল করা নয়—অন্য কিছু। কি তার উদ্দেশ্য জানি না, তবে আমার বিশ্বাস এই অনুষ্ঠান শেষ হবার পরও এমন চিঠি তুমি আরও পাবে।"

"ছাই জানো তুমি। শুধু তো কাজ কাজ করেই পাগল। কাজই বোঝো তুমি। দেখে নিয়ো, আমার অনুমানই সত্যি— ।"

"হ্যা, আমি মান্‌ছি এ অনুষ্ঠান পণ্ড হলে মুখার্জি দম্পতির চেয়ে খুশী কেউ হ'বে না। কিন্তু বানচাল করার চেষ্টা যদি করতেই হয় তবে তা কখনও এভাবে করবেন না। শুধু শুধু আমার নামে মিথ্যে বদনাম করে কি লাভ হ'বে তাদের ?"

"বারে, এই সামান্য কথাও বুঝতে পারো না ? সন্দেহ জাগিয়ে তুলে তোমার ও আমার সম্পর্কে চিড় ধরিয়ে দেওয়া ? এবং এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভাঙা মন নিয়ে আমি এগোতে পারবো না। আমরা কিন্তু তা' হ'তে দেবো না। শত প্ররোচনায়ও আমাদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চারা গজাতে দেব না— ।" এগিয়ে এসে দু'হাতে দিবাকরকে জড়িয়ে ধরে নাকে নাক ঘষতে ঘষতে রমা বলে, "বলো এনিয়ে চিন্তা করবে না—এসব চিঠির গুরুত্ব দেবে না ?" অভিভূত দিবাকর পরম আদরে রমাকে বুকে চেপে ধরে বলে, "তাই হ'বে রুমি। তাই হ'বে।"

চিঠি দুটো নিয়ে এক সুনির্দিষ্ট মত গড়ে উঠেছে রমার মনে। তাই সে ভীতও নয়—চিন্তিতও নয়। দীর্ঘ বারো বছর একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে দিবাকরকে চেনার কিছু বাকী আছে নাকি ? সমর মুখার্জির উদ্দেশ্য সে ছাড়া আর কে বুঝতে পারবে ? শুধু শাপ-মোচনই তো নয়—সেদিনের সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা ও তো থাকতে পারে ? সেদিনের সে ঘটনা দিবাকরকে বলেনি। আজ এতদিন পর সে কথা ভেঙ্গে তো আর বলা যায় না ?

রমার চোখে মুখে কোন প্রতিক্রিয়ার ছায়া না দেখে অসহিষ্ণু হয়ে

ওঠে কাজল। তবে কি রমার হাতে পড়েনি চিঠি ছুটো? দিবাকর কি গায়েব করেছে চিঠি ছুটো? বিপদ হ'চ্ছে প্রশ্ন করে জানবে সে পথও খোলা নেই। অস্থির চঞ্চল কাজলের মন।

মহাসপ্তমীর দিন, রাত সাড়ে আটটায় মঞ্চের যবনিকা সরে গেল। ষ্টেজের বাঁ পাশ ঘেঁষে নিচে দর্শক আসনের সাম্‌নের সারির এক পাশে ছিল দিবাকর। পাশের চেয়ারে দাঁড়িয়ে বাপের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দীপু। ষ্টেজের ডান দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইংসের মাঝামাঝি থেকে সাম্‌নের দিকে প্রথম উইংস ছাড়িয়ে সামনের স্ক্রীন পর্যন্ত রচিত ব্যারিয়ারের মধ্যে বসেছে—গায়ক ও বাদকবৃন্দ। স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভার দৃশ্য শেষ হলো সুন্দর ভাবে। দিবাকরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশেষ করে রমার ওপরই। অবাক হয়ে ভাবছিল দিবাকর, অমন সুন্দর মিষ্টি মেয়ে কটা চোখে পড়ে সচরাচর? সাধারণ বেশভূষায়, সামান্য প্রসাধনে এমন অসাধারণ হয়ে ওঠার মধ্যেই যেন ওর বৈশিষ্ট্য। লাল পাড় গরদের সাড়ী, লাল রংয়ের ব্লাউজ। জ্বলজ্বল করছে সিঁথিতে সিঁতুরের রেখা, ছুই ভুরুর মাঝে কপালে জ্বলন্ত রক্তিম টিপ। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল ছুটো চোখ গানের রাজী ও সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখন ও দৃপ্ত, কখন স্বপ্নময়, কখনও বা করুণ ভাবরসে নিমীলিত। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে রমাকে দেখে দেখে আশ মেটে না যেন তার।

অনুষ্ঠান জমে উঠেছে। উদাত্ত কণ্ঠে চমৎকার গ্রন্থনা পাঠ করছে কাজল। গানের গলাও চমৎকার কাজলের। সত্যি কথা বলতে কি কাজল ছাড়া এ অনুষ্ঠান এমন জমজমাট হ'তো না। মেয়েরাও পেছিয়ে নেই—নিজের নিজের ভূমিকায় নির্ভুল ভাবে নাচছে ওরা। নেপথ্যে ভৈরব তার তিনজন সাগরেদ নিয়ে সেটসেটিং, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ করছে পাকা হাতে। কিন্তু সব ছাপিয়ে রমার সুরেলা কণ্ঠের গানে দিবাকর অভিভূত। দর্শকমণ্ডলী যে একান্ত তন্ময়তার সঙ্গে নৃত্যনাট্য উপভোগ করছেন—এক ঝলক তাকিয়েই বুঝতে পারে দিবাকর। এই মঞ্চে এর আগেও কয়েকবার নৃত্য নাট্য হয়ে গেছে, প্রধানত রমা ও রেবা মুখার্জির যুগ্ম পরিচালনায়। কিন্তু এমন জমজমাট হয় নি কখনও। গর্বে ও আনন্দে ভরে ওঠে দিবাকরের বুক। দিবাকরের চোখ এক সময়

ঘুরতে ঘুরতে স্থির হয়—অদূরে তৃতীয় সারির দর্শক আসনে আসীন রেবা ও সমর মুখার্জীর দিকে। রেবা মুখার্জির মুখে হতাশার ছায়া পরিস্ফুট।

বাবার বুকে হেলান দিয়ে ষ্টেজে মায়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল দীপু। গলা চড়িয়ে আপন মনে হঠাৎ বলে বসে, "মাকে ঠিক মণ্ডপের মা দুর্গার মত লাগ্‌ছে—না বাপী?" পাশে সহরের বিশিষ্ট উকিল অখিল বন্ধু বোসের স্ত্রী এবং আশে পাশের আরো কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা কথাটা শুনে হেসে ওঠেন। অখিলবাবুর স্ত্রী দিবাকরের দিকে কটাক্ষ করে দীপুকে বলেন, "হ্যা বাবা, মণ্ডপের হরমনোরমাই রমা সেজে তোমার মা হয়ে এসেছেন। কি বলো ঠাকুরপো, ঠিক বলি নি?" দিবাকর কি বল্‌বে। লজ্জায় নাক, কান, লাল হয়ে ওঠে। থতমত খেয়ে বলে— "এই ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। বল্লুম, মায়ের পাশে গুটিসুটি মেরে বসে থাক্। তা নয়। তখন থেকে ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মাঝে মাঝে এমন পাকা পাকা কথা বলে—"

"শুধু শুধু ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি হ'বে? তোমাকে তো প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছি। তখন থেকেই দেখছি—তোমার দৃষ্টি এক জায়গায়ই আঠার মতো জমে আছে। কি গো—কথাটা মিথ্যে?"

"যাঃ কি যে বলেন মিতা বৌদি! চল্ দীপু—ষ্টেজে যাই। একটু পরেই ইনটারভ্যাল হ'বে।" পালিয়ে বাঁচে দিবাকর।

একটু পরেই পর্দা নেবে এলো। পনেরো মিনিটের জন্য বিরাম।

দিবাকরের অপেক্ষায়ই ষ্টেজের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রমা। দিবাকরকে দেখে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করে, "কেমন হচ্ছে গো?"

"হুঁ—যা হচ্ছে? কেন নিজে বুঝতে পারছো না? কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে দেখছি—।"

"বল্লেই হলো?" ঝঙ্কার দিয়ে বলে রমা। তারপরই মিনতিমাখা সুরে বলে— "এ্যাই, লক্ষ্মীটি—সত্যি বলো না—কেমন হ'চ্ছে?"

"বলবো?" মুখ বাড়িয়ে রমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে কিছু বলতেই স্প্রীংয়ের মত তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গিয়ে রমা বলে—"অসভ্য কোথা-

কার। ভাল হ'বে না বল্‌ছি।" বলেই গলা নাবিয়ে চুপি চুপি বলে, "আজ রাত্রে টের পাবে—"

"প্রস্তুত মহারানী হরমনোরমা—।" কুর্নিশ করে বলে দিবাকর।

"ওমা—এ আবার কি ঢংয়ের নাম ?"

"তবে তোমাকে শোনাতে হ'চ্ছে তোমার নন্দনের কীর্তিকাহিনী" —হলে যা' যা' ঘটেছে সবিস্তারে বলে দিবাকর।

"কি পাগল ছেলে রে তুই।" দীপুকে লক্ষ্য করে বলে রমা।

"বারে—তোমায় তো মা দুর্গার মতই লাগ্‌ছে—" প্রতিবাদের সুরে বলে দীপু।

"ছিঃ বাবা, এ কথা বল্‌তে নেই" —হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গীতে কপালে ঠেকিয়ে বলে রমা। তারপর দিবাকরের দিকে চেয়ে বলে— "তুমিই বা কী ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে ছিলে কেন ?" কৃত্রিম হতশার সুরে দিবাকর বলে, "হায় নারী, তুমি ও—।" তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টে স্বাভাবিক সুরে বলে— "কাজল ভায়াকে তো দেখছি না। ও কিন্তু দারুণ গ্রন্থনা পাঠ করছে —গানেরও খুব প্রশংসা হয়েছে। তোমার এবারকার টিম সত্যিই রীতিমত সুপার্ব।" —বলে কাজলের খোঁজে এগিয়ে যায়।

উল্টো দিকের উইংসের আড়াল চা খাচ্ছিল কাজল আর স্বামী-স্ত্রীর রসালাপ ও হাসি লক্ষ্য করে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল।

দারুণ উৎরে গেল শাপমোচন। সহরের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ষ্টেজে এসে রমাকে অভিনন্দিত করে গেলেন। কোলকাতার বাইরে যে এ ধরনের অনুষ্ঠান হ'তে পারে—ধারণাই করতে পারেন নি কেউ। এলেন না শুধু মুখার্জি দম্পতি। ক্লাবের সভাপতি বিরাজমোহন মজুমদার ও সম্পাদক বিভূতি সেন বললেন, "এই অনুষ্ঠানের জন্য ক্লাব গর্বিত।"

আনন্দে ভরপুর রমার মন। শুধু অনুষ্ঠান সার্থক হলো বলে নয়— এর পেছনে দিবাকরের অকুণ্ঠ পরিশ্রম ও সহযোগীতা ছিল বলেই। নিজের কাজে ক্ষতি করে, যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিয়েছে সে এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুল্‌তে। রমার নির্দেশ মত শিল্পীদের

সঙ্গে যোগাযোগ করে, ওদের আসা যাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে গেছে অক্লান্ত ভাবে। এর জন্যে মাঝে মাঝেই রমার গাল মন্দ হজম করেছে হাসি মুখে। সেটসেটিং তৈরী করা, স্পষ্ট লাইট এবং এক সেট মাইক যোগাড় করা এবং সেগুলি অপারেট করার জন্য ভৈরবকে তালিম দেওয়া —সব কিছুই করে গেছে হাসি মুখে। অথচ এই অনুষ্ঠানের পরিচয় লিপিতে দিবাকরের নাম কোথাও নেই। তবে কেন এই বিরাট খরচের দায় ও শ্রমের ভার কাঁধে নিল দিবাকর? মনের গহনে একদা সযত্নে লালিত ভ্রম নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কোথায় ঈর্ষার জ্বালা? জনে জনে সবাই ষ্টেজে এসে রমাকে প্রশংসা করে গেল, এত সুন্দর ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য অভিনন্দিত করে গেল—দূরে দাঁড়ানো দিবাকরের দু চোখে খুশীর ঝিলিক দেখা গেল কেন? নেপথ্যে পর্দার আড়ালে গা ঢেকে সবার চোখে রমাকে বড় করে তোলার এই প্রয়াসকে কি ঈর্ষা বলে? সব সন্দেহ, সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সে অনুভব করছে দিবাকরের প্রেমের স্পর্শ। নতুন করে ভাল লাগে দিবাকরকে। সেদিন রাত্রে আদরে আদরে পাগল করে তোলে সে দিবাকরকে।

নিদ্রাহীন রাত্রি কাটে কাজলের। যে দুটো বে-নামী চিঠি সে পাঠালো—কি হলো সে গুলির? কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন মাত্র চোখে পড়েনি তার। বরঞ্চ মনে হচ্ছে রমা ও দিবাকরের সম্পর্ক যেন আরও ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত চরিত্র রমার। কত মেয়ে নাড়াচাড়া করলো, জীবনে এমন বেয়াড়া মেয়ে একটিও চোখে পড়ে নি তার। কিছু মেয়ে প্রথম প্রথম প্রতিরোধের বেড়া তুলেছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগল ভাঙা দুর্বার স্রোতে ভেসে আছড়ে পড়েছে তার বুকে। সেদিন কেষ্ট ঠাকুরের কথায়—ধ্যাৎ অসভ্য কোথাকার বলে সলজ্জ হাসি হেসে ছুটে পালালো—যা' সব মেয়েই প্রথমে করে থাকে। কিন্তু পরদিন? পরদিনে স্বাভাবিক হাসি খুশী মন নিয়ে এসে দাঁড়ালো যেন গতকালের কথাগুলি আদৌ বলা হয় নি। বাদলা রাতে রিক্সার ঘটনার পর কাজল যখন লজ্জা শঙ্কা ভয়ে চুপ্‌সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—নির্বিকার চিত্তে বাড়ী বয়ে এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। যখনই মনে হয়েছে হাতের মুঠোয়

এসে গেছে রমা, পরমুহূর্তে দেখা গেল আঙ্গুলের ফাঁক গলে কখন টুক্ করে সরে পড়েছে সে। কি চায় রমা ? কি তার প্রত্যাশা ? কেন যখন তখন সুযোগ পেলেই দিবাকরের নানা দোষ-ত্রুটির ঝুড়ি উপুড় করে শুরু হয় তার অভিযোগ অনুযোগের পালা ? কেনই বা তাতে সায় দিয়ে বিপুল বিক্রমে প্রতিবাদের ঝড় তুলে মুখর হয় রমা ? প্রথম পরিচয়ের দিন যেখানে ছিল—আজও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে কাজল। এক পাও এগিয়ে যেতে পারেনি সে। তবে কি পরাজয়ের বোঝা কাঁধে নিয়েই রঙ্গমঞ্চও থেকে সরে যেতে হবে তাকে ? আজ পর্যন্ত একটি মেয়েও যাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি—সেই লেডী কীলার কাজল বাড়ুয্যের কি করুণ পরিণতি। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ। হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসে চুমুক দেয়।

পরদিন দিবাকর বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক পরেই কাজল এলো। রমা বাইরের ঘর গোছগাছ করছিল। কাজলকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "এসো এসো—কালকের মহারণের অন্যতম সার্থক মহারথী। সত্যি কাল তুমি বাজিমাত করেছ।"

"ঠাট্টা হচ্ছে ?"

"ছিঃ—ঠাট্টা করবো কেন ? কথাটি কি মিথ্যে ?"

"সত্যি না মিথ্যে জানি না। কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকে এ কথা বলতে শুনিনি—।"

"কেউ বলেনি মানে ? এই তো একটু আগেই একজন বলে গেলেন" —তোমাদের অনুষ্ঠানের সফলতার দায়ভাগ কিন্তু যে নিখুঁত ভাবে গ্রন্থনা পাঠ, অরুণেশ্বরের সংলাপ বলেছিলেন—গান গেয়ে ছিলেন তার। যদিও কাল ষ্টেজে এসে যাঁরা তোমায় অভিনন্দন জানিয়ে তোমার পাশে দাঁড়ানো কাজলকে সামান্য মৌখিক সৌজন্যটুকু জানাতে ভুলে গেছেন। এটা খুবই লজ্জা ও দুঃখের কথা—।" "এ কথাটি যিনি বল্লেন—সেই মহানুভব ব্যক্তিটির পরিচয় জানতে পারি ?"

"ব্যক্তিটি তোমার দাদা। বল্লেন—বিভূতিদাকে বলেছি রমা ক্লাবের মেম্বার না হলেও—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু এই সার্থক নৃত্যনাট্যে যার কৃতিত্ব সর্বাধিক—সেই অতিথি শিল্পীকে তাঁর কৃতিত্বের জন্যে

সাধুবাদটুকু জানাতে আপনারা কেউ এগিয়ে এলেন না—এটা কি ক্লাবের গৌরবের কথা ? বিভূতিবাবু নাকি ত্রুটি স্বীকার করেছেন। শুনলাম ক্লাব কর্তৃপক্ষ তোমার কাছে যাবেন কিছু প্রস্তাব নিয়ে— ।”

“কি প্রস্তাব ?”

“তা বলেন নি তোমার দাদা।” দিবাকরের মহত্বের কথা রমার মুখে শুনতে একটুও ভাল লাগছিলো না কাজলের। আজ বাজে কিছু কথা বলে এক সময় বেরিয়ে গেল সে।

পূজো শেষ হলো। দেবী নিরঞ্জনের পর সভ্যেরা সমবেত হয়েছে পূজামণ্ডপে শান্তিজল নিতে। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে কাজলও এসেছে। শান্তিজল নিয়ে—মিষ্টি মুখ করে সুরু হলো প্রণাম, নমস্কার ও কোলাকুলির পালা। বিদায় নেবার আগে মজুমদার সাহেব এবং বিভূতি-বাবু—দিবাকর ও কাজলের কাছে এলেন। কাজলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, কাজলকে ক্লাবের সভ্য হবার জন্য অনুরোধ করলেন। কাজল তখনই সম্মতি দিল না, এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলো।

পরদিন সন্ধ্যায় সুকুমারকে নিয়ে মিঃ মজুমদার এবং বিভূতিবাবু দিবাকরের বাড়ী এলেন। কাজল ও উপস্থিত ছিল। বিজয় সম্ভাষণ ও জলযোগের পর বিভূতিবাবু বললেন, “দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এসেছি। প্রথম উদ্দেশ্যে হলো, ষ্টেজ ও হলের কিছু কাজ বাকী। টাকার অভাবে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাবছি একটা চ্যারিটি শো করবো—কালী পূজোর পরের শনি এবং রবিবার। অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকা তুলতেই হ'বে। শাপমোচন নিয়ে সারা সহর এবং আশে পাশে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। অনেকেই অনুরোধ করছেন শাপমোচন করার জন্যে। যদি সম্ভব হয়— ।” রমার দিকে চেয়ে বলেন, “ওঁর যদি অসুবিধা না হয়—তবে চ্যারিটি শোতে শাপমোচনই করতে আমরা চাই। এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করতেই আমরা এসেছি— ।” রমা বলে, “ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু আমি একা রাজী হলেই তো হ'বে না। যাঁরা গান করেছেন, মিউজিক দিয়েছেন এবং যে মেয়েরা নাচলো—তাদের সম্মতি থাকা চাই তো ?”

মজুমদার সাহেব বলেন—"ঠিক কথাই বলেছ মা। তবে তুমি যদি সম্মতি দাও—অন্যান্য যাঁরা আছেন—বাড়া বাড়ী গিয়ে তাদের সম্মতি আদায় করার ভার আমি আর বিভূতি কাঁধে নিচ্ছি।" দিবাকর বলে—"তার দরকার হ'বে না—আপনাদের হয়ে সে কাজের ভার আমিই নিচ্ছি।"

"তা হলে তো হয়েই গেল। এখন দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলি। কাজলবাবু গতকাল আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—ক্লাবের মেম্বার হবার জন্য—সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন কি? লক্ষ্মী পূজোর দিনে আমাদের কাউন্সিলের মিটিং। আপনার সম্মতি পেলে মিটিং-এর এজেণ্ডায় আপনার নামটা দিতে চাই।"

"অত ফর্মালিটির দরকার কি? এজেণ্ডায় বিষয়টা ঢুকিয়ে দিন। ওকে আমাদের দরকার—ব্যস।" —উৎসাহের সঙ্গে দিবাকর বলে। কাজল কিছু বলার আগেই মজুমদার সাহেব বলেন—"ব্যাপার মিটে গেল। এখন সবাই উঠে পড়ে লাগো যেন চ্যারিটী শোতে পারফরমেন্স আরো ভাল হয়।" ওঁরা উঠে গেলেন।

কাজল বলে—"মুশাকলহলো—।" রনা মুখটিপে বলে—"মুশকিল আর যাই হোক্—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। সুতরাং এবার লক্ষ্মী ছেলের মত গোয়ালে ঢুকে পড়ো।" সবাই হেসে ওঠে।

ক্লাবের চারিটী শোর প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছে। প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার মেরে দেওয়া হয়েছে। সিনেমা হলে স্লাইড দেওয়া হয়েছে। শুধু ডিব্রুগড় নয়—তিনসুকিয়া—ডিগবয়—মার্গারেটায়ও। বাদ্যযন্ত্রী ও শিল্পীদের অভিভাবকদের সম্মতি আদায় করা হয়েছে। ছাপানো টিকিট বই নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তা ও সভ্যবৃন্দ বাড়ী বাড়ী গিয়ে হামলা শুরু করেছেন। সেক্রেটারীর অনুরোধে এবং নিজের তাগিদে গোটা কয়েক দামী টিকিট বই সমঝে নিয়েছে দিবাকর।

ঠিক হলো বাড়ীতে নয়—সরাসরি ষ্টেজে সেটসেটিং স্পটলাইট ও মাইক নিয়ে পর পর চারদিন রিহার্সেল দেওয়া হ'বে। যে দু' একটি ভুল ও ত্রুটি চোখে পড়েছে—তা শুধরে নিতে হ'বে—যাতে অনুষ্ঠান নিখুঁত

সুন্দর হয়। প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছে। ভৈরব ও দিবাকর ষ্টেজের কাজ করে দিয়েছে।

তারকের বাড়ীতে বসেই কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় তারক বলে, —"খুব নাম করেছ তোমরা কাজলদা। শাপমোচন যা করলে—কোলকাতায়ও নাকি তেমন হয় না।" "তাই তো শুনছি। জনে জনে, দলে দলে, ষ্টেজে এসে রমা চৌধুরীকে সেদিন, সেই রকম চাটুবাদই শুনিয়ে গেলেন দর্শকবৃন্দ। জানি না কোলকাতায় ক'টা শো দেখেছেন ওঁরা। আসল ব্যাপারটা কি জানো? মফস্বলের লোক, জমকালো সেটসেটিং, আলোর খেলা এবং শব্দ নিয়ন্ত্রণের মারপ্যাঁচে, চোখ টেরা করে দেখছিলেন এই অনুষ্ঠান। এর মধ্যে কতটুকু ছিল রাবীন্দ্রিক, আর কতটুকু ছিল চোখ ধাঁধানো যাদু—তার পরিমাপ করার ক্ষমতা একজনেরও ছিল কি না সন্দেহ।

"শুনেছি বছর দুয়েক আগেও একবার শাপমোচন হয়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল তখন—"

"হবেই। কেন না, গ্রন্থনা ও সংলাপ পাঠ—যা এই নাটকের প্রধানতম সম্পদ, সেখানেই ছিল ঘাটতি। ক্লাবের নাট্য-সম্রাট মনোজ দাস—সময় মতো পাঠ আরম্ভ করতে বারবার ভুল করেছেন। সংলাপ ও গ্রন্থনা পাঠ রাবীন্দ্রিক না হয়ে হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের সাজাহানের ধাঁচে। রাজার গান যিনি গাইলেন, সেই সমীর ঘোষ যদিও সুকণ্ঠ এবং আধুনিক ও সিনেমার গানে যথেষ্ট সাবলীল সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার নেই চর্চা। অথচ শাপমোচন নির্ভর করে সঠিক ভাবে রাজার গান, সংলাপ ও গ্রন্থনা পাঠে। এমানেই ছিল চরম খুঁৎ। এর উপরে—সাদামাটা কালো পর্দার ওপর—সাদা কালো ফ্লাড লাইটের তলায়—নাটক জমাতে পারেন নি রেবা দেবী। ক্লাব তো গোনাগুনতির এক পয়সাও বেশী খরচ করবে না—স্বামী প্রখ্যাত ডাক্তার সমর মুখার্জি তো টাকার থলি নিয়ে পেছনে দাঁড়ান নি। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলেন রেবা দেবী।"

ওরে বাবা, তুমি দেখছি রেবা দেবীর মুখপাত্র হয়ে উঠেছ?

"ব্যাপার কি কাজলদা? পরিচয় আছে নাকি মহিলার সঙ্গে?"

"না ভাই। পরিচয় ও নেই—তার মুখপাত্রও আমি নই। রমা দেবীর সুরেলা মিষ্টি গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত খোলে ভাল স্বীকার করি। কিন্তু পরিচালনার কোন গুণই তাঁর নেই। শুধু দিবাকর চৌধুরীর প্রভাব ও টাকার থলি পেছনে না থাকলে তিনিও ঢুকতেন—এ কথাও সত্যি।

"তোমার নিজের কথা বলছো না যে বড় ?"

"নিজের কথা নিজের মুখে বলা সাজে না। হয়ত বিনয় প্রকাশ হ'বে না—তবু বলবো গ্রন্থনা পাঠ, সংলাপ ও গান তেমন না হলে—শুধু ষ্টেজের কেরামতি ও রমা দেবীর সুরেলা কণ্ঠের গান দিয়ে আসর জমানো যেতো না। তোমাদের এই সহরের তথা কথিত বিদগ্ধ দর্শকবৃন্দ ষ্টেজে চড়াও হয়ে দেবীকে সাধুবাদ জানিয়ে গেলেন। অথচ ওঁনাদের শ্রীমুখ থেকে এই অভাজনের নাম একবারও উচ্চারিত হয়নি।"

"সত্যি—খুবই অন্যায়। তোমাদের অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয় নি বটে—তবে কিছু লোকের কাছে তোমার ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা শুনেছি।"

"শুনেছ ? সুসংবাদ ! আসল মজাটা কি জানো ! ষ্টেজে এই প্রশংসার বন্যায় বিপর্যস্ত রমা দেবী অস্ফূটস্বরে দু'একবার বলার চেষ্টা করেছেন—ও না থাকলে আমার একার পক্ষে—ইত্যাদি। অর্থাৎ 'ও' মানে দিবাকর চৌধুরী। সেই প. পি. চুর ব্যাপার আর কি ? কিন্তু একবারও আমার নাম তিনি করনে নি। করবেই বা কেন ? ষ্টেজে যে উঠতে দিয়েছেন—সেই তো মহাভাগ্যের কথা—। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো—রমা দেবী আমার কথা ভুলে গেলেও একজন কিন্তু ভোলেন নি। তিনি হলেন ধুরন্দর দিবাকর চৌধুরী। জানো তাঁরই প্ররোচনায় ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ও সম্পাদক মশাই বিজয়া দশমীর দিন এবং তারপরেও একদিন আমার কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে, ক্লাবের মেম্বার হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ?"

"তাহলে ক্লাবের সভ্য হচ্ছো তুমি— ?"

"দূর, দূর ক্লাবে নাম লেখাতে বয়ে গেছে আমার। কিন্তু আসল মজাটা কি জানো ? দিবাকর চৌধুরী আমায় খোসামদ করতে ব্যস্ত

কেন জানো ? ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কারণ, অতঃপর মাঝে মাঝেই এ ধরনের অনুষ্ঠান হবে এবার থেকে। সে জন্যে আমায় দরকার তার। নামের নেশায় পাগল স্ত্রীটিকে ব্যস্ত রাখা দরকার। এই ফাঁকে এখানে ওখানে ফষ্টি নষ্টি করে চেখে বেড়াবেন তিনি। ইতিমধ্যেই একটি শিকার জুটিয়ে ফেলেছে-সে তো জানই—।”

“তা হলে এই ষড়যন্ত্রে তুমি দিবাকর চৌধুরীর হাতিয়ায় হবার তালে আছো—”

“সময় মতো সে প্রমাণ পাবে। জেনে রেখো এ বান্দা সহজে কারুর কাছে ঘাড় নোয়ায় না—।”

নিজের কদর বাড়াবার প্রচেষ্টা এবং এই সুযোগে কোলকাতা গিয়ে কণা রায়ের সুখসঙ্গ, পুরানো সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়া এবং নিজের ভবিষ্যত পাকাপাকিভাবে ঠিক করে আসার তাগিদ ছিল কাজলের। তাই একদিন চুপি চুপি রমাকে বলে, “মিষ্টি বৌদি, তোমার চ্যারিটি শো ক'দিন পেছনো যাবে ? দাদার চিঠি এসেছে—। একটা ভাল চাকরীর ইনটারভিউ সম্ভবতঃ কালীপূজার পরই পড়বে। কোলকাতার ইনটারভিউ সেরে কি সময়মত ফিরে আসতে পারবো ? মুখ শুকিয়ে যায় রমার, তবু বলে—“কবে ইনটারভিউ-এর তারিখ পড়ছে জেনেছ কি ?”

“তা জানি না এখনও। তবে দাদা লিখেছেন যে দু' চারদিনের মধ্যে টেলিগ্রাম করে জানাবেন। এই দেখো না—” পকেটে হাত দেয় কাজল। “থাক্ থাক্ চিঠি দেখে কি হবে ? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি জানো ? অনেক টিকিট নাকি বিক্রী হয়ে গেছে। এখন কি তারিখ বদলানো সম্ভব হবে ? তোমার দাদা এলে আলাপ করে দেখা যাবে। তবে এ কথা জেনো রেখো সামান্য নাটকের জন্য তোমার ভবিষ্যত নষ্ট করতে কখনই তোমার দাদা রাজী হবেন না।”

দিবাকর কথাটা শুনে বলে—“তাই তো—ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু সে যাই হোক তোমার জীবনের উন্নতির পথ আগলে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান করার জন্য কখনই সায় দেবো না আমি। ঠিক আছে। নাটক বন্ধ করা যাবে না—। পথ খুঁজে বার করতেই হবে—তোমার ক্ষতি না করে—।” মনে মনে হাসে কাজল।

পরদিন রাত্রে দিবাকর জানায়—“সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তিন-সুকিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক চিত্তব্রত সেনগুপ্ত রাজী হয়েছেন। প্রফুল্লকে নিয়ে ওঁর কাছে গেছলাম। গত বছর শিলংয়ে তিনি গ্রন্থনা ও

সংলাপ পাঠ করেছেন। খুব উৎসাহী ভদ্রলোক। বল্লেন—"গানের জন্যও ভাবতে হবে না। তার ছোট ভাই প্রণবেশ সেই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছে। বৌদিকে নিয়ে দু'দিন পরেই প্রণবেশ তিনসুকিয়া এসে পড়বে। চারদিন ষ্টেজ রিহার্সেলে সড়গড় হয়ে যাবে।" কথাটা শুনে কালো হয়ে যায় কাজলের চোখ মুখ। হতাশার আগুনে চুপসে যায় সে।

শেখর রায়ের মৃত্যুর পরই কণা রায় কাজলকে কোলকাতা চলে আসার জন্যে ঘন ঘন চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু শেখর রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোলকাতা গিয়ে আসর জমাতে চক্ষুলজ্জায় বেঁধেছিল কাজলের। নানা ছলে সে সময় পিছতে থাকে। এরই মাস কয়েক পরে রমার সঙ্গে হলো পরিচয়। নতুন নেশায় মেতে ওঠে কাজল। সম্ভোগের নেশা এবং আপন শক্তি পরীক্ষার খেলায় এতই মত্ত হয়েছিল সে, গত দুমাস ধরে কণা রায়ের যে কোন চিঠি আসছে না—সে খেয়ালও ছিল না তার। মাস তিনেক আগে কণা রায় জানিয়ে ছিল যে মাসখানেকের জন্যে দিল্লীতে দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছে। এরপর আর কোন চিঠিপত্র আসেনি। বন্ধু অনুপ তার চিঠির জবাবে বাড়তি কোন খবর দিতে পারেনি। শুধু জানিয়েছে যে কণা রায় সম্ভবতঃ দিল্লীতে তাঁর বোনের বাড়ীতেই আছেন।

তাই এক ঢিলে দুই পাখী মারার চেষ্টায়—কোলকাতা যাবার এই ছল বানচাল হয়ে গেল। কণা রায় কোলকাতায় নেই—কিন্তু ঠিক ঠিক কোথায় আছে জানা যায়নি। এ খুবই চিন্তার বিষয়। এদিকে তার অবর্তমানে নাট্যানুষ্ঠানে কিছু অসুবিধা দেখা দিলেও মুহূর্তে বিকল্প ব্যবস্থা হয়ে যাবার ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে কাজল। অগত্যা দুদিন পর এক সন্ধ্যায় রমাকে জানায় যে ইনটারভিউ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মূলতুবী হয়ে গেছে বলে দাদা জানিয়েছেন। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল বটে—কিন্তু মনে চোটও পেল যথেষ্ট কাজল। বুঝতে পারলো তাকে ছাড়াও অনুষ্ঠান করার হিম্মৎ রাখে রমা ও দিবাকর।

ডিসেম্বরে শেখর রায়ের মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হবে। তারপরই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে কণা রায়কে বিয়ে করে পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় বসবাস করার প্ল্যান ছিল। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কণা রায়ের এই দীর্ঘ প্রবাস-জীবন, চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এদিকে রমা এবং দিবাকরের কাছে সে যে কত তুচ্ছ তাও প্রমাণ হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কাজল।

কণা রায়, কাজলের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু শেখর রায়ের স্ত্রী, এবং তার

অন্যতমা প্রেমিকা—যার কাছে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে,—খুব হিসেব করে অর্থনৈতিক কারণে।

শেখর রায় তার স্কুলের বন্ধু। বড়লোক• বাপের একমাত্র সন্তান শেখর—প্রতিভাবান ও মেধাবী ছাত্র। মা-হারা ছেলেকে মায়ের আদরে মানুষ করেছেন আদর্শবান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ইঞ্জিনিয়ার শিবদাস রায়। ফিজিক্সে ডক্টরেট শেখর জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে রিসার্চ করার জন্য স্কলারসিপ্ পেয়েছে। ছেলেকে বিদেশে পাঠাবার আগে বিয়ে দিতে চান এমন একটি মেয়ের সঙ্গে যে শুধু সুন্দরীই নয়, গান বাজনা, পড়াশুনায় ও সংসার ধর্ম পালনে রীতিমত পারঙ্গম এবং যে বিদেশে তার আত্মভোলা ছেলেটিকে দেখে শুনে রাখতে পারে।

তাই মনোমত পুত্রবধূর খোঁজে সারা বাংলা তোলপাড় করে অবশেষে উত্তরবঙ্গের এক বাগিচা সহরে সন্ধান পেলেন কণার। সুন্দরী, সপ্রতিভ কণা ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে সদ্য বি. এ পাস করেছে দার্জিলিং লরেটো কলেজ থেকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিনী। সংসারের কাজকর্মে রীতিমত পটিয়সী। আত্মভোলা ভালমানুষ শেখরের জন্য কণাকেই পুত্রবধূ করে নিয়ে এলেন শিবদাসবাবু। কিন্তু বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে দেহ রক্ষা করলেন তিনি। বিদেশ যাত্রা আপাততঃ স্থগিত রেখে কোলকাতা বিজ্ঞান কলেজে যোগ দিল শেখর।

পড়াশুনা ও গবেষণা নিয়ে মগ্ন থাকে শেখর রায়। সংসার ও বিরাট সম্পত্তির তত্ত্বতল্লাসীর ভার যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে বহন করে চলেছে কণা রায় তার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী অমত্ত সোমের পরামর্শ মতো। বিয়ের পর তিনটি বছর কেটে গেছে। এক জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত শেখরের অন্যদিকে নজর দেবার অবসর খুবই কম। তবু তার চোখে পড়ে কণার নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। সন্তানহীনা কণার এই নিঃসঙ্গতার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে শেখর। কাছাকাছি এমন কোন আত্মীয় স্বজন নেই—দুদণ্ড বসে যাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে কণা। কণার এই নিঃসঙ্গতার বেদনা সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবণ করে শেখর রায়।

ঠিক এমনই সময় শিয়ালদার জ্যামজটে আট্‌কে পড়া গাড়ীর পেছনের সিটে বসে শেখর রায় একদিন আবিষ্কার করে কাজলকে। কাজল সহসা চিনতে না পারলেও দীর্ঘ অদর্শনের পরও আত্মভোলা শেখর রায় তাকে ঠিকই চিনে ছিলো। কাজলকে নিয়ে বাড়ী আসে শেখর। চিৎকার, চেঁচামেচি করে ডাকে কণাকে। অপূর্ব রূপের ডালি নিয়ে দরজার পর্দা

সরিয়ে এসে দাঁড়ালো কণা রায়। চোখ ঝল্সে যায় কাজলের। পরিচয় দিতে শেখর বলে, "আমার ছেলেবেলার একমাত্র বন্ধু কাজল বন্দোপাধ্যায়। এক বিদেশী সওদাগরী অফিসের জুনিয়ার অফিসার। আর ইনি আমার স্ত্রী কণা রায় আমার 'গাইড ও ফিলসফার।"

শেখর বলে, "কণা, তোমার সময় কাটে না। একা একা এত বড় বাড়ীতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি তো সময় দিতে পারি না। তাই এবার থেকে কাজল তোমায় সঙ্গ দেবে। গল্প, গুজব ও আড্ডায় ও রীতিমত ওস্তাদ। ভাল আবৃত্তিও করতে পারে, গান গাইতে পারে। ওর সাহচর্য্যে দেখ্‌বে তোমার সময় হুঁ হুঁ করে কেটে যাচ্ছে।" এখানে বলা বাহুল্য কাজল সে সময় রীতিমত বেকার ছিল। শেখর জানতো না কালের কুটিল চক্রান্তে একদা শান্তশিষ্ট, আদর্শবাদী, স্বামীজী ভক্ত কাজলের আত্মিক মৃত্যু ঘটে গেছে অনেক কাল আগেই। অতীতের সেই কাজলের চেহারা নিয়ে যে লোকটি বসে আছে, সে আদর্শচ্যুত, চরিত্রহীন, সংসার থেকে বিচ্যুত আর এক কাজল ব্যানার্জ্জী—প্রখ্যাত 'লেডী কীলার' বলে যে নিন্দিত ও বন্দিত।

এই পরিচয় পর্ব্ব অচিরেই এদের ঠেলে নিয়ে চলে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে। কলেজের গবেষণাগারে এবং বাড়ীর বিশাল লাইব্রেরীতে আবদ্ধ শেখর রায়। সিনেমা থিয়েটার বা বাইরে কোথাও যাওয়া দূরে থাকুক—ঘরে বসে গল্প করারও সময় নেই শেখর রায়ের। তাই কণার একাকীত্ব দূর করার জন্যে কাজলের দ্বারস্থ হলো সে।

অতঃপর শেখরেরই গাড়ীতে তারই স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে শুরু হলো কাজলের ঘন ঘন দিকে দিকে পরিক্রমা। প্রথম প্রথম ময়দানের মেলা, একজিবিশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বহুরূপী ও অন্যান্য নব-নাট্য সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ নাট্যানুষ্ঠান, বেলুড়, দক্ষিনেশ্বর দিয়ে শুরু হলো। অতঃপর শুধু সিনেমা থিয়েটার নয়, বোটানিকস্, ইডেনগার্ডেন, লেক, চিড়িয়াখানা, ছাড়িয়ে ব্যাণ্ডেল, ডায়মণ্ডহারবার, শেষ করে দীঘা, পুরী দার্জিলিং পর্যন্ত গড়িয়েছে। হোটেলে হোটেলে ঘুরে ক্যাবারে ও ষ্ট্রিপ্‌টিজ্‌ দেখে দেখে কণা রায় লজ্জা জয় করলো। প্রগতির নামে অধোগতির শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালো কণা রায়।

অমত্ত সোম অনেকদিন থেকেই ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছিলেন না। তিনি অনেকবারই সাবধান করে দিয়েছেন। কর্ণপাত করেনি প্রথমে শেখর। কণা ও কাজলের ওপর আস্থা ছিল তার।

অবশেষে দেরীতে, অনেক দেরীতে হুস হলো শেখর রায়ের। অবস্থা তখন তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কাজল বন্ধুর বিরাগ উপলব্ধি করে বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে এখন আর প্রবেশ করে না। চোখে গগল্‌স্‌, হাতে ড্রাইভিং গ্লাভস্‌। স্লিভলেস লো-কাট বোলিতে নিজের উদ্ধত যৌবনকে প্রদর্শনী করে, ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে যায় কণা রায় পড়ন্ত রোদে, সান্ধ্য-ভ্রমণে। নির্দ্ধারিত স্থানে কাজল সঙ্গ নেয়। অর্ধেক রাত কোনও হোটেল বা পান্থশালায় কাটিয়ে মধ্যরাতে যখন বাড়ী ফেরে কণা রায় তখন প্রায়ই পা টলে তার।

ডোর-বেলের তীব্র আর্তনাদে ত্রস্তে ছুটে এসে দরজা খুলে শেখর রায় সামনে এসে দাঁড়ায়! অপূর্ব্ব কায়দায় ঠোঁটের অর্ধদগ্ধ সিগারেট টোকা দিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে গট্‌গট্‌ করে, শেখরের চোখের সামনে দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় কণা রায়। শত অনুরোধ ও মিনতি সত্বেও সে দরজা আর খোলে না। খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া দুজনের ভাত পড়েই থাকে।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব—কারুর কাছেই ঘটনা বিবৃত করে পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করতে সঙ্কুচিত শেখর। তাই যে বিমর্ষ, ম্রিয়মান ও চিন্তায় চিন্তায় দীর্ণ।

এমনই এক গভীর রাত্রে কণার নির্ব্বাক তাচ্ছিল্যে ও অপমানে ক্ষিপ্ত শেখর লাইব্রেরী ঘরে এসে আলমারীর পর আলমারীর সব কটি বই ছিঁড়েখুড়ে—কুচিকুচি করে ছড়িয়ে দেয়। পরদিন সকালে বিকৃত মস্তিষ্ক শেখরকে লুম্বিনী পার্কে স্থানান্তরিত করা হলো। অত্যাধিক পড়াশুনা ও পরিশ্রমের ফলেই এই উন্মাদ অবস্থা, সে কথা মুষ্টিমেয় আত্মীয় ও পরিচিতদের অনায়াসে বিশ্বাস করাতে পারলো কণা রায়—কাজলের পরামর্শে।

ঠিক এই সময়ই নিউ-ইণ্ডিয়া এসুরেন্সের পাটনা শাখায় চাকরী নিয়ে পালালো কাজল। কণা রায় আপত্তি করেছিল এই দুঃসময়ে একা ফেলে দূরে চলে যাওয়ার প্রস্তাবে। কিন্তু কাজল তাকে বুঝিয়ে ছিল যে তাদের অবৈধ গোপন সংসর্গই যে শেখরের মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ তা প্রকাশ না পাবার জন্যেই কিছুদিন তার দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

দিনে দিনে হিংস্র হয়ে উঠেছে শেখর। সেই শান্ত, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান শেখর আর নেই। অবশেষে লুম্বিনীর সুপারিশে রাঁচীর কাঁকের পাগলা গারদের অন্তরালে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হলো শেখরকে। ফিরে আসার

তাগিদে কণার চিঠির উত্তরে কাজল জানালো—"এখনও সময় হয়নি। আরও একটু ধৈর্য্য ধরো। কিছুদিন অসুস্থ মুমূর্ষু স্বামীর প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যের ভান করে বন্ধুবান্ধব ও পারিবারিক শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি ও প্রশংসা অর্জনে মন দাও। তুমি ভাল করেই জানো আমি তোমার এবং চিরকালের জন্যেই তোমার। ঠিক সময়, ঠিক জায়গায় আমায় তুমি পাবে।"

এরপর দেড়বছর কেটে গেছে। কালেভদ্রে অতি গোপনে ওরা মিলিত হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে কাজল দিন সাতেকের জন্যে কোলকাতায় এলো। সেখান থেকে মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুকে দেখতে রাঁচী গেছে, যেন প্রবাসী কাজল দীর্ঘকাল পরে এসে খবর পেয়ে বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন করতে এসেছে। এর মাস তিনেক পর ক্রিসমাসের দিন রাত্রে শেখরের মৃত্যু হলো। কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ কাজল খবর পেয়ে আবার এলো বন্ধু-পত্নীকে সাংসারিক ব্যাপারে সাহায্য করতে। দিন পনেরো সে কোলকাতায় ছিল। শিবদাসবাবুর উইল মোতাবেক পুত্রের অবর্তমানে তার বিবাহিতা পত্নীর উত্তরাধিকার আদালতের মাধ্যমে আইনানুগ করতে সাহায্য করে; এখন শুধু প্রতীক্ষা—বছর গত হলে দুজনের মেল-বন্ধনের।

এর কয়েক মাস পরেই রমার সঙ্গে তার পরিচয়। রমার রূপের নেশায় উন্মাদ হয়ে ওঠে কাজল। সেই থেকে নানা উপায়ে রমার মন জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কাজল। কিন্তু রমা, কণা নয়। স্বভাবতই সে রক্ষণশীল। সহজ সরল সম্পর্ক বাঁকা পথ নেবার আগেই নিজেকে সে দূরে সরিয়ে নেয় অব্যর্থভাবে। কাজলকে দূরে সরিয়ে দেয় না—ঘনিষ্ঠ হয়েও কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। কাজলের কাছে রমা যেন এক প্রহেলিকা। এই রহস্যময়ী নারীকে জয় করার নেশায় তাই কাজল উন্মাদ।

খুব সমারোহের সঙ্গে চ্যারিটি শো হয়ে গেল, শনি ও রবিবার। ভীড় হয়েছিল খুব। একটি আসনও খালি ছিল না। দু'দিনেই এই অনুষ্ঠান দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। টাকা উঠেছিল আশাতীতভাবে।

পুজোর সময় শাপমোচন দেখা হয়নি। অপর্ণা বায়না ধরে ছিল। তাই অর্পণা ও মাধুর জন্যে রবিবারের দুটো টিকিট দিয়েছিল দিবাকর। অনুষ্ঠান শেষে দিবাকর, মাধু ও অর্পণাকে ষ্টেজে নিয়ে এলো। ওদের দেখে বিরক্ত হয় রমা—অবশ্য মুখে কিছু বলে না।

কাজলের কাছেও অপর্ণাদের উপস্থিতি নিতান্ত বেখাপ্প্যা মনে হয়েছিল। দিবাকরের এই ধৃষ্টতায় সে বিস্মিত হয়েছিল। ষ্টেজের

আলোয়, কাছ থেকে মেয়েটিকে দেখে তার মনো হলো—রমার মত সুন্দরী না হলেও ; আকর্ষণ করার মতো রূপ মেয়েটির আছে বটে। এই মেয়েটির পরে দিবাকর যদি পড়ে থাকে—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে নিজেই বেশ আকর্ষণ অনুভব করছে। শুধু যে পরিস্থিতির মধ্যে একদা এই মেয়েটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল—সে কথা মনে হতে দমে যায় সে।

শিল্পী ও কর্ম্মীদের আপ্যায়ণের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন। তারই প্রস্তুতি চলছে। হলের চেয়ার সরিয়ে চক্রাকারে টেবিল ও চেয়ার সাজানো সারা হয়েছে। একে একে সবাই এসে চেয়ার দখল করে বসছেন। রমার টেবিলে চেয়ার টেনে কাজলও বসে পড়লো। ষ্টেজের উইংসের আড়ালে ভাইবোন দুটি লজ্জায় জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা আসতে রাজী ছিল না তবু টানাটুনি করে ভৈরব ওদের নীচে নিয়ে এসে এক পাশে বসিয়েদিল। রমা ও কাজলের প্রায় মুখোমুখি ওরা বসেছিল। সবশেষে দিবাকর এসে ভৈরবের পাশে বসলো।

ঘুরে ফিরে কাজলের দৃষ্টি বারবারই অপর্ণার দিকে নিবদ্ধ হচ্ছিল। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রমা বিরক্ত হয়। রমার চোখে মুখে সে বিরক্তির ভাব অপর্ণার চোখ এড়ায়নি। অপর্ণাও লক্ষ্য করছিলো কাজল ও রমাকে। ষ্টেজে ওরা প্রায় গা ঘেসে বসেছিল—এখানেও পাশাপাশি বসে মৃদুস্বরে কথা বলছে-হাসছে। অপর্ণার ভাল লাগে না।

বিরাটভাবে খাওয়া হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর একে একে সবাই চলে যেতে শুরু করলো। তিনটে গাড়ীতে মেয়েদের ও যন্ত্রশিল্পীদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ষ্টেজে রইলো ভৈরব ও তার তিনজন সাকরেদ এবং নিখিল ও কাজল সহ রমা এরা। বারান্দার এক কোণে অপর্ণা ও মাধু দাঁড়িয়ে। সেট সেটিং গুটিয়ে ও গুছিয়ে, স্পট লাইট ও মাইক বাক্সবন্দী করে দরজা জানালা বন্ধ করা হলে তালা দিতে সাকরেদদের নিয়ে দিবাকর ও ভৈরব ব্যস্ত। নিখিলও হাত লাগিয়েছে। লম্বা বারান্দায় থামের পাশে দাঁড়িয়ে কাজল ও রমা হাসাহাসি ও গল্প করছে। দীপু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দার এক কোণে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রমা কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—"তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বাড়ী যাবে না?"

"যাব, কিন্তু দাদাভাই অপেক্ষা করতে বল্লেন—অপর্ণা বলে।"

"ওঃ"—বিরক্তির সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে সরে যায় রমা।

মেয়েদের নাবিয়ে দিয়ে সাধুর গাড়ী ফিরে এলো। দিবাকর সবাইকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ছে—ভৈরবও দরজায় দরজায় তালা দিয়ে দলবল নিয়ে সাইকেলে চাপলো। সামনের সিটে দিবাকর ও কাজল। পিছনের সিটে রমা ও দীপুর সঙ্গে অপর্ণা, মাধু ও নিখিল। রমা, অপর্ণাদের লক্ষ্য করে দিবাকরকে বলে, "ওরা বাড়ী যাবে না ?" দিবাকর হেসে বলে, "যাবে বলেই তো গাড়ীতে উঠেছে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে সাধু ওদের দিয়ে বাড়ী যাবে।" সারা রাস্তায় আর কোন কথা হলো না।

বাড়ী ফিরে বসবার ঘরে বসে আরো কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়া হ'লো। অনুষ্ঠানেব ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। নিখিল কিন্তু প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পূজোর সময় সে কোলকাতায় ছিল। ভাল হয়েছে বলে সে লোকমুখে শুনেছে—কিন্তু তা যে এত ভাল হবে ভাবতেই পারেনি সে। কথা প্রসঙ্গে নিখিল কাজলকে বলে—"তোমার পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে খুব চমৎকার হয়েছে—কিন্তু দিদির ওপর অমন হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ছিলে কেন বারবার ?" আচমকা এই প্রশ্নে বিব্রত বোধ করে কাজল থতমত খেয়ে বলে "বা রে ! মাইকটা দূরে ছিল তাই—।" সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর বলে, "তাতে কি ? জানই তো খুব পাওয়ারফুল মাইক। তুমি যেখানে বসেছিলে সেখান থেকে মৃদুস্বরে যে কোন কথাই মাইক ক্যাচ করতো। রিহার্সালের সময় টেষ্ট করে তা' দেখা হয়েছিল—।" মহা ফাঁপরে পড়ে কি বলবে ভেবে ঠিক করার আগেই কাজলের অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টায় রমা দিবাকরকে বলে, "আচ্ছা বলতো অপর্ণা ও মাধুকে ষ্টেজে নিয়ে আসার কি দরকার ছিল ?" "সে তুমি বুঝবে না। শান্তিপাড়ায় কয়েকটা বখাটে ছোকরার হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছিল না-তাই—।" কথাটা শেষ হবার আগেই কাজলকে সশব্দে হেসে ওঠতে দেখে, একটু বিরক্ত হয়েই দিবাকর বলে, "হাসলে যে বড় ?" হঠাৎ দিবাকরের এ প্রশ্নে হকচকিয়ে গিয়েও, কোন রকমে সামলে নিয়ে কাজল, বলে, "আপনার কথা শুনে। ওদের সব সময় চোখে চোখে রাখতে পারবেন ?"

"তা' কি পারা যায় ? কিন্তু ব্যাপারটা হলো আমিই ওদের শো দেখাতে এনেছিলাম। ওদের নিরাপদে পৌঁছনোর দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই আমার উপরই থেকে যাচ্ছে—তাই।" "সোৎসাহে" সমর্থন জানিয়ে নিখিল বলে "রাইট খুব ঠিক কথা।" কাজল মিইয়ে যায়।

এর পর আড্ডা আর জমলো না। আচমকা দুটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের উত্থাপনের পর মন খুলে কথা বলা কারোর পক্ষেই সম্ভব হলো না।

বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করছিলো অপর্ণা। ছোট বৌদি এবং বিশেষ করে কাজলের ভাবভঙ্গী ভাল লাগেনি তার। মাঝে মাঝেই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসাহাসি করছিল। সংলাপ বা গ্রন্থনা পাঠের সময় কাজলের হাত বাড়িয়ে মাইক কাছে টেনে নেবার জন্য বারবার বৌদির ওপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়াটা খুব নির্দোষ বলে মনে হয়নি অপর্ণার চোখে। অন্যান্যরা ব্যাপারটা কি চোখে দেখেছে কে জানে? কিন্তু অপর্ণা তো জানে কাজলের মনের গোপন অভিলাষ। কে জানে ইতিমধ্যেই কাজলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন কিনা বৌদি। এ কথা ভাবতেও খারাপ লাগে। বৌদির মত মেয়ে কাজলের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এর আশু প্রতিবিধান দরকার। কিন্তু কি ভাবে তা করবে অপর্ণা! পথ খুঁজে পায় না সে।

পরদিন কাজল আসতেই রমা প্রশ্ন করে—"অপর্ণার দিকে ঘন ঘন চেয়ে চেয়ে কি খুঁজছিলে তুমি?"

"চেয়ে দেখছিলাম, মানে ভাবতে চেষ্টা করছিলাম মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছি এর আগে।"

"মেয়েটি এ শহরেই থাকে। পর্দানশীন ও নয়। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় বলে বেশ বদনামও কিনেছে। পথে ঘাটে নিশ্চয়ই দেখেছ। তাই বলে অত মশগুল হয়ে দেখার কি ছিল?" রমার কথায় বিরক্তির স্বাদ। কিন্তু তা' লক্ষ্য করে সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে কাজল বলে; "মেয়েটির নাম বুঝি রঞ্জনা?"

"কে বল্লে? ওর নাম অপর্ণা।"

"বাঃ সুন্দর নাম তো? তোমাদের আত্মীয় বুঝি?"

"আত্মীয়? আত্মীয় হতে যাবে কেন? আসলে তোমার গুণধর দাদার আশ্রিত এক উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে—।" রমার কণ্ঠে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ছোঁয়াচ—। কাজল বেশ অভিনিবেশ সহকারে রমার মুখের চেহারা দেখে শুধু বলে—"ও তাই বুঝি!" কাজলের এভাবে আসল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবার ছল পছন্দ হয় না রমার। তাই আবার প্রশ্ন করে—"আমার কথার উত্তর দিলে না যে? মেয়েটিকে বুঝি পছন্দ হয়েছে খুব?"

"পছন্দ না হবার মতো নয়। তবে যে বেয়াড়া অবস্থায় মেয়েটিকে একদিন দেখেছিলাম, এর পর পছন্দ অপছন্দের প্রশ্নই ওঠে না।

উত্তেজিত হয়ে রমা বলে, "তাই নাকি? কবে? কি ভাবে?" "উঁহু তা' বলা যাবে না—অন্ততঃ এই মুহূর্তে।" কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে রমা জিজ্ঞেস করে—"কারণ?"

"কারণ-একটু খোঁজ খবর না নিয়ে—"

"খবর্দার! ঐ মেয়ের খোঁজ খবর করতে হবে না তোমায়। মেয়েটা মোটেই ভালো নয়—।"

"তোমার হুকুম? ঠিক আছে—মেয়েটির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেব না।" রমার ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি শান্ত হয়ে আসে। কাজল সঙ্গে সঙ্গেই বলে, "আচ্ছা, তারক সরকার বলে কাউকে চেনো তুমি?"

"তারক সরকার? কে তিনি? কোথায় থাকেন?"

"শান্তিপাড়ায় তোমাদের সঙ্গে নাকি পরিচয় ছিল?" কিছুক্ষণ চিন্তা করে রমা বলে, নাঃ। এ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না?" উত্তরে কাজল শুধু বলে, "ও।" ব্যাকুল কণ্ঠে রমা বলে, "ব্যাপার কি? তারক সরকারের কথা উঠছে কেন?"

"না, না, তেমন কিছু নয়। ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিই আগে, তারপর—"

"কেন? বলতে আপত্তি কেন এতো? বেশ বলো না। আমিও শুনতে চাই না।" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কথাটা বলে উঠে ঘর ছেড়ে চলে যায় রমা। ওর গতিপথের দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হেসে কাজলও বেরিয়ে যায় বাড়ী ছেড়ে।

দুদিন পর এক সন্ধ্যায়। দিবাকরের আসবার সময় হয়েছে। এমন সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে, দরজা খুলে রমা দেখে ভৈরব ও সুকুমারের সঙ্গে ক্লাবের সেক্রেটারী বিভূতিবাবু, সঙ্গে কোট টাই পরা সৌম্য চেহারার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। রমা ব্যস্ত হয়ে ওঁদের ভেতরে এনে বসায়। বিভূতিবাবু বলেন, "অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। দিবাকর কোথায়?"

"উনি এখনও বাড়ী আসেন নি, আসার সময় হয়ে গেছে—"

"ঠিক আছে। আমরা না হয় একটু অপেক্ষাই করবো।"

"ভালই তো বসুন। উনি এখনই এসে পড়বেন।" একটু ভেবে বলে, "ফোন করে জেনে নিচ্ছি—"

"না, না, অত তাড়া নেই—"

"ঠিক আছে। আপনারা একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

"খুই ভাল কথা। তার আগে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন মিঃ ডি. কে. দাস, ডিগবয়ে এ. ও. সির ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিগবয় ইণ্ডিয়া ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। মিঃ দাস, ইনি হলেন রমা চৌধুরী, রমা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির মালিক দিবাকর চৌধুরীর স্ত্রী, আমাদের ক্লাবের শাপমোচনের পরিচালিকা—।" রমা নমস্কার করতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিনমস্কার করে বলেন, "আমি তোমাদের—" বলেই যেন হোঁচট খেয়ে থেমে আবার বলেন, "তুমি বলেছি বলে বিরক্ত হচ্ছো না তো মা? তোমার বয়সী আমার মেয়ে আছে—"

"না, না, আপনি তুমি বল্লেই ভাল লাগবে আমার।"

"বা:। লক্ষ্মী মা আমার শোন—তোমাদের শাপমোচন দেখলাম দু'বার। পূজোর সময় আর গত শনিবার। আমার এবং তোমার কাকীমার খুব ভালো লেগেছে। শুধু আমরাই নই, ডিগবয় ক্লাবের অনেকেই দেখেছেন ওদেরও খুব ভালো লেগেছে। ক্লাবে তাই নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল। নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার আমাদের ষ্টেজে তোমাদের শাপমোচন দেখতে চাই। তোমার সম্মতি পেলে ক্লাবের মিটিং ডেকে রিজুসন নিয়ে তোমাদের আমন্ত্রণ জানাব-সেজন্যে—"

"আমার একার সম্মতি থাকলেই তো হবে না। যাঁরা এতে অংশ নিয়েছেন তাঁদের মতামত না জেনে এই মুহূর্তে কি করে কথা দেব কাকু? তাছাড়া ওঁর তো একটা মতামত—"

"নিশ্চয়ই। আমরা না হয় একটু বসবো। ততক্ষণে আমাদের চা খাওয়াও। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। বুড়ো মানুষ বুঝতেই তো পারছো মা—" রমা হেসে ভেতরে চলে যায়।

রান্নাঘরে যাবার আগে অফিসে ফোন করে রমা। দিবাকর অফিসেই ছিল। শুনেই বলে, "এক্ষুনি আসছি, কিছু খাবারও নিয়ে আসছি। চা রেডি করো। রমা ট্রেতে চায়েব কাপ সাজানো শেষ করতে না করতেই দিবাকরের বাইক সশব্দে বাড়ীর গেটে ঢোকে।

ঠিক হলো অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত নিয়ে শুক্রবার সকালেই ফোনে মিঃ দাসকে জানানো হবে যাতে রবিবার ওদের ক্লাবের মিটিং ডাকতে পারেন। এর মধ্যে রমা বলে বসলো, "যদি অনুষ্ঠান করতে পারি তবে সে অনুষ্ঠান কিন্তু ডিব্রুগড় বেঙ্গলী ক্লাবের ব্যানারেই হবে—।" বিভূতিবাবু শুনে খুব খুশী হলেন।

ওরা বিদায় নেওয়ার পর দিবাকর হেসে বলে, "নাও হলো তো? আর

এক কিস্তি অনুষ্ঠানের ভার কাঁধে চাপলো। মনে হয় না কেউ আপত্তি করবে—"

"কি জানি বাপু—। কাজলকে বিশ্বাস নেই। আগের মত হঠাৎ যদি নতুন কোন ফেচাং জুড়ে বসে—"

"ওকে বলে দেখো না। বেশী গাঁইগুই করলে তিনসুকিয়ার—"

"তা জানি। শো আটকাবে না ঠিকই। কিন্তু কাজল থাকলে যত ভাল হবে, নতুন কাউকে নিয়ে কি তেমন হবে? কিন্তু কাজলকে আমি নিজে বলতে চাই না—"

"কেন?"

"বুঝতে পারছো না? ভাল গান গেয়ে, সুন্দর গ্রন্থনা ও সংলাপ পাঠ করে, তার একটু আমড়াগাছি হয়নি কি? বল্লেই গাঁইগুই শুরু করবে। হয় ইনটারভিউ, নয় কোম্পানীর কাজ, নয় কারুর অসুখ, এমনই কিছু বাহানার সৃষ্টি করবেই. ওসব সামাল দেওয়া আমার কর্ম নয়।

"চিন্তা করো না। এই ব্যাপারে কোন কথা তুমি বলো না। যা বলবার আমিই বল্‌বো। কিন্তু ও যদি এ বিষয়ে তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করে তুমি স্রেফ বল্‌বে জানি না। ও যদি তোমায় ঐ অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করে এক কথায় কখনও রাজী হবে না। দীপুর পরীক্ষার কথা, তোমার নিজের অসুবিধার কথা বলে শুধু তোমার আপত্তি জানাবে। সহজে রাজী হবে না তুমি। কেমন? দেখো না কি করি আমি।

"কি করবে তুমি" কৌতূহলের সঙ্গে বলে রমা।

"কিছু না। শুধু বল্‌বো ডিগবয় থেকে প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তুমি কিছুতেই রাজী হচ্ছো না। অথচ এ অনুষ্ঠান করতে পারলে ওয়েল কোম্পানীর হোমড়া চোমড়াদের সঙ্গে পরিচয় হতো এবং ধীরে ধীরে ওদের মালপত্র আনা নেওয়ার কাজটা হাতেনেওয়ার চেষ্টা জোরদার হতো। আমি ওকেই ভার দেব তোমায় রাজী করাতে—"

"ওর কথায় রাজী হতে হবে নাকি?" তেতে ওঠে রমা। কিন্তু ওর আপত্তি নস্যাৎ করতে দিবাকর বলে "দূর বোকা! ওকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোমার কাছে পাঠাব। প্রথম খুব আপত্তি করবে তুমি নানা অসুবিধার কথা বলে। শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও কেবলমাত্র ওর অনুরোধেই রাজী হচ্ছো এমন ভাব দেখাবে। দেখবে এই ডিগবয় শো নিয়ে ভায়ার মাথা ব্যথার দৌড়।" কথাটা মনে ধরে রমার। কাজলকে বেশ নাচানো

যাবে এই আছিলায়। হেসে বলে, "ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে ?"

সে ভাবেই কাজ হলো। দিবাকরের কথায় যেন গলে গেল কাজল! এত বড় সম্মান হারাতে রাজী নয় সে। রমাকে রাজী করাবার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিল সে দুটি সর্তে। এক হলো কোন সেট সেটিং নয়, শুধু কালো পর্দা পেছনে রেখে অনুষ্ঠান হবে। আর দুই হলো গায়কও-বাদকবৃন্দ ষ্টেজের সামনের দিকে নয়, পেছনের পর্দার কোল ঘেঁষে কোণাকুণি বসাতে হবে। দিবাকর তাতেই রাজী। এনিয়ে ভৈরবের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ডিগবয়ের ষ্টেজ বেশ ছোট ও নীচু। অতবড় সেটসেটিং সেখানে বসানো মুশকিল। আর গায়ক ও বাদকবৃন্দকে পেছনে ঐ ভাবে বসানো ছাড়া উপায় নেই। কেন না ডিগবয় ষ্টেজের ওপেনিং ডিব্রুগড় থেকে ছয় ফুট ছোট। শুধু লাইট ও মাইক নিয়ে যাওয়া হবে স্থির হলো।

রমা তো পুরো একটা দিন মতই দিল না। দ্বিতীয় দিনে কাজলের অশেষ সাধ্য-সাধনায় অবশেষে রাজী হলো একটি সর্তে। দীপুর পরীক্ষার পড়ার অসুবিধা হবে, তাই ডিগবয়ের চিঠি পাওয়ার পর সপ্তাহে শুধু দুদিন অর্থাৎ শনি ও রবিবার রিহার্সেল হবে, এবং অনুষ্ঠানের আগে পরপর তিনদিন রিহার্সেল দেওয়া হবে। রমাকে রাজী করাতে পেরে খুশী যেন ধরে না কাজলের। বুক ফুলিয়ে নিজের এই সাফল্যের কথা ফলাও করে বলে সে দিবাকরের কাছে। দিবাকরও যেন খুশীতে ডগমগ হয় পিঠ চাপড়ে দেয় কাজলের। ব্যাপাবটার ফয়সালা হওয়াতে রমা ও দিবাকর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে দুজন একটু আপত্তি জানালেও শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন। সবার মতামত নিয়ে বিভূতিবাবু ফোনে সম্মতি জানিয়ে দিলেন। যথাসময় ডিগবয় ক্লাব আমন্ত্রণ লিপি পাঠালো প্রভিশনিলি নভেম্বরের প্রথম শনিবার অর্থাৎ ১২ তারিখ অনুষ্ঠানের দিন ধার্য্য করে।

পরবর্ত্তী রবিবার প্রথম রিহার্সেলের দিন অরুণেশ্বরের ভূমিকায় যে অসমিয়া মেয়ে শকুন্তলা দোয়ারা নাচছিল সে উপস্থিত না হওয়ায় সোমবার সকালের দিকে অফিসের কাজ সেরে আমলাপট্টি গিয়েছিল দিবাকর খোঁজ খবর করতে। ফেরার পথে অপর্ণাদের বাড়ীর কাছে এসে কি মনে হলো দিবাকর নেমে পড়ে। বাইকের শব্দ শুনে দরজা খুলে দাঁড়ায় অপর্ণা। দিবাকর ঘরে ঢোকে।

"কিরে ? কেউ নেই নাকি বাড়ীতে ? কোথায় সব ?

"এ সময় কে আবার বাড়ী থাকে ? একটু আগে খেয়ে দেয়ে বাবা কাজে বেরিয়েছেন। মা গেলেন পাড়ার বিভামাসীর বাড়ী সোয়েটারের ডিজাইন আনতে। ডাকৃবো মাকে ?"

"না থাক"-সাধুর বিছানায় টান টান হয় শুনে দিবাকর বলে

"এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকিনি—"

"চা খাবে দাদাভাই ?"

"না রে। এখন আর চা নয়—"

"লেবুর সরবত ?"

"করবি ? আচ্ছা তবে তাই করে নিয়ে আয়।" অপর্ণা চলে যায়। সকাল থেকে একটানা ছুটোছুটির পালা শুরু হয়েছে। ক্লান্তিতে তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল দিবাকর। একটু পরে সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে অপর্ণা পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকে "দাদাভাই।" চমকে উঠে তাকায় দিবাকর। ধড়মড় করে উঠে বসে গ্লাস হাতে নেয়। "রাত্রে বুঝি ঘুম হয়নি ভালো ?" অপর্ণা বলে।

"তা কেন। ভালই তো ঘুমিয়েছি রাত্রে—।"

"না, শুতে না শুতে ঘুমে ঢুলে পড়েছিলে তাই মনে হলো—"

"সকাল থেকে বড় ছোটাছুটি গেছে, বড় ক্লান্ত।" কথা শেষ করে না দিবাকর। সরবতের গ্লাসে চুমুক দেয় তরিয়ে তরিয়ে।

"মুখ গম্ভীর করে অত কি ভাবছো দাদাভাই ?"

"ভাবছি কোথায় রে ? বল্লাম না খুব ক্লান্ত—।"

"বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করনি তো ?"

"ঝগড়া ? তা কেন ? তোর বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হবে কেন ?" একটু দেখে আবার বলে দিবাকর, "হঠাৎ ঝগড়ার কথা তোর মনে হলো কেন রে ?"

"এমনি একটু মজা করছি। সেদিন বৌদির পাশে বসে গান গাইলেন যিনি উনিই বুঝি কাজল ব্যানার্জী ? কোথায় থাকেন উনি ?"

"আমাদের বাড়ীর পেছনের দিকেই থাকেন। তোর বৌদির ভাই গাম্নুর খুব পরিচিত বন্ধুলোক। খুব ভালো ছেলে। কেমন গাইলো বল দেখি।"

"বৌদির পাশে বসেই তো উনি গান করছিলেন—" ওর কথা শুনে কিছু যেন আঁচ করে দিবাকর বলে, "ছেলেটিকে নিয়ে তোর দেখছি উৎসাহের অন্ত নেই। পছন্দ হয়েছে বুঝি ? বলবি তো সে কথা। আলাপ চালাবো ?"

"রামোঃ রামোঃ। ঐ লোকটাকে বিয়ে? রক্ষে কর দাদাভাই। এ কথা মনে রেখো যে লোকটি মোটেই সুবিধার নয়।"

"আহা রে-কত যেন মানুষ চিনিস তুই! পাঁচ ছয় মাস যাবৎ দিন রাত দেখেও আমরা চিনতে পারলাম না, আর এক ঝলক দেখেই তুই জেনে গেলি লোকটা সুবিধের নয়। কি করে জানলি রে? মন্ত্র বলে?

"ঠাট্টা করো আর যাই কর—একথা জেনে রেখো। সবাই পারে কিনা জানি না কিন্তু আমি পারি। মুখ দেখেই মানুষ চিনতে পারি। তোমায় চিনলুম কি করে? এর জন্য দিনের পর দিন দেখতে হয় না। আমি বলছি দাদাভাই, লোকটা একেবারেই সুবিধের নয়। লোকটাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিয়ো না যেন", দৃঢ় স্বরে বলে অপর্ণা। অপর্ণার এই পাকামোতো বিরক্ত হয়ে দিবাকর বলে, "কি যা তা আজে বাজে কথা বল্‌ছিস্‌ তুই? এতদিন ধরে আমরা ওকে দেখছি। শুধু যে গুণী তা নয় ছেলেটা সত্যি বড় ভাল। যেমন কথাবার্ত্তায়, তেমনি ব্যবহারে।"

"ছাই জানো তুমি" গলা চড়িয়ে বলেই, হঠাৎ কাছে এসে গলা নাবিয়ে বলে—"ওর ওপর কড়া নজর রেখো। বৌদিকেও সাবধান করে দিয়ো, কোন রকম আস্কারা যেন তাকে না দেন—" গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে দিবাকর। অপর্ণার বাচালতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁত কিড়মিড় করে হিস্‌হিস্‌ করে চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে "তোর বৌদির চালচলন কি হবে সে কি তোর কাছে শিখতে হবে হতভাগী—" বলেই প্রচণ্ড জোরে চড় মারে অপর্ণাকে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে দিবাকরের মুখের দিকে তাকায় অপর্ণা। কান্নার আবেগে থর থর কাঁপছে তার দুটি ঠোঁট, টলমল করছে দুচোখের কোনে জল- ক্ষোভে দুঃখে আর্ত্তনাদ করে ওঠে অপর্ণা, বলে "তুমি আমায় মারলে দাদাভাই? তুমি—?" হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে ছুটে চলে যায় অপর্ণা।

দুহাতে মাথা চেপে বসে থাকে দিবাকর। একি সে করলো? এত উত্তেজিত সে হলো কেন? এ মেয়েটা শত দোষে দোষী। তবু-দিবাকর জানে মেয়েটির অন্তকরণ ছোট নয়—। অবস্থার চাপ, অভাব অনটন ওকে দিকভ্রান্ত করেছে—কিন্তু ছোট করেনি। কাজল সম্পর্কে এত জোর দিয়ে শুধু শুধুই কি গালগল্প করে গেল? এই মুহুর্ত্তে দিবাকরের মনে হলো হয়ত তা' নয়। হয়ত তার কলুষিত জীবনের-কোন ক্ষণে কাজলের সংস্পর্শে সে এসেছে: জেনেছে কাজলের স্বভাব-তাই স্বতঃস্ফূর্ত হয় তার মুখে এই সতর্কবাণী।

অপর্ণাকে সে ভালবাসে নিজের আদুরে ছোট বোনের মত। অপর্ণারও যত আব্দার তারই কাছে। মনে আছে মনসুরের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পরদিন দিবাকর যখন ওর কাছে বসে উপদেশ দিচ্ছিল তখন হেসে অপর্ণা বলে চুপ করো তো দাদাভাই। উপদেশ দিতে হবে না আর তোমার মহালদারের দাবড়ানিতে ঐ গুণ্ডাগুলি যদি আমায় আর বিরক্ত না করে তা হলেই দেখবে আর কখনও এ সব কাজ আমি করবো না। আমি কি ইচ্ছে করে করতাম ? ওরা আমায় ভয় দেখাতো ওদের কথা না শুনলে দাদার আর মাধুর পেট ফেড়ে ফেলবে ছোড়া দিয়ে—।এর বেশী একটি কথাও বলেনি অপর্ণা। এবং এ কথাও সত্যি এরপর ওর চলাফেরা অনেক সংযত অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। বেদনায় অনুশোচনায় আর স্থির থাকতে পারে না দিবাকর। উঠে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। বিছানার উপুর হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অপর্ণা।

কাঁদছে অপর্ণা আর ভাবছে দিবাকর তার আপন ভাই নয়। পথের পরিচয় মাত্র তার সঙ্গে! তবু সেই প্রথম দিনের দিবাকরের সেই প্রথম সম্ভাষণ সে ভুলতে পারে না" এখানে বোস। আমি তোর দাদা হই। এখন থেকে আর কোন ভয় নেই তোর," সামান্য এ কটি কথা মুল্যবান করে তুলেছে তাকে। নিজের দাদা যা করতো না-করেনি কোনদিন-তাই করেছে দিবাকর। বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত দিবাকর-দাদাভাই হয়ে এসেছে তার জীবনে। কত অপরাধ সে করেছে কিন্তু কখনও মেজাজ হারায়নি দাদাভাই। শান্ত ধীর কণ্ঠে তার অন্যায় কাজগুলির সমালোচনা করেছে সঠিক পথের হদিস দিয়েছে উপদেশ দিয়েছে। ভুল বা অন্যায় তো সে বারে বারেই করেছে তবুও একদিনের জন্যেও বকুনিঝকুনি দূরে থাক কড়া কথাও বলেনি দাদাভাই। আর আজ কিনা সেই দাদাভাই অন্যায় ভাবে তাকে চড় মারলো ? দুঃখে অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় অপর্ণা।

দিবাকর ধীরে ধীরে বিছানায় এসে বসলো। অপর্ণার মাথায় পিঠে হাত বুলতে বুলতে বলে "অপু শোন আমারই অন্যায় হয়ে গেছে রে। হঠাৎ কি যে হলো। মাথাটা যেন ঘুরে গেল। তুই রাগ করে থাকিস না ভাই। তোর দাদাভাইকে ক্ষমা কর।" অপর্ণার কান্নার বেগ বেড়েই চলেছে। হতাশ দিবাকর ওর পিঠে ঝাঁকুনি দিয়ে বসল, "ওঠ অপু আমার দিকে ফিরে চেয়ে দেখ একবার—আমার কথা শোন—আর ঠিক তখনই আচমকা ঘরে এসে ঢোকেন কমলাদি। দিবাকর ও অপর্ণাকে এই অবস্থায় দেখে চমকে উঠে—পেছন ফিরে দ্রুত বেরিয়ে যায় তিনি চৌকাঠ পেরিয়ে। ছায়ার মত

কাউকে সরে যেতে দেখে দিবাকর পেছন ফিরে বলে "কে ? কে ওখানে ?" আর কে ? কোন জবাব নেই। একটা অস্পষ্ট পদধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল। ছুটে পেছনের বারন্দায় এসে দাঁড়ালো দিবাকর। দেখলো কেউ পেছনের খিড়কীর দরজা পেরিয়ে গেল। দেখা গেল না, চেনা গেল না—তাঁতের শাড়ীর আঁচলের প্রান্তটুকু দেখা গেল শুধু।

কে এসেছিল, কে জানে ? যা' দেখে গেল এ নিয়ে রং চড়িয়ে কি কথা রাষ্ট্র হবে—তাই বা কে জানে ? নিজের ওপর রেগে ওঠে দিবাকর। মেজাজকে সংযত রাখার অভ্যাস কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার ? পেছন ফিরতেই দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপর্ণা। মুখে তার রহস্য ভরা হাসি। দিবাকর ওর মুখের দিকে তাকাতেই বলে, "হলো তো এবার বুঝবে মজা—"

"ভদ্রমহিলাটি কে রে ?"

"কমলা মাসি। খুব সাবধান ! তুমি এখন রেডিয়োর সংবাদ হয়ে গেছ দাদাভাই—"

"এ আবার কি কথা ?" আল্‌গা ভাবে কথাটা বলে দিবাকর। "কদিনের মধ্যেই জানবে—।"

ওরা ঘরে এসে বস্‌তে না বস্‌তেই হন্তদন্ত হয়ে ঢোকেন অপর্ণার মা। দিবাকরকে দেখে বিগলিত হাসি হেসে বলে, "ও তুমি ? কখন এলে বাবা ?"

"এসেছি তো বেশ কিছুক্ষণ—কিন্তু—"বলে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে বলে, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কি ? যা' না চট করে এক কাপ চা করে খাওয়া।" অপর্ণা চলে যেতেই দিবাকর বলে, "মস্ত বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছি মাসিমা—।" ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অপর্ণার মা বলে, "কি করেছ বাবা ?"

"যা কোনদিন করিনি তাই করেছি। হঠাৎ বেগে উঠে অপর্ণাকে প্রচণ্ড জোরে চড় মেরেছি— ।"

"নিশ্চয় অন্যায় করেছে বলেই মেরেছ। তা' মারবে না কেন ? মায়ের পেটের না হলেও সে তো তোমারই বোন। অন্যায় দেখলে শাসন করতেই হয়—এতে অন্যায়টা হলো কোথায় ?"

"সে জানি। কিন্তু লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি।"

"কি হয়েছিল বাবা—?"

"আজ নয় মাসিমা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। পরে একদিন সময় মতো

বলবো।" সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেয় দিবাকর—"কিরে অপু, হলো। ঘড়ির কাঁটা যে একটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে রে! দেরী হলে না হয় থাক —।"

চা খেয়েই বাইকে চড়ে বসে দিবাকর। অপর্ণার কথাগুলি কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে তার। হঠাৎ কাজলকে নিয়ে পড়লো কেন? সে দিনের সেই ফ্রক পড়া বোকা বোকা মেয়েটা একেবারে পেকে গেছে। আর হবে নাইবা কেন? পরিবেশটাও তো ছিল তেমনি। কিন্তু কাজল সম্পর্কে এত কড়া সুরে বলে কেন সে? এই-ক'মাস কাজলকে দিনর'ত চব্বিশ ঘণ্টা দিবাকর দেখেছে। কিন্তু কই? কথা বার্তা বা ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছুই তো চোখে পড়েনি আজ পর্য্যন্ত! তাছাড়া, রমার যা খুঁত খুঁতে স্বভাব, তেমন তেমন বুঝলে ঘরেই ঢুকতে দিতো না কাজলকে। অথচ কী ধৃষ্টতা অপর্ণার—সে কিনা রমাকে সাবধান করার কথা বলে? ও তো জানে না কি ধাতুতে গড়া এই রমা! রমাকে বলতে হয় না। ও ভীষণ সাবধানী মেয়ে। কোন কিছুই তার চোখ এড়ায় না। আর কি আশ্চর্য্য—অর্ব্বাচীন মেয়েটা প্রশ্ন করে রমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কি না? ঝগড়া? হ'বে না কেন? খুব হয়। কিন্তু এ ঝগড়া কি সে ঝগড়া? এ যে কত মধুর অপর্ণা জানবে কেমন করে? কমলা মাসীই বা কে? অপর্ণা তো রেডিয়োর সংবাদ হয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে দিল। অসম্ভব কিছুই নয়—যে অবস্থায় ওরা ছিল। হঠাৎ দেখে কু-সন্দেহ হওয়া চিচিত্র নয়। অবশ্য এর জন্যে তার নিজের কোন ভয় নেই। রমা কখনও এ সব মিথ্যে সন্দেহের কথা আমলই দেবে না। ভাবতে ভাবতেই দেখে বাড়ীর গেটের সামনে এসে পড়েছে সে। বারান্দায় তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রমা। ব্রেক কষে দাঁড়াতেই মিষ্টি হাসি হেসে রমা নীচে নেমে আসে।

"এতো দেরী হলো যে—?"

"কি করি বলো? যার কাছেই যাই ঠিক সময় ঠিক জায়গায় সে কখনই থাকে না—। তাই—"

"তাই বুঝি এত গম্ভীর তোমার মুখ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। শোন, তোমার শকুন্তলা দোয়ারার খবর হলো, সে তার খুড়তুতো বোনের বিয়েতে জোড়হাট গেছে। যাবার কথা ছিল না—জোর করে নিয়ে গেছে তাকে। সামনের সপ্তাহ থেকে রেগুলারলি আসবে। কি খুসি তো?"

"খুসী হব না? কত কষ্ট করছো আমার জন্যে। নাও, ঘরে উঠে এসো। একটু জিরিয়ে নাও।—তারপরে চানে যেয়ো। বাইকের শব্দ শুনেই প্লাগ

জ্বাগিয়ে দিয়েছি। চানে যেতে যেতেই জল গরম হয় যাবে। আমি ততক্ষণ খাবার গরম করি—" মমতা ভরা কণ্ঠে রমা বলে। মনটা ভরে ওঠে দিবাকরের। সব গ্লানি দূর হয়ে নির্ম্মল আনন্দে দুলে ওঠে সে।

"দিবাকরের সঙ্গে কি হয়েছিল তোর ?" মা প্রশ্ন করেন।

"কি হবে আবার। কিছু হয়নি তো ?" নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে অপর্ণা।

"কমলাদি যে বল্লেন—"

"ওঃ সেই কথা ? দাদাভাই রেগে আমায় চড় মেরেছিল। আমি এ ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিলাম। দাদাভাই এ ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, রাগ করিস না ভাই। হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল তাই। আর তখনই ঐ বিটকেলে কমলা মাসী এসে ঘরে ঢুকেছিল। কি লাগিয়েছে তোমার কাছে।"

"চুপ কর। তুই কি বলেছিলি দিবাকরকে ?"

বলেছিলাম বৌদির পাশে বসে সেদিন ষ্টেজে গান গাইছিলো লোকটা সে ভাল নয়। ওকে যেন বৌদি আস্কারা না দেয়।

"পাকামো করতে কে বলেছে তোকে ? বড়লোকদের ব্যাপারে নাক গলাস কেন। ওদের পাঁঠা—লেজে কাটবে কি গলায় কাট্‌বে সে ওরা বুঝবে। এতে তোর বা আমার কি এসে যায় ?"

"বারে আমাদেরই দাদা। আমাদের ভাল মন্দের সময় শুধু দাদাভাইকে দরকার, না ? তাঁর ভাল মন্দে কোন দায় নেই আমাদের ? শুধু নিজের স্বার্থ হলেই হলো না ?"

"থাক্ থাক্ আর আদিখ্যেতার কাজ নেই। এম্নি মুখ দেখাতে পারি না মানুষের কাছে। নতুন করে কেচ্ছা শুরু হল আবার।"

"হ্যাঁ, সেই ভয়েই মরি আর কি !" ধুপধাপ করে সরে পড়ে অপর্ণা।

রিহার্সেল চলাকালীন এক শনিবার। রিহার্সেলের শেষে কাজল বলে, কাল অরোরাতে মর্নিং শোতে ভাল বই আসছে। দেখবে ? এয়োয়ার্ড পাওয়া ছবি।

"ইংরাজী ?" রমা প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ ইংরাজী। কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না। পুরনো ছবি কিন্তু খুব সুন্দর।"

"কি করে জানলে ?"

"কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম তো—"

"না ভাই কথা বুঝতে না পারলে ভাল লাগে না।"

"আরে আমি তো আছি। লক্ষীটি চলো না। অনুরোধে তো ঢেঁকিও গেলে।"

"ঢেঁকি গিলে তো বসে আছি। এই ডিগবয়ের ঝামেলা, একি কম?"

"তাঁর জন্যে ভেবো না। জান দিয়ে লড়ে জয়ের মুকুট তোমার মাথায় তুলে দেব। কাজলের কথা বলার ঢং দেখে ফিক করে হেসে রমা বলে—"ঠিক আছে কটায় শো।"

"কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায়। তুমি রিক্সা করে চলে যেয়ো, আমাকে হলেই পাবে।"

ভোর বেলাতেই দিবাকরকে কাপড় চোপড় পরতে দেখে রমা বলে, "যাচ্ছ কোথায় এই ভোরে?"

"টেঙ্গাঘাট যেতে হবে—ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"দূর! ভাবলাম দুজনে মিলে একটা ছবি দেখবো মর্নিং শো—।"

"মুস্কিল হলো কথা দেওয়া আছে। টেঙ্গাঘাটের ফোন লাইনও খারাপ। ঠিক আছে, তোমার জন্যে না হয় কথার খেলাপ হোক আজ।"

"কথার খেলাপ করবে তুমি?"

"তোমার জন্য এটুকু ত্যাগও করতে পারবো না?"

"না বাবা দরকার নেই। আমার জন্য তোমার বদনাম হবে কিছুতেই সহ্য হবে না আমার। আজ তোমায় আটকাবো না। কথা দিয়েছ যখন কথা রাখতেই হবে। কিন্তু মনে রেখো—ডিগবয়ের শো শেষ হবার পর আমার সঙ্গে মর্নিং শোতে যেতে হবে তোমায়—।"

"যথা আজ্ঞা দেবী। কিন্তু আজকের শো? একা না পার নিখিল অথবা কাজলকে নিয়ে—।"

"নিখিল তো বাইরে। কাজলও বোধহয় বাড়ী নেই। দেখি পাই ভাল না পেলে একাই দেখবো।"

হলের সামনেই কাজল দাঁড়িয়ে ছিল। রিক্সায় রমাকে একা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, "ভাবছিলুম-দাদাকেও আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসছো তুমি।"

"তিনটে টিকিট কেটেছ তো?"

"না, দুটোই কেটেছি। বলে রেখেছি আরও একটার দরকার হতে পারে।"

"বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।"

যথা সময় বই শুরু হলো। ছবির নাম কংকারড্। রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—

লোক গিজ গিজ করছে। একটা ট্রেন এসে থামলো। টিকিট ঘর থেকে বেরিয়ে ঢাউস স্যুটকেশ কষ্টে সৃষ্টে বয়ে সুন্দরী তরুণীটি গাড়ীর করিডোরে এসে দাঁড়াল। কামরায় প্রায় সব সিটই ভর্ত্তি। হঠাৎ একটা খালি সিট চোখে পড়তেই ভারী ব্যাগ টানতে টানতে মেয়েটি ভেতরে ঢুক্‌লো। বাঙ্কে তুলতে পারছে না স্যুটকেশ। সামনের সিটের সুপুরুষ যুবকটি সাহায্য করলে। তরুণী সলজ্জ কৃতজ্ঞতা জানালো।

খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন আদান প্রদান, টুকরো টুকরো কথাবার্তা আর হাসির মধ্যে ওরা অন্তরঙ্গ হলো। মেয়েটির গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর আগেই যুবকটি মেয়েটির নাম ও ঠিকানা নোট বইয়ে লিখে নিল। পরিবর্তে নিজের সুদৃশ্য কার্ড দিল মেয়েটিকে। চোখ বড় করে যুবকের দিকে তাকাল মেয়েটি।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো। মেয়েটি সসব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবার সে নামবে। দুজনের মুখ ম্লান। যুবকটি ভারী স্যুটকেশ বয়ে নাবিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মে। গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে যুবক নীচে মেয়ে—চোখে চোখে চেয়ে আছে। গাড়ী চলতে শুরু করলো,সজল চোখে হাত নাড়ালো মেয়েটি, ছেলেটিও। গাড়ী চলে গেল, সেদিকে চেয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। চোখ জল ভরা।

বিরাট ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে কাজ করে মেয়েটি। কাজের ফাঁকে ব্যাগ থেকে কার্ডখানা বার করে দেখে বুকে চেপে ধরে চুমু খায়। হঠাৎ একদিন—এ কী! তার কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সেই যুবক। আনন্দে নেচে ওঠে যেন মেয়েটি। ছুটির পর ওদের দেখা হলো পার্কে, সেখান থেকে রেঁস্তোরা। আড়ালে বসে জড়াজড়ি চুমু খাওয়া। মেয়েটিকে নিয়ে নিজের হোটেলে এলো। বিরাট হোটেল—বিস্ময় বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মেয়েটি। যুবকটি আমোদ পায়। ডিনার শেষ করে লিফ্‌টে করে নিয়ে আসে নিজের কামরায়। আবার জড়াজড়ি চুমু খাওয়া। মেয়েটিকে শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য কাকুতি মিনতি। মেয়েটি রাজী নয়। সে ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। স্বামী ছাড়া আর কাউকে দেহদান করবে না সে। ছেলেটিও ক্যাথলিক। শেষ পর্য্যন্ত ওদের বিয়ে হলো চার্চে গিয়ে। মেয়েটি সুখী, যুবকটিও—।

স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরে এলো মেয়েটি। মস্ত বড় সহরে বিরাট বিল্ডিংয়ে সুন্দর সাজানো গোছানো একখানা ফ্ল্যাট। বোঝা গেল যুবকটি সম্পদশালী ব্যক্তি। কদি'ন খুব আনন্দে কাট্‌লো ওঁদের দিন। অবশেষে কাজে বের

হতে শুরু করলো স্বামী। প্রথম দিকে স্বামীর বাড়ী ফিরে আসার তাগিদ ছিল প্রগাঢ়। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো তা। এক নাগাড়ে সাত আট দিন বাহিরে কাটে স্বামীর। বিরাট ফ্ল্যাটে একা বসে বসে দিন কাটে না মেয়েটির। নীচে নেমে এদিক ওদিকে বেড়াতে বের হয়। কিছু লোক পেছন নেয়। ওদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বেড়ানোই বন্ধ করলো। সাতদিন পর স্বামী এলো—টাকার বাণ্ডিল ও অজস্র উপহারে কোল ভর্ত্তি হয়ে যায় মেয়েটির। স্বামীর আদরে সোহাগে মেয়েটি পাগল হয়ে ওঠে।

আবার একদিন বেরিয়ে যায় স্বামী। সপ্তাহ খানেক ধরে স্বামীর কোন পাত্তা নেই। সেই একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ দপ্ করে ফ্ল্যাটের সব আলো নিভে গেল। দিশহারা মেয়েটি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন সময় পাশের ফ্ল্যাটের বর্ষিয়সী মহিলা বল্লেন, রাস্তার ওপারে ইলেকট্রিক স্টোরে জানালে চার্জ নিয়ে ওরা লোক পাঠিয়ে দেয় মেরামত করতে।

মেয়েটি নেমে আসে নীচে, কিন্তু রাস্তা পার হবার সুযোগ পাচ্ছে না—অসংখ্য চলমান গাড়ীর ভিড়। দূরে দাঁড়িয়ে সুবেশ একটি তরুণ। মেয়েটি ছুটোছুটি ও ব্যস্ততা লক্ষ্য করে কাছে এসে কি সাহায্যের দরকার জানতে চায়। মেয়েটি তার অসুবিধার কথা বলে। ছেলেটি ভরসা দেয়। ওরা ফ্ল্যাটে এসে ঢুকে। ছেলেটি কি করলো কে জানে সমস্ত ফ্ল্যাট আলোয় ঝলমল করে উঠলো। মেয়েটির মুখে হাসি ফোটে। ছেলেটি চলে যাচ্ছে। মেয়েটি এগিয়ে যায়—ব্যাগ খুলে ব্যাঙ্ক নোট বার করে। কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই নেবে না অবশেষে মেয়েটির অনুরোধে খাবার টেবিলে এসে বসলো—খাবার খেলো কফি খেলো। এবং আবার আসবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চলে গেল।

ছেলেটি প্রায়ই আসে। দুজনে পার্ক, কাফে-রেঁস্তোরায় বেড়িয়ে বেড়ায়। দুজনে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়লো। একদিন দুর্বল মূহুর্তে ছেলেটি মেয়েটিকে জড়িয়ে চুমু খায়। মেয়েটি হিংস্র প্রতিরোধ চালায়—। টেবিল-নাইফ বাগিয়ে ছেলেটিকে বার করে দেয়। আবার সেই নিঃসঙ্গতা। মেয়েটি ক্লান্ত।

কিছুদিন পরে আবার মেয়েটির স্বামী ফিরে এসে টাকার বন্যায় ও উপহারে মেয়েটিকে ভরিয়ে দিল। মেয়েটি স্বামীকে পেয়ে আর ছাড়তে চায় না।

কিন্তু তবু ছাড়তে হয়—যেতে দিতে হয়। ব্যবসায়ী স্বামী কাজে না বেরুলে সংসার চলবে কেমন করে?

স্বামী চলে যাবেন তাই বাক্স-প্যাটরা প্যাক করে বাথরুমে গেছেন চান

টান সারতে। বাড়ীর পোষা বিড়ালটি লাফ দেবার সময় টেবিলে খাড়া করে রাখা ব্রীফ কেস ফেলে দিল। সব সময়ই তালা বন্ধ থাকে ব্রীফ কেসে। সেদিন তালা লাগতে ভুলে গিয়েছিলেন স্বামী—। খোলা ব্রীফ কেস থেকে এক তাড়া ফটো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে, সঙ্গে একটা চিঠিও। উল্টে পাল্টে সব দেখে মেয়েটি বুঝতে পারে তাকে প্রাচুর্যের মধ্যে ভুলিয়ে ধোঁকা দিয়ে স্বামীটি ব্যবসার নামে প্রেমিকার সঙ্গে গোপন বিহারে মত্ত। যেমন ছিল তেমনি ভাবে সব গুছিয়ে রাখে মেয়েটি। চোখের দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

স্বামী বেরিয়ে গেলে পর মেয়েটি নীচে রাস্তায় নেবে পথে পথে খুঁজে বেড়ায় সেই ছেলেটিকে। পেয়েও যায়। মেয়েটি সেই ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাদের ফ্ল্যাটে এবং দরজা বন্ধ করে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে ছবিটা ঝাপসা হয়ে যায়।

কথাবার্তায় একটুও বুঝতে পারেনি রমা। কিন্তু ঘটনাটা বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি রমার। অসুবিধে হয়নি কাজলের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে। তাই বেরিয়ে আসার সময় কাজল যখন প্রশ্ন করলো, "কেমন লাগলো তোমার ছবিটা ?" রমা দৃঢ়স্বরে বলেছিল, "একটুও ভাল লাগেনি·ছবিটা—।" তারপরই হন হন করে এগিয়ে একখানা খালি রিক্সায় চড়ে বসে বাড়ী চলে যায়। একা উদভ্রান্ত কাজল চেয়ে থাকে।

ছবির স্ত্রীর জন্য মনটা ভারী ওঠে রমার। কিন্তু তা হলেও শেষ দৃশ্যে নতুন প্রেমিকের কাছে এ ভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া সে সমর্থন করে না। সে নিজে কখনই পারতো না এবং মরে গেলেও পারবে না। ভগবান তার সহায়। দিবাকরের মতো যার স্বামী আছে—এই অতলে তলিয়ে যাবার তার কোন সম্ভাবনাই যে নেই—এই কথা সে ভাল করেই জানে।

কাজল এরপর সাহস করে এ ছবি নিয়ে কোন কথাই আর বলেনি। দিবাকরের প্রশ্নের উত্তরে—"মোটামুটি খুব খারাপ নয়—।" একথাই শুধু বলেছিল।

শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় প্রফুল্ল এলো দিবাকরের অফিসে। অপর্ণার বিয়ের জন্য নতুন আলাপ নিয়ে এসেছে সে। দিল্লি চাবাগানে তার এক খুড়তুতো ভাই ছোট কেরানার পদে কাজ করে। সেই বাগানের বড়বাবুর কাকা এসেছেন তার একমাত্র ছেলের জন্যে পাত্রীর সন্ধানে। কয়েকটি মেয়ে দেখেছেন কিন্তু পছন্দ হয়নি। আরও কয়েকটি আলাপ হাতে আছে। কিন্তু বিপদ হলো ভদ্রলোক রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হাঁপানিতে। ছুটোছুটি করা তার পক্ষে আপাতত সম্ভব নয়। পাত্র পাইপ লাইনে ফোরম্যান,

থাকে গৌহাটিতে। ভদ্রলোক অনুরোধ করেছেন সম্ভব হ'লে মেয়ে নিয়ে বাগানে এলে তার পক্ষে দেখা সম্ভব হয়। মেয়ে পছন্দ হলে সেখানেই পাকা কথা দিবেন। দাবী দাওয়া বিশেষ কিছু নেই। প্রফুল্ল প্রস্তাব দিয়েছে সামনের শনিবারের পরের শনিবার দিল্লি বাগানে তার ভাইয়ের বাড়ীতে মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করবে, কারণ এর পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ভদ্রলোক গৌহাটি চলে যাবেন।

প্রফুল্লকে নিয়ে দিবাকর শান্তিপাড়ায় গেল অপর্ণার মা ও বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে। ঠিক হ'লো বাবার সঙ্গে অপর্ণাকে নিয়ে দিবাকর শনিবার পাঁচটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়বে। প্রফুল্লও নিজের গাড়ী নিয়ে যাবে। নাহার কাটিয়া ডাকবাংলোয় অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে এক সঙ্গে দিল্লি বাগানে যাবে।

কথাবার্তার শেষে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল অপর্ণা বাড়ী নেই। মা অবাক হয়ে বল্লেন, "এই তো একটু আগেও বাড়ী ছিল সে। নিশ্চয়ই প্রফুল্লের ঠাট্টার ভয়ে পালিয়ে পাড়ায় কারুর বাড়ীতে লুকিয়ে বসে আছে।" প্রফুল্ল সায় দেয়—কিন্তু দিবাকর বিরক্ত হয়।

এরপর দিবাকর ও প্রফুল্ল বেরিয়ে আসে। প্রফুল্লের হাতে সময় নেই তাকে এখনই তিনসুকিয়া ফিরতে হবে। দিবাকরকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল চলে যায়। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। কিছু কাজ ছিল তাই তাড়াতাড়ি সেরে নেয় দিবাকর। দরকারী দু তিন খানা চিঠি ড্রাফ্‌ট করে রেখে এক সময় বাড়ীর পথ ধরে দিবাকর। বড় রাস্তা ছেড়ে বাড়ীর সামনের রাস্তায় মোড় নেয় সে। শীতের প্রারম্ভে কুয়াশার আভাস। রাস্তার আলোগুলি কুয়াশার জন্য ম্যাড়ম্যাড়ে লাল দেখাচ্ছে। সামনেই সেই বড় কালভার্ট ছাড়িয়ে একটু গেলেই বাড়ীর গেট। বাইক নিয়ে কালভার্টের ওপর সে। আর তখনই তার চোখে পড়ে আঁচল উড়িয়ে এক ছায়া মূর্তি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে মাঠে নেবে পড়ে পায়ে চলা পথ ধরে ছুটে চলেছে। একটু অবাক হয়ে বাইক থামিয়ে ছুটন্ত নারীমূর্তির দিকে চেয়ে থাকে দিবাকর। কুয়াশা ঢাকা আবছা আলোতে পেছন থেকে মেয়েটির পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। চেনা যায় না, তবু যেন একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায় দিবাকর। অপর্ণা? এ সময়? এখানে? আর এলই যদি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? তবে কি অপমানিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে? সেদিন দুপুরের কথা মনে পড়ে তার। হয়ত কাজল সম্পর্কে রমাকে অবহিত করতে এসে—রমার গালমন্দ হজম

করতে না পেরে রাগে দুঃখে চলে গেল সে। কিন্তু এ বাড়ীতে তো অপর্ণা আসেনা। যখন ছোট ছিল দু-একদিন এসেছে, তারপর আর তো আসেনি। চিন্তিত দিবাকর বাইক ঠেলে বাড়ীর সামনে এসে দেখে হাট করে গেট খোলা—যা কোনদিনও এ বাড়ীর রীতি নয়। নিশ্চয়ই অপর্ণা এসেছিল এবং ক্রুদ্ধ বাক্-বিতাণ্ডার পর অপমানিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিবাকর বাইক ঠেলে ভেতরে ঢোকে। গেট বন্ধ করে সে। না জানি কি রূপে রমাকে দেখবে সে।

কিন্তু না। তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। ভেতরে কথা, গান ও হাসির শব্দ ভেসে আসছে। তাহলে কাজল ও রমা গানের মহড়া দিচ্ছে। দরজার কড়া নাড়তেই রমার গলা শোনা গেল—"কে ?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে দরজা খুলেই দিবাকরকে দেখে অবাক হয়ে রমা বলে "এ কি ! তুমি ? বাইক কোথায় ?"

"শব্দ পাওনি না ? না, বাইক ঠিকই আছে। হঠাৎ ষ্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল।"

"তাই ? কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেছিলে— ?"

"বলেছিলাম, কিন্তু হল না। পাঁচটায় প্রফুল্ল এলো। ওকে নিয়ে একটু বের হতে হলো—।"

"প্রফুল্লদা কোথায় ?"

ও চলে গেছে। খুব ব্যস্ত। বলেছে সবাইকে নিয়ে একদিন আসবে।

বাইক ঠেলে বারান্দায় তুলে ঘরে ঢুকে বলে, "কেউ এসেছিল আজ ?"

"হঁ্যা একজন এসেছিল—"

"কে ?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে—বলে দিবাকর।

"তোমার বোস সাহেব, খোয়াং বাগানের ম্যানেজার। বসতে বল্লাম কিন্তু খুব তাড়া ছিল বলে বসলেন না। বলে গেলেন পারলে সোমবার কি মঙ্গলবার বাগানে যেতে। অসুবিধা হলে ফোন করতে।" রমার কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে ওঠে। ফোন তোলে দিবাকর। ডিসাং মুখ-ঘাট থেকে ললিত কলিতা কথা বল্ছে। জেমস্ ওয়ারেনের চার্টার্ড বার্জ্জ সকালে এসে গেছে। খালাসের জন্যে দুপুরেই প্লেস্ করেছে ষ্টিমার কোম্পানী। কোন আপত্তি শুনতে চায় না তারা। কলিতা লোক লস্কর কিছু যোগাড় করেছে, খালাসের কাজও শুরু হয়ে গেছে। হাতে যে কটা ত্রিপল ছিল তা দিয়ে চালা তুলেছে সে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। ফলে কিছু মাল খোলা আকাশের নীচেই রাখতে হচ্ছে।

ঘাটে যে চারখানা লরি ছিল বোঝাই করে ঘণ্টা খানেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। শিবসাগরে আরও লরির জন্য লোক পাঠিয়েছে। আগামী কাল কম করেও গোটা কুড়ি পঁচিশ লরি এবং দশখানা বড় ত্রিপল সকালের দিকেই দরকার। গলা শুকিয়ে যায় দিবাকরের। রমাকে ইঙ্গিতে জল আনিয়ে এক ঢোক খেয়েই ধমক দিয়ে প্রশ্ন করে, সারা দিনের মধ্যে ফোন করতে পারলে না কেন? উত্তরে ললিত কলিতা জানালো—সকাল থেকে সে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে বারবার. কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকা স্বত্বেও। লাইন খারাপ বলে কানেকসন পায়নি। বিকেল পাঁচটার পর যখন পেলো—কেউ ফোন না তোলায় সে বাড়ীর ফোনে দিবাকরকে ধরার চেষ্টা করেছে। ইতিমধ্যে দুবার সে লাইন পেয়েছিল। প্রথমবার কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বার তার ভাষায়, "এ জন মোটা মানুহে ফোন ধরিল, তেঁখেট কালে বাবু নাই। মূই কলু তেওঁ আপুনি নোট করক, চৌধুরী চাহার অহা মাত্র তেঁঘেটক নোটখন দিব। কিন্তু আচরিত হলুঁ চৌধুরীবাবু নাই বুলি তেঁখেট ফোন নামাই বলে। (একজন পুরুষ মানুষ ফোন ধরেছিলেন। তিনি বল্লেন যে বাবু নাই। আমি বল্লুম আপনি নোট দিন, চৌধুরী সাহেব বাড়ী আসামাত্র নোট খানা তাকে দেখাবেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম চৌধুরীবাবু নাই-এ কথা বলে তিনি ফোন রেখে দিলেন।) প্রচণ্ড রাগে জ্বলে ওঠে দিবাকর। কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে এবং কাল লরি ও ত্রিপল নিয়ে নিজেই যাবে বলে জানিয়ে কলিতাকে অশ্বস্ত করে। ফোন নাবিয়ে রেখে রমাকে প্রশ্ন করে—"জরুরী কাজের জন্যেই ফোন। ফোন ধরেছিল কে? তুমি কি বাড়ী ছিলে না।" ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে যেন রমা। সে কিছু বলার আগেই কাজল বলে—"ফোন ধরেছিলাম আমি। ভদ্রলোকের কথা এক বিন্দুও বুঝতে পারিনি—।" "বুঝতে পারিনি! বল্লেই হলো। আসামে এসেছ—এদেশের ভাষা এখনও শেখো নি। কি ভাবে কাজকর্ম্ম করবে! বুঝতে পারনি বুঝলাম। কেন রমাকে ফোন দিলে না?" "ভাবলাম আমিই বুঝতে পারছিনা বৌদি কি পারবেন?" "রাবিশ! প্রথমবার ফোন ধরোনি কেন তোমরা?" "গান গাইছিলাম—রিং শুনতে পাইনি—"অবাক হয়ে কাজলের দিকে তাকায় রমা।

গট্‌গট্‌ করে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেছে দিবাকর। ছুটে এসে রমা বলে, "এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?"

"জাহান্নামে"—আর দাঁড়ায় না দিবাকর। বাইক খানা নামিয়ে বেরিয়ে যায় তীব্র গতিতে।

স্থাণুর মত শূন্য দৃষ্টি মেলে পথের দিকে চেয়ে থাকে রমা। সারাদিনের পর কর্ম্মক্লান্ত মানুষটা বাড়ী এলো—তুদণ্ড বসে এক কাপ চাও খেয়ে যেতে পারলো না। নির্ব্বাক কাজল দাঁড়িয়েছিল পাশে। ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে রমা বলে—"ছিঃ কাজল, কি করলে তুমি? ঠাট্টা ইয়ার্কির একটা সীমা থাকা দরকার—" বলে আর দাঁড়ায় না। ভেতরে চলে যায়। হতবাক কাজল তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে যায়।

হন্তদন্ত হয়ে বাড়ী ফেরে অপর্ণা। "কোথায় ছিলি তুই? দিবাকর, প্রফুল্ল এলো আর তুই না বলেই বেরিয়ে গেলি?" মা অনুযোগ করেন।

"ওঁরা কেন এসেছিল জানি—আর তাইতো আমি পালিয়ে গেলাম। প্রফুল্লদার ঠাট্টা ভাল লাগে না আমার। তোমাদের হয়েছে নতুন ঢং। দেখাতেই যদি হয় এখানে দেখাতে পার না? তা নয় কোথায় কোন তিন-সুকিয়া, নয়তো চা বাগানে যাও নিজেকে দেখাতে। এই রকমভাবে নিজেকে দেখাতে আমায় ঘেন্না করে।"

"তা বল্লে তো চলবে না। দিবাকর আর প্রফুল্ল ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল? ওরা ভাল ভেবে যা করবে, তাই আমাদের মেনে নিতে হবে। জানিস কাল শনিবার-এর পরের শনিবারেই কোন বাগানে যেন যেতে হবে।"

"রাখো—অত না বল্লেও চলবে। যেতে হয় যাবো—এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারবো না।" বিছানায় শুয়ে পড়ে আপাদমস্তক লেপমুড়ি দেয় সে। বড্ড ভয় করছে তার। কে জানে দাদাভাই চিনতে পেরেছে কি না! আজ রির্হাসেল হবার দিন নয় তা সে জানে। কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে কাজল ও রমা কি করে দেখার অদম্য কৌতূহল সে দমন করতে পারেনি। কাজল কি কোন সুযোগই নেবে না? রমার প্রতি কাজলের দুর্বলতার খবর সে জানে। এই নৃত্যনাট্য ও রির্হাসালের দৌলতে রমার খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগ পাচ্ছে কাজল। কাজল কি এ সুযোগ ছেড়ে দেবে? আজ দিবাকর সময় মত পৌছতে পারছে না—এখন ক্ষেত্র প্রস্তুতের এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না কাজল। দূরন্ত কৌতূহলে বাস্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করার এই সুযোগ ছাড়তে না পেরে এই দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

গিয়ে কি দেখলো সে। বাগানের লতানে গোলাপ ঝাড়ের কাঁটা তুচ্ছ করে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সে কাণ্ড কারখানা দেখেছে। কাজল বেশ সক্রিয় ছিল। আপাত নির্দোষ হলেও কাজলের আক্রমণের

ধার সে লক্ষ্য করেছে। কাজলকে যে চেনে না সে ধরতে পারবে না ঠিকই। কিন্তু অপর্ণার চোখে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছেন রমা বৌদি। মুখোমুখি আধশোয়া কাজল। কাজলের পেছনটাই শুধু দেখা যাচ্ছে। গান গাইতে গাইতে এরই মধ্যে কয়েকবার গান বন্ধ করে শব্দ করে হেসে উঠেছেন রমা বৌদি। সময় মত কাজল গান বা গ্রন্থনা পাঠ ধরছে না। এ কি ধরনের রিহার্সেল। রাগের ভান করেই যেন রমা বৌদি বলে ওঠেন, "একি, চুপ আছ যে বড় ? ধরো।"

"ধরতেই চাই। কিন্তু তোমার মিষ্টি মুখের দিকে তাকালেই সব ভুল হয়ে যায় যে—।"

"ওঠো ওঠো পেছন ফিরে বসো—।"

"দোহাই মিষ্টি বৌ অতটা নির্মম হয়ো না, [মিষ্টিবৌ ? বৌদি নয় ? দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে অপর্ণার] জানো মিষ্টি, এক বিখ্যাত কবি বলেছেন, 'আ থিং অব বিউটি ইজ জয় ফর এভার।' তোমার ঐ মিষ্টি মুখের দিকে না চেয়ে যে থাকতে পারিনা।" [কি নির্লজ্জ ছেলেটা, আর বৌদি ? বলিহারি তাকে। শুনে কোথায় রেগে টং হয় উঠবেন, তা নয় মিটিমিটি হাসছেন। ছিঃ]

"আর কোন মিষ্টি যেন দেখোনি তুমি ?" বৌদি বলেন। "অন্য কাউকে টেনে এনো না মিষ্টি। তোমার তুলনা তুমিই কেবল"—নির্ভীক উত্তর কাজলের। [খুব আস্কারা পাচ্ছে সে বৌদির কাছে। ব্যাপার খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না]

"বাজে কথা বলো না। ফ্ল্যাটারী একদম সহ্য করতে পারি না। কেন ? সেই মেয়েটি ? সেই রঞ্জনা না কি যেন বলেছিলে তার নাম ? [এই রে সব বলেছে নাকি ব্যাটা ?]

"দিলে তো মেজাজ খারাপ করে ? কার সঙ্গে কার তুলনা করছো গো ? ছিঃ ছিঃ হীরের সঙ্গে কয়লার তুলনা ?"

"বাজে কথা বলো না কাজল। সেদিন ঐ মেয়েটি যতক্ষণ ছিল তোমায় লক্ষ করেছি। অতই যদি ফ্যালনা তবে ঘুরে ফিরে তোমার চোখ ওর ওপরিই বা কেন পড়ছিল বার বার ? কালো মেয়ে কি সুন্দরী হয় না ? মেয়েটির রং না হয় একটু ময়লা কিন্তু অমন সুন্দর নাক, চোখ, মুখ আর ফিগার—"কথাটা শেষ করতে পারেন না রমা বৌদি। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বৌদির হাতখানা দুহাতে জাপটে ধরে কাজল বলে। 'ও ডারলিং—

ও মাই ডারলিং—ভুল করো না—ভুল বুঝো না আমায়। মেয়েটির প্রেমে পড়ায় পাত্র আমি নই। আসল কথা হলো মেয়েটিকে একদিন দেখেছিলাম রিক্সায় করে যেতে, গভীর রাতে অত্যন্ত বিচ্ছিরি অবস্থায়—"[কবে দেখলে ? কার সঙ্গে ? কি বলছে লোকটা ?,]

"সে কথা তো সেদিনই বলেছ ? কিন্তু রিক্সায় সঙ্গের লোকটি কে শুনি। তোমার দাদাকে বলা দরকার—"

ওরে সর্ব্বনাশ। মাপ করো মিষ্টি বৌ। এ নোংরা ব্যাপার নিয়ে আজকের এই মধুর আবেগ কলঙ্কিত করো না লক্ষ্মীটি" [ভাল নাটক করতে পারে বটে শয়তানটা। কিন্তু বৌদি ? হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার কোন চেষ্টাই তার নেই ? তবে কি বৌদিও ? ছিঃ ছিঃ। এই আমাদের বৌদি যার সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই সহ্য করতে পারে না দাদাভাই ?]

"হয়েছে, বাবা হয়েছে। এবার হাতখানা ছাড়ো। বড্ড লাগছে—" রমা বলে।

"একটু লাগুক। এই মিষ্টি নরম হাত ছাড়তে মন চায় কখনও।" হাতখানা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে কাজল।

"এ্যাই কি হচ্ছে ? আমি না গুরুজন ? তোমার বৌদি ? খুব সাবধান" —চোখ পাকিয়ে বলে বটে রমা কিন্তু ওর ঠোঁটের কোণে প্রশ্রয়ের হাসি দৃষ্টি এড়ায় না কাজলের এবং অপর্ণারও।

"তাতে কি হলো ? আমিও তো তোমার দেওর"—কাজল বলে।

"নিশ্চয়ই আর তাই আমায় মান্য করা উচিত তোমার—।"

"অমান্য তো করিনি ? কিন্তু দেওর কথাটার অর্থ জানো ?"

"না জানার কি আছে। সবাই জানে দেওর হলো স্বামীর ছোট ভাই—"

"ছোট ভাই তো নিশ্চয়ই। বড় ভাই হলে তো ভাসুর হতো। ভাদ্রবধূর মুখদর্শন নিষেধ। ছোটভাই অর্থাৎ দেওরের বেলা তা নয়। কারণ দেওর কথাটা এসেছে দ্বি-বর থেকে। অর্থ হলো দ্বিতীয় বর তবে স্বামীর অবর্তমানে—থুড়ি অনুপস্থিতিতে—"

"বাড়াবাড়িটা একটু বেশী রকম হয়ে যাচ্ছে কাজল—" রমার গলায় রুক্ষতার আভাস কিন্তু শেষটুকু শোনার সুযোগ পায় না অপর্ণা। মটর বাইকের অস্পষ্ট শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে অপর্ণা। গোলাপ ঝাড়ের কাঁটার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ছুটে এসে কোন রকমে গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। গেট বন্ধ করার অবসরটুকু পেলো না। কালভাটের একেবারে

কাছাকাছি এসে গেছে বাইকখানা। ঘন কুয়াসা ছিল তাই রক্ষে। দাদাভাই চিনতে পারেনি নিশ্চয়। পড়ি কি মরি করে, প্রায় দৌড়, মাঠ ভেঙ্গে বেঙ্গলী স্কুলের সামনে এসে রিক্সায় বসে হাঁপ ছাড়ে অপর্ণা।

"কিন্তু ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৌদিই কি খুব সহজ মনে কথাগুলি বলেছেন? হাবভাব কথাবার্তা শুনেও কি কাজলের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি বৌদি। নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করেছেন শুধু রগড় করতে? মনে তো হয় না। রিক্সার ব্যাপারটা বোঝা গেল না। কোথায় কখন দেখ্‌লো আমায়? আমার কথা থাক্। বৌদিকে কোথায় টেনে নাবাতে চায় শয়তানটা? বৌদি কি নরম হোননি, তা না হলে এমন নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করলেন কি করে? এ ভাবে আরও দু-চার দিন নিভৃতে মিশবার সুযোগ পেলে বৌদিকে ঘায়েল করবেই লোকটা। বৌদির রকম-সকমও তো ভাল নয়। বাঁধা দিতেই হবে। জেনে শুনে দাদা ভাইয়ের এ সর্ব্বনাশ ঘটতে দেওয়া যায় না। কিন্তু কি ভাবে তা সম্ভব হবে?" পথের হদিস্ না পেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে অপর্ণা বিছানায় শুয়ে।

"সত্যি কাজলটা ভীষণ পাজী। অসভ্যটা শুয়ে শুয়ে চোখ মারছিল, হাত বাড়িয়ে পায়ে চিমটি কাট্‌ছিলো। ওকে যেন ভুতে পেয়েছিল আজ। বৌদির সঙ্গে রঙ্গরসিকতা দেওররা করেই থাকে—কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কাজল আসলে খুব সরল শুধু যদি মাত্রাজ্ঞানটা প্রখর হতো! বারবার বল্‌ছি হাতটা ছাড়তে কিন্তু কিছুতেই হাত ছাড়বে না সে। এমন তুলতুলে নরম হাত নাকি ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। শুধু তাই নয় আমার হাতখানা ওর নিজের ঠোঁটে চেপে ধরলো। বল্লুম "সাবধান, তোমার গুরুজন, বৌদি আমি।" ও তো হেসেই অস্থির, বলে, "তুমি বৌদি হলে, আমি তো তোমার দেওর। দেওর মানে নাকি দ্বি-বর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর অবশ্য স্বামীর অবর্তমানে! কী অলক্ষুণে কথা! একটু কড়া হতেই হলো। বল্লুম. "ফাজলামোটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না?" সে নির্ব্বিকার। বলে, মোটেও না। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, 'এভরি থিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এণ্ড ওয়ার' যার মানে হলো প্রেমে ও রণে কিছুই অন্যায় নয়।" ওর কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। ঘাবড়াবার কথাই। বাড়াবাড়ি একটু বেশীই হয়েছিল যা সেই রিক্সার ঘটনার পর কখনই ঘটেনি। আমারও ভুল হয়েছিল। কি ঘটতে যাচ্ছিল কে জানে? কিন্তু ভগবান সহায় তাই ঠিক সময়েই দিবাকর এসে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বসার ঘরে পর্দ্দা সরিয়ে জানালার ধারে বসে সেদিন সন্ধ্যার কথা ভাবছিলো রমা। রহস্যময়

হাসি তার চোখে মুখে। একটু রাশ আলগা করেছিল সে শুধু অপর্ণা সম্পর্কে কাজলের মনোভাব সঠিকভাবে আঁচ করতে। সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তার যে ধারণা ছিল, সেভাবে কাজল অপর্ণাকে নিয়ে ভাবছে না। সেদিন ওরা দুজনে এমন ভাবে মুখ চাওয়াচায়ি করছিলো সত্যি তা খুবই দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। দিবাকর নাকি হন্যে হয়ে মেয়েটির জন্য পাত্রের সন্ধান করছে। ওর চোখে পড়লে হয়েছিল আর কি? উঠে পড়ে লাগতো কাজলের পেছনে। আর যাকেই বিয়ে করুক কাজল এ মেয়েটিকে বিয়ে করলে সহ্য হতো না রমার। শুধু চেহারা হলেই তো হবে না। শিক্ষাদীক্ষা কই, সাধারণ রুচিবোধের কোন লক্ষণই তো চোখে পড়ে না। এ মেয়েকে বিয়ে করে কখনও সুখী হবে না কাজল।

"সর্ব্বনাশ। সাড়ে দশটা বেজে গেল কিন্তু এখনও আস্‌ছে না কেন?" চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে রমার মুখে। আহা বেচারী শ্রান্তক্লান্ত হয়ে এলো, কিন্তু এমনই কপাল, সুস্থির হয়ে বসে এক কাপ চা খেয়েও যেতে পারলো না। সত্যিই খুব অন্যায় কাজ করেছে কাজল। প্রথমবার যখন রিং হলো, উঠ্‌তেই দিল না কাজল। পা চেপে ধরে বসে রইলো; এক মিনিট চোখের আড়াল করলে যেন বুক ফেটে যাবে তার। কী অদ্ভুত কথা। বেজে বেজে একসময় থেমে গেল রিং। পরেরবার নিজে উঠে গিয়ে ধরলো; ধরে শুধু বলে "বাবু নাই—বাবু নাই।" ওর হাত থেকে ফোন কেড়ে নিল রমা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ও আঙ্গুল দিয়ে নব চেপে ধরলো—লাইন কেটে গেল। সত্যি ভীষণ অন্যায় করেছে সে। দিবাকর বেশ ভাল মুখ ঝাম্‌টা দিয়েছে। জানালার ধারে দিবাকরের প্রতীক্ষায় বসে চিন্তার সমুদ্রে দোল খাচ্ছে রমা।

নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে সেদিনের ঘটনা নিয়ে ভাবছিলো কাজলও। রমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। অবশ্য এর মুল ঐ কালো মেয়ে অপর্ণা, তা স্পষ্ট বোঝা গেল। মেয়েটিকে কি হিংসে করে রমা? সে চায় না কাজল মেয়েটিকে প্রাধান্য দিক। "কিন্তু হায় নারী যেদিন জানতে পারবে মেয়েটির সঙ্গে তোমার স্বামীর সম্পর্ক? হা, হা, হা, মুঠোয় এসে যাবে গো-মুঠোয় এসে যাবে তুমি।" কিন্তু কাজল এত বোকা নয় যে নিজে প্রকাশ করবে সে কথা। অন্য সূত্রে অপর্ণা-দিবাকর স্ক্যানডেল যাতে রমার কানে আসে সে ব্যবস্থাই সে করবে। হুঁ সেই কমলা বৌদিকেই কাজে লাগাতে হবে। মহিলা সমিতির এই মহিলাটি এমনিতে ভালই তবে নোংরা ঘাটতে আরাম পান। ওঁকে দিয়েই রমার কান ভারী করতে হবে। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না।

দিবাকর ফিরলো সেই রাত এগারটায়। ঘোরাঘুরি করে প্রয়োজনীয় লরির বন্দোবস্ত করে বিরাট সাইজের কয়েকখানা ত্রিপল যোগাড় করে ভোরের প্রথম লরিতে সেগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করে যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন সে রীতিমত বিধ্বস্ত। বারন্দায় আলো জ্বেলে গরম চাদর জড়িয়ে প্রতীক্ষায় ছিল রমা উৎকণ্ঠিত মনে। এর আগে অফিসে দু তিনবার ধরতে না পেরে—চেনাজানা দু' একটা ফার্মে ফোন করেছে। তাঁরা দিবাকরের হদিস দিতে পারেনি বটে—তবে খোঁজ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাবে বলে অশ্বাস দিয়েছে।

দিবাকর ফিরতেই হাত লাগিয়ে বাইক ঠেলে তুলতে সাহায্য করেছে রমা। নিজের হাতে সাটের বোতাম খুলে জামা কাপড় পাল্টাতে সাহায্য করেছে। হাত মুখ ধোবার জন্যে গরমজল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখে ইমারসন হিটারের সুইচ অন্ করে দিয়েছে। হাত মুখ ধোয়ার পর চুল আঁচড়ে দিয়েছে, গরম শাল গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। রমার এই নিঃশব্দ সেবাপরায়ন মুর্ত্তি দেখে গলে যায় দিবাকর। অবশ্য এ নতুন নয় আগেও এমন করেছে রমা অনেক বারই। তবু বড় ভাল লাগছে আজ দিবাকরের। এমন মেয়ের উপর কতক্ষণ রাগ করে থাকা যায়? আবেগে উদ্বেল দিবাকর রমাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে, চুমু খায়।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চান করে পেটপুরে চা জল খাবার খেয়ে বাইক নিয়ে বেড়িয়ে যায় দিশাংমুখ ঘাটের পথে। বলে গেল রাত নটার মধ্যে না ফিরলে রমা যেন ধরে নেয়—সেদিন রাত্রে সে ফিরছে না। হঠাৎ মাঝে মাঝে কাজের চাপে এমন পরিস্থিতি কয়েক বারই হয়েছে। তবু এবার এই ব্যাপারের সঙ্গে নিজের গাফিলতি জড়িত বলে রমার মনে দুঃখ বেদনার অন্ত ছিল না। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করে কাজলকে আর কখনই আস্করা দেবে না। খুব সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাইক চালিয়ে যেতে মাথার দিব্যি দেয় রমা দিবাকরকে।

একটু বেলা হতে নিখিল এলো। সে আজ পুরোপুরি ছুটি উপভোগ করবে। রমা শুনে বলে—"করাচ্ছি ছুটি উপভোগ! শোন, তোর উপর আজ অনেক কাজের ভার দিচ্ছি। ভোরবেলা তোর জামাইবাবু জরুরী কাজে দিশাংমুখ ঘাটে গেছেন। আদৌ ফিরবেন কিনা বা কখন ফিরবেন বলা সম্ভব নয়। আজ রিহার্সেলে তোকে থাকতেই হবে। চা জলখাবার এবং নানা ফুটফরমায়েসের দায়িত্ব কিন্তু আজ তোর ঘাড়ে—." দিদির কাজ পেয়ে নিখিল মহাখুসি। সে সানন্দে রাজী হলো। সে তো জানে না,

যে কাজলের বাড়াবাড়ি রুখবার জন্যে দিদির হাতের সে এক বাড়তি হাতিয়ার মাত্র।

একটু পর কাজলও এলো। বস্‌বার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু নিখিলকে গেড়ে বস্‌তে দেখে অস্বস্তি বোধ করে সে। ক'টায় রিহার্সেল শুরু হবে জেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। বলে গেল খুব ব্যস্ত সে একটা কেস নিয়ে। কিন্তু তার রিক্সা এসে থামলো তারকের দরজায়। আজ কমলা বৌদিকে পেতেই হবে। অদূরে ব্যারাক বাড়ীর জানলায় দাঁড়িয়ে কাজলকে ঘন ঘন ঐ বাড়ী আসতে দেখে বিস্ময় বোধ করে অপর্ণা।

এগারটার একটু পরই ক্লাবের সেক্রেটারী বিভূতিবাবু, ডিগবয় ইণ্ডিয়া ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত। নভেম্বরের প্রথম শনিবার অনুষ্ঠান হবে—সে কথাই স্থির ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গোহাটিতে রিফাইনারী স্থাপন সম্পর্কে আসামবাসীদের দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তখনই শিলংয়ে এ নিয়ে কনফারেন্সের দিন স্থির করা হয়েছে। ওয়েল কোম্পানীর অনেক অফিসারকেই এই কনফারেন্সে ডাকা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠানের দিন হয় পিছিয়ে দিতে হবে নয়ত এগিয়ে আনতে হবে। পিছিয়ে দিলে অনেক পেছাতে হবে। হয়ত এর ফলে অনুষ্ঠান করা আদৌ সম্ভব হবেনা। এই অবস্থায় ডিগবয়ের সর্বসাধারণ অনুষ্ঠান এগিয়ে আনারই পক্ষপাতী। সকলের অনুরোধে ক্লাব অবশেষে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডি. কে. দাস এবং সেক্রেটারীকে পাঠিয়েছেন মিঃ ও মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অনুষ্ঠান এগিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে।

এমন এক সময় ওঁরা এলেন যখন দিবাকর উপস্থিত নেই। মহা সমস্যা রমার। কিছু ভেবে না পেয়ে সে বলে—"কিন্তু উনি যে বাড়ী নেই। আজ ভোরেই ডিসাংমুখ ঘাটে চলে গেছেন। সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন। উনি এলে না হয় ফোনে—।"

"তা হলে তো মুশকিল। আমাদের ভার দেওয়া হয়েছে আপনাদের মতামত জেনে এখান থেকেই ফোনে খবর পাঠিয়ে দিতে। উদ্দেশ্য হলো সঙ্গে সঙ্গেই ইমার্জেন্ট মিটিং ডেকে প্রস্তাব নেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না! তাছাড়া কাল কখন মিঃ চৌধুরী ফিরবেন তাও জানা নেই। তা হলে বিভূতিবাবু, আপনিই বলুন এই পরিস্থিতিতে আমরা কি প্রোগ্রাম একেবারেই বাতিল করবো?" ডিগবয় ক্লাবের সেক্রেটারী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন।

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বিভূতিবাবু রমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "সেদিন তুমি মিঃ দাসকে বলেছিলে যে ডিগবয়ে তোমরা বেঙ্গলী ক্লাবের ব্যানারে অভিনয় করবে, ব্যক্তিগত নামে নয়। সুতরাং ডিগবয়ে এই অনুষ্ঠানের দায়ীত্ব ক্লাব সেক্রেটারী হিসাবে আমারই। ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি জানতে চাই আগামী শনিবার অনুষ্ঠানের জন্য তোমরা প্রস্তুত নও?" ফাঁপরে পড়েছে রমা, বলে, "না সে রকম অসুবিধা নেই, কিন্তু উনি নেই—" বিভূতিবাবু বলেন, "এতে অসুবিধার কি হলো? তোমরা যখন তৈরী তখন দিবাকরই বা আপত্তি করবে কেন? কোন কারণ যখন নেই তখন ভাবনার কি আছে? দিবাকরের সঙ্গে কথাবার্তা যা বলবার আমি বল্‌বো। তাহলে ক্লাবের তরফ থেকে আমি এঁদের জানিয়ে দিচ্ছি আগামী শনিবার আঠাশে অক্টোবর আমাদের ক্লাব অনুষ্ঠান করতে প্রস্তুত, কেমন?" বাধ্য হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিতে হয় রমাকে।

মিঃ ডি. কে. দাস জানালেন যে শনিবার সকাল আটটায় ওঁদের বাস পৌঁছে যাবে। ওখানে চান, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজন হলে বিকেলের দিকে মহলা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে স্টেজে। অনুষ্ঠানের পর খাওয়া দাওয়ার সেরে রাত এগারটার মধ্যে রওনা করে দেওয়া হবে। আরও জানালেন যে দিবাকর সহ মেয়েদের তাঁর বাড়ীতে এবং ছেলেদের কোম্পানীর গেষ্ট হাউসে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পরিশেষে দিবাকরেব সঙ্গে দেখা হলো না বলে মিঃ দাস দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন, যে এরপর সময় হাতে নিয়ে একদিন এসে লম্বা আড্ডা দিয়ে যাবেন। চা জলখাবার খেয়ে ওঁরা বিদায় নিলেন।

রিহার্সেল সাঙ্গ হলো। মেয়েদের ও যন্ত্রশিল্পীদের নিয়ে পৌঁছে দিতে বেরিয়ে গেল সাধু গাড়ী নিয়ে। নিখিল ও কাজলকে এলোমেলো ভাবে ডিগবয়ের ব্যাপার জানালো রমা। মনটা তার ছটফট করছে। দিবাকরের সম্মতি ছাড়া প্রস্তাবে রাজী হয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। রাত তখন ন'টা। কাজলের এখনই চলে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল না। রমাকে একটু একা নিরিবিলিতে পেতে চায় সে। কিন্তু বাদ সাধে নিখিল, বলে, "এখন চলো তো কাজলদা। দিদিকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। অনেক রাত হলো। দিপুকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। রিহার্সেল তো সারা—। এখন বসে বসে গেঁজানোর কি দরকার?" নিখিলের অনবরত তাড়ায় বাধ্য হয়ে অবশেষে উঠতে হলো কাজলকে।

দীপুকে ঘুম পাড়িয়ে, বাইরের ঘরে 'দেশ' পত্রিকাখানা নিয়ে বসে থাকে

রমা দিবাকরের প্রতীক্ষায়। টেবিলে ওদের ভাত ঢাকা। রাত ক্রমশ বেশী হ'চ্ছে। দিবাকর বলে গেছে বটে রাত ন'টার মধ্যে না ফিরলে রমা যেন ধরে নেয় সেদিন রাত সে ফিরছে না। রাস্তার কথা তো বলা যায় না! ঠিক সময় রওনা হয়েও যান্ত্রিক গোলযোগে পথে দেরীও তো হতে পারে! চাপা উৎকণ্ঠা রমার মনে সব সময়ই ছিল। সহসা রাত এগারটায় ফোন বেজে ওঠে। ভয়ে কেঁপে ওঠে রমার বুক। কিন্তু না, স্বস্তি পেলো দিবাকরের কণ্ঠস্বর শুনে। সে বল্লে, সন্ধ্যে থেকে ফোনে কথা বলবার চেষ্টা করছে সে কিন্তু লাইন পাচ্ছিলো না। জানিয়ে দিল যে রাত্রে সে বাড়ী ফিরছে না। সারারাত মাল খালাসের কাজ চলবে। কাল বেলা বারোটার মধ্যে মাল খালাস করতে না পারলে প্রচুর ডেমারেজ দিতে হবে। সুতরাং কাজ শেষ করে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ী ফিরবে। সব শুনে অবশেষে সেদিন সকালের কথা জানিয়ে রমা বলে যে আগামী শনিবার ডিগবয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। শুনে যেন আঁৎকে উঠে, চিৎকার করে দিবাকর বলে, "তা কি করে হবে?" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করে গলার স্বর নামিয়ে বলে, "মানে আমি বলতে চাই মাত্র এ ক'দিনের রিহার্সেলে কি করে তা সম্ভব হবে? পারবে তোমরা তোমাদের সুনাম বজায় রাখতে?" রমা অবশেষে সবিস্তারে কোন্ পরিস্থিতিতে এবং বিভূতিবাবুর মধ্যস্থতায় এ ব্যবস্থা মেনে নিতে হলো সব জানিয়ে বলে, "এ নিয়ে তুমি একটুও ভেবো না। তোমার আশীর্ব্বাদে সুনাম আমার ঠিকই বজায় থাকবে। শুধু কাজ শেষ করে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর তুমি চলে এসো। শীতের রাত নদীর পাড়ে বসে আছ, খুব সাবধান, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না যেন। তোমার বাইকের কেরিয়ার ফ্ল্যাপে ইটালিয়ান কম্বল ভরে দিয়ে ছিলাম, ওটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নাও। কিন্তু তুমি ঘুমুবে কেমন করে? বিছানা পত্তর তো সঙ্গে নিয়ে যাওনি!" দিবাকর বলে, "পাগল হয়েছ? ঘুমুব? ঘুমের সঙ্গে আজ আড়ি। সারারাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করতে হবে, তা না হলে বারোটার মধ্যে বার্জ্জ খালি হবে কি করে?" ফোন ছেড়ে দেয় দিবাকর। হঠাৎ মনে পড়ে কথাটা। হায়রে, খাওয়া দাওয়ার কথা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি? খাওয়া হলো না রমারও। থালায় জল ঢেলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে রমা।

বার্জ্জের মাল খালাস হচ্ছে। চারটে হ্যাজাক ভাড়া করে আনা হয়েছে তারই আলোতে কাজ হচ্ছে। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে কাজের তদারক করছে দিবাকর। মনটা বড় বিষণ্ন। ছুটো ব্যাপারই একই দিনে একই সঙ্গে ঘটতে বসেছে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা সে রাখে? সারারাত অস্বস্তিতে

কাটে দিবাকরের। পরদিন সকালেই তিনসুকিয়ায় প্রফুল্লকে ফোন করে। মেয়ে দেখার দিন এগিয়ে অথবা পেছিয়ে দেওয়া যায় কিনা জানতে। সব শুনে প্রফুল্ল বলে, ''তোর ফোনের নম্বরটা দে। আমি এখনই ফোনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোকে জানাচ্ছি।" কিছুটা আশার আলো যেন চোখে ভাসে দিবাকরের।

বেলা বারোটায় বাৰ্জ্জ খালাস প্রায় হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই প্রফুল্লর ফোন এলো। না শনিবার ছাড়া অন্য কোনদিন সম্ভব নয়। বুড়ো তার বোনের বাড়ী নাজিরায় গেছে। সেখানেও নাকি কয়েকটি আলাপ আছে। সেগুলি সেরে শনিবার সকালে দিল্লী বাগানে আসবেন। এদিকে তাঁর ছেলে অর্থাৎ পাত্রটিও শনিবার আসছে। রবিবার সকালে বাপকে নিয়ে গৌহাটি রওনা হবে। প্রফুল্ল বলে, "অত ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? রমাকে সব খুলে বল না, সব শুন্‌লে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। তোর বল্‌তে যদি কোন অসুবিধা থাকে আমিই না হয় ফোনে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি—"

"না, না, না, ওরে সর্ব্বনাশ! বলিস্ কিরে? ঐ কর্মটি ভুলেও করিস্‌নে। এই পরিবার, বিশেষ করে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কি যে এলার্জি রমার। এ কথা শুন্‌লে একেবারে পাগল হয়ে যাবে রমা। তার চেয়ে যদি অপর্ণাকে তার মা বা বাবার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই তো কেমন হয়? তুই তো রয়েছিস্‌ই। ওঁরা মেয়েটি দেখুন। পছন্দ হলে আমি না হয় লেনদেনের আলাপ পাকা করতে গৌহাটি যাব ছেলের বাড়ী?"

"তা হলে একেবারেই হবে না। ছেলেটি খুবই ভাল। বাপের কিছু বায়-নাক্কা আছে। ভাল বংশ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এবং উপযুক্ত যৌতুক ও দক্ষিণা। অপর্ণা বেশ সুন্দরী, স্বাস্থ্য ভাল, বংশও খুবই উঁচু—শুধু রংটি যা একটু কালো। যৌতুকও দাক্ষিণার মাহাত্ম্যে সে দোষ কেটে যাবারই সম্ভাবনা, মেয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে আঁচ না দিলে কি আর মেয়ে পছন্দ হবে সে বুড়োর? ধুরন্দর লোক, তুই না গেলে সব কিছুই মাঠে মারা যাবে। বলি কি তুই ডিগবয় না গেলে কি হয়? রমা তো পুরোপুরি তৈরী, ও একাই সামাল দিতে পারবে। তুই তো নেহাৎ ফালতু আদমি, আমাদের রাষ্ট্রপতির মত—কোন কাজ নেই শুধু দেখন সুন্দর। ভৈরব-কাজল এরাই তো যা করবার করবে। শোন, এক কাজ কর—একটা বড় কাজ পাবার ছুতো করে কেটে পড়। তেমন কোন গোলমাল হলে তো আমি আছিই।" প্রফুল্ল তো এক নাগাড়ে নিজের ভাষ্য দিয়ে গেল। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা' নয়। রমার ঘাড়ে সব বোঝা

চাপিয়ে সে নিজে নিরুদ্বেগ হবে কি করে? রমা যে সময় তারই ওপর নির্ভর করে থাকে।

তিনটেয় ডিব্রুগড় ফিরে নিজের অফিসে গিয়ে বসে দিবাকর। অফিসের চিঠিপত্র দেখে—কাজকর্ম সম্পর্কে আদেশ নির্দেশ দিয়ে বাড়ী ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। আর তখনই চিঠিপত্রের ট্রের নীচে মরান ক্লাবের লেটার হেডের একখানা সাদা সিট চোখে পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বুদ্ধি খেলে যায় মাথায়। ঐ লেটার হেডে—চিঠিখানা নিজেই টাইপ করে সে। কিছুদিন আগে মরান সার্কেলের ম্যানেজারদের সঙ্গে মরান ক্লাবে দেখা করার জন্য যে চিঠি এসেছিল, অবিকল তাই শুধু তারিখ ও সময় ছাড়া। চিঠির নীচে সইও যথা সম্ভব নকল করে সে। তারই অফিসের পিয়নের অল্প বয়সী ভাগ্‌নে ভোলাকে ডেকে বলে, "এ চিঠি নিয়ে আমার বাড়ী চলে যা। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলবি তুই মরান বাগানের পিওন। অফিসে আমায় না পেয়ে বাড়ীতে খবর করতে এসেছিস। বাবুয়ানি যখন বলবে যে বাবু ডিসাংমুখ ঘাটে। সন্ধ্যের সময় ফিরবে। তুই বলবি যে ততক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদি বাবুয়ানি চিঠিটা রেখে একটা কাগজে প্রাপ্তিসংবাদ লিখে দেন তা হলে তুই নিশ্চিন্তে চিঠিটা রেখে যেতে পারিস। বাবুয়ানির সই থাকলে ম্যানেজার গোঁসা করবেন না। চিঠিটা নিয়ে যা। রসিদ নিয়ে ফিরে এলে পাঁচ টাকা বখশিশ পাবি। খুব গোপনে। কাউকে বলিস্ না এ কথা। এই নে রিক্সা ভাড়া। যাবি আর আস্‌বি। কিন্তু সাবধান—বড় রাস্তার মোড়ে রিক্সা ছেড়ে পায়ে হেঁটে বাড়ী যাবি। ফেরার সময় মোড়ের মাথা থেকে রিক্সায় উঠবি। কিরে পারবি তো? পারলে তোর ভাল চাকরীও জুটিয়ে দেব।" ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চিঠি নিয়ে ছোক্‌রাটি চলে যায়।

মিনিট কুড়ি পরই ফিরে এলো ভোলা। হাতে দিবাকরের ব্যক্তিগত প্যাড রমার সই করা চিরকুট— "রিসিভ্‌ড লেটার অফ মরান ক্লাব—রমা চৌধুরী ফর দিবাকর চৌধুরী।" ভোলাকে কথামত পাঁচ টাকা বখশিশ দিয়ে, দুরু দুরু বুকে বাড়ীর পথে ছুটে চলে দিবাকর।

বাড়ী এসে পৌঁছালো যখন তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। ধুলি ধূসরিত শ্রান্ত ক্লান্ত দিবাকরকে দেখে উদ্বিগ্ন রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দিবাকরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। একটু পরেই রিহার্সেল শুরু হবে। মেয়েরা এসে বাহিরের ঘরে জটলা করছে। যন্ত্রশিল্পীরা এখনও এসে পৌঁছায়নি—তবে যে কোন সময় এসে পড়বে। জল গরম করে, চান করিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে—"চুপটি করে ঘুমবার চেষ্টা কর। রিহার্সেলে তোমার আজ থাকার দরকার নেই।" দীপুকে সাবধান করে বলে, "বাপীকে একদম জ্বালাতন করো না। কাল সারাদিন সারারাতব্যাপী ঘুমোতে পারেননি। শোবার ঘরে এসে গোলমাল করো না, কেমন?" মৃদু নীল আলো জ্বেলে বাহিরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সবাই এসে গেছেন, প্রস্তুত হয়ে বসে ছিলেন সবাই রমার প্রতীক্ষায়। রিহার্সেল সুরু হলো। কাজল নিদারুণ ক্ষুব্ধ। দিবাকরের প্রতি রমার এই আন্তরিকতা অসহনীয় মনে হয় তার কাছে। তাই নেহাৎ গা-ছাড়া ভাবে রিহার্সেল দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যায় সে।

সর্ব্বাঙ্গে ক্লান্তি নিয়েও ঘুম আসছিলো না দিবাকরের। বাধ্য হয়ে প্রয়োজনের তাগিদে রমার সঙ্গে প্রতারণা করতে হয়েছে এবং সরল মনেই তা রমা গ্রহণ করেছে। সব কাজ ফেলে তার সেবা যত্নে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে রমা। সেবা পরায়ণা এই নারীর স্নেহমাখা দরদী রূপ বিহ্বল করে তোলে তাকে। বিবেকের দংশন জ্বালায় জ্বলে ওঠে তার অন্তর। মনে হলো এই মিথ্যার জাল ছিন্ন করে সত্য কথাই বলবে সে। রমার সম্মতি পেলে ভাল। না পেলে দিল্লির প্রোগ্রাম বাতিল করবে সে। কিন্তু রমা সম্মতি দেবে না কিছুতেই। তখন দিল্লির প্রোগ্রাম বাতিল করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু তখন? অপর্ণার বাবা, মা ও প্রফুল্লের কাছে কি জবাব দিহি করবে সে? যখন জানবে রমার জন্যই সে মত বদলেছে তখন কি ভাববে তারা? রমাও ছোট হবে না কি ওদের চোখে? অথচ এই কারণে ডিগবয় না গেলে রমা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তার জীবনে রমার মূল্য সর্বাধিক। সুতরাং এই অবস্থায় একমাত্র মধ্যপন্থা এই জাল চিঠি। এ চিঠির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেই হবে। লাঠিও ভাঙবে না, সাপও মরবে। মনকে শান্ত করে এক সময় গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে দিবাকর।

রাত দশটায় গায়ে নরম হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙায় রমা। "এ কি? সকাল হয়ে গেছে?" ঘুমে ঢুল ঢুল চোখে জড়িত কণ্ঠে বলে দিবাকর। "না-গো-না, এখন রাত দশটা। এখন একবার খেয়ে নাও, তারপর কষে লম্বা ঘুম দিয়ে চাঙ্গা হয়ে সকালে উঠো।" "এই তো একটু আগেই খেলাম—।"

"বারে, সে তো সন্ধ্যের সময়? কি উঠতে ভাল লাগছে না? বেশ তুমি শুয়ে থাকো। খাবার নিয়ে আসি, আমি খাইয়ে দেবো, তুমি শুয়ে শুয়েই খেয়ো।" অভিভূতের মত রমার দিকে চেয়ে থাকে দিবাকর।

তারপর উঠে বসে দুহাত দিয়ে রমাকে সবলে আকর্ষণ করে তার বুকে মুখ গুজে বলে, "রুমি, আমার রুমি। তুমি কি সমুদ্র? তোমার তল খুঁজে পাই না তাই?"

খেতে বসে মরান ক্লাবের চিঠির কথা ওঠে। খেতে খেতেই চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দিবাকর। তারপর আপন মনে বলে, "কি মুশকিল—"

"সত্যি-তুমি না থাকলে—" ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে দিবাকর। তার পড় রমার চিবুক ধরে বলে, "আমার রুমি কি এতই দুর্ব্বল?" "তা নয়। কিন্তু তুমি না থাকলে ভাল লাগবে না যে—"

"আমারও ভাল লাগবে না। এত বড় এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ তুমি। এ সময় তোমার পাশে থাকতে না পারাটা যে কি অসহনীয় হবে সে শুধু আমিই জানি। দেখি-তারিখটা পাল্টানো যায় কি না—।"

তারকের বাড়ীতে কমলা বৌদির দেখা পেল কাজল। নানান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হ'তে হ'তে অনিবার্য্য ভাবে শাপ-মোচন এবং সেই সঙ্গে রমার ও দিবাকরের প্রশস্তি শেষ হতে না হতে, কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনি ভাবে শেষপর্যায়ে অপর্ণার কথা উঠলো! কথায় কথায় কাজল বলে, "এই পবিবারের জন্য দিবাকরদার এত দরদ অথচ বৌদির মোটেও তা পছন্দ নয়। প্রতিবাদ করলেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে জোরালো বক্তৃতা শুরু করে দেন দাদা। বৌদির সব যুক্তি বানচাল হয়ে যায়।" অদ্ভুত ভঙ্গীতে চোখ দুটো সরু করে কাজলের কথা শোনেন কমলাবৌদি, তারপর বলেন, "দেখ, এতদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এদের জন্যে সব করছেন দিবাকরবাবু। এবং রমার এদের প্রতি তাচ্ছিল্য ও আগ্রহহীনতায়—তার প্রতি একটা চাপা ক্ষোভও যে আমার মনে ছিল না, তাও নয়—" বলে একটু থামেন। তারপর দম্ নিয়ে বলেন, "তোমাদের ইংরিজীতে একটা কথা আছে না মানে হলো-"ঝকমক করলেই তা সোনা হয় না—" কথাটা টেনে নিয়ে কাজল বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—অল্ দ্যাট গ্লিটারস্ আর নট গোল্ড—"

"ঠিক বলেছ। এ ব্যাপারেও কথাটা খুব খাটে। সেদিন ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে বুঝতে পেরেছি—যে যাই বলুক দিবাকরবাবু নিঃস্বার্থভাবে এদের সাহায্য করছেন না।" বলে নৈরাশ্য মাখানো দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে তাকান। প্রতিবাদের সুরে কাজল বলে, "না, না, এ কি বলছেন আপনি। আমি দেখেছি, আমি জানি দিবাকরদা লোকটা কত খাঁটি—"

"তুমি ভাই সহজ সরল মানুষ। রমার মুখে তোমার কথা তো শুনেছি। তুমি ভাই বাইরের মুখোশ দেখেই ভুলেছ। কিছু মনে করো না ভাই এরপর থেকে দিবাকরবাবুকে আমি মনে মনে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে স্থরু করেছি। শুধু রমাকে ছোটবোনের মত ভালবাসি—ওকে কষ্ট দিতে মন চায় না, তাই চুপ করে আছি—" উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে ওঠে কমলা বৌদির মুখ। এক অসহ্য নীরবতায় ঘরের আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। উল্লাসে ফেটে পড়তে চায় কাজল কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে চোখে মুখে নিরীহ বেদনার ছায়া ফুটিয়ে মাটির দিকে চেয়ে থাকে সে।

ভারাক্রান্ত মনে সামনের দিকে ঝুঁকে নখ খোঁটেন কিছুক্ষণ কমলা বৌদি। তারপর একবার তারকের দিকে, একবার কাজলের দিকে চেয়ে যেন কিছু ভাবেন, তারপর বল্‌তে স্থরু করেন, "বুঝতে পারছি কথাটা শোনার জন্যে কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের। তারক আমার ছোট ভাইয়ের মত, আর কাজলবাবু তুমি রমার স্নেহভাজন এবং নিজেও রমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। জানি এ কথা তোমরা প্রচার করে বেড়াবে না। মানুষ চেনা কঠিন কাজ। দিবাকরবাবু প্রায়ই দিনে দুপুরে এদের বাড়ী আসেন। মটর বাইকের আওয়াজেই টের পাই কখন এলেন আর গেলেন কখন। এই অলক্ষ্মী মেয়েটা ফাঁক পেলেই বে-পাড়ার ছেলে ছোক্‌রাদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে—এ পাড়ার অনেকেই তা জানে। মেয়েটার তত্ত্ব-তল্লাসী করতেই হঠাৎ হঠাৎ দিবাকরবাবু আসেন তা অন্যান্য সকলের মতো আমিও বিশ্বাস করতাম, আর মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসাও করতাম। কিন্তু—" বলেই হঠাৎ থেমে যান কমলা বৌদি তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "ভুল ভাঙলো মাত্র ক'দিন আগে। অপর্ণার মা আমাদের সমিতিতে সেলাই ফোঁড়াইয়ের কাজ করেন। দিবাকরবাবুই ঢুকিয়ে দিয়ে ছিলেন। সেদিন—এই ধরো বেলা বারোটা কি সাড়ে বারোটা হবে, ওদের বাড়ী গেলাম, উদ্দেশ্য ভদ্রমহিলার হাতের কাজগুলি কতদূর হলো দেখা। পেছনের খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে বড় ঘরের খোলা দরজা দিয়ে যেমন যাই তেমনি ভাবেই ঢুকে পড়ি।" তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলেন, "ঢুকেই ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জা, কি লজ্জা! বিছানায় শুয়ে ছুঁড়িটা, আর তার বুকে এলিয়ে পড়ে —ছিঃ ছিঃ মুখে বলা যায় না আর—" হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যান কমলাবৌদি।

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সার্টের হাতা গুটাতে থাকে তারক। চোখ ফেটে যেন আগুন বের হচ্ছে তার। প্রচণ্ড ক্রোধে সে আত্মহারা। মনে হয়

দিবাকরকে সামনে পেলে আঘাত করতে পেছিয়ে যাবে না সে। কাজল চোখ কপালে তুলে বলে, "আপনি ভুল দেখেননি তো? আমি ভাবতেই পারি না—" তার কথা শেষ হ'বার আগেই কমলাবৌদি বলে ওঠেন, "সত্যি সত্যি যা দেখেছি তাই বলছি। এই হলো তোমাদের দিবাকরদা। তারক, তোমার না অগাধ শ্রদ্ধা এই মানুষটির প্রতি।" তারক মাথা নীচু করে বসে পড়ে। কোন কথা বলে না। কাজল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, "অন্য কেউ হলে এ কথা বিশ্বাসই করতুম না। এই ধরুন না প্রায় মাসখানেক আগে আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক বল্লেন যে ষ্টেশন রোডে তার এক বন্ধু নাকি বলেছেন যে কোন এক রাত্রে এই দশটা সাড়ে দশটার সময় কালো একটি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে রিক্সা করে দিবাকরদাকে যেতে দেখেছেন। শুনে তো আমি ফায়ার। কী? এত বড় কথা? বল্লুম ডাকুন আপনার সেই বন্ধুকে, দেখি একবার তার শ্রীমুখ"। কথা শেষ করতে পারে না—উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সে। "নিজের লোক বলেই-এ ধরনের কথা শুনলে বুকে বাজে। কিন্তু কতদিন সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যাবে? শুধু ভাবি রমার কথা। সুন্দর মিষ্টি মেয়েটা! আহা বেচারী! সে তো জানে না যাকে নিয়ে তার এত গর্ব, সেই মানুষটা এত খল, এত নীচ! কি আছে তার কপালে কে জানে?" চিন্তাক্লিষ্ট মুখে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন কমলা বৌদি।

নীরবতা ভঙ্গ করে কাজল বলে, "দেখুন বৌদি, ঘটনাটা যখন জেনেছি এবং আপনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, আমার মনে হয় আমাদের চুপ করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। রমা বৌদির মঙ্গলামঙ্গলের দায়ীত্ব নিতেই হ'বে আমাদের। বিপর্যয় রোধ করার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে আমাদের। আমার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। আমি সম্পর্কে ছোট, তাছাড়া দুদিনের জন্যে এসেছি, দু'দিন পর চলেও যাব হয়ত। কিন্তু আপনি দীর্ঘকাল ধরে রমা বৌদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আছেন, থাকবেন ও দীর্ঘকাল। তাছাড়া আপনার পক্ষে যা সহজ এবং সম্ভব আমার বা তারকের পক্ষে কখনই তা নয়—।"

"তোমার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই।" কমলা বৌদি বলেন। "আমি বল্‌তে চাই চুপ করে ঘটনা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে এই বিপর্যয় রোধ করা দরকার এবং তা এক্ষুনি। যদি সত্যি সত্যিই রমা বৌদির মঙ্গল কামনা করে থাকেন তবে যা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁকে বলুন। আমি জানি কেউ যদি দিবাকরদাকে ফেরাতে পারে, সে শুধু

আমাদের রমাবৌদি।" "কথাটা অন্যায় বলোনি ভাই। কিন্তু ভয়ে যে বুক কেঁপে ওঠে। কি জানি, ভাল করতে গিয়ে যদি অঘটন ঘটিয়ে ফেলি ? এসব শুনে রমা যদি কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে ? বড্ড অভিমানী মেয়ে সে।" "আমি বল্‌বো আপনি তাঁকে চেনেন না। রমা বৌদি অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া। কাছে থেকে দেখ্‌ছি তো তাঁকে ? যে কোন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর আছে—"

"বলবো ?" ইতঃস্তত করে ভীরু গলায় বলেন কমলাবৌদি। "নিশ্চয় বল্‌বেন এবং যত শিগ্‌গীর সম্ভব; গুজব বেশী ছড়িয়ে পড়ার আগেই যবনিকা টানতে হ'বে। ভয় করবেন না আপনি, বলুন তাঁকে সব খুলে। আমি তো আছিই। সামাল দেবার, দায়ীত্ব নেবার সাহস আমার আছে। কিন্তু একটা কথা—কখনও যেন রমা বৌদি জানতে না পারেন যে আমাদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সব থেকে ভাল হয় আমরা যে পরিচিত সে কথা যেন ঘৃনাক্ষরেও বৌদি জানতে না পারেন—"

"বেশ যদি মনে করো এর প্রয়োজন আছে, তবে তাই হবে।" কমলা বৌদি বলেন। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ চেপে বেরিয়ে পড়ে কাজল।

শেষ পর্যন্ত তথা কথিত মরান ক্লাবের প্রোগ্রাম এড়ান সম্ভব হলো না। অগত্যা শনিবার সকালে দিবাকর ছাড়া আর সবাইকে নিয়ে ডিগবয় রওনা হলো রমা নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে। ব্যবস্থা করে দীপুকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মিসেস সাংমার বাড়ীতে। সামনে পরীক্ষা, তাই অনিয়ম অত্যাচার যত এড়ান যায় বলেই তাকে সঙ্গে নেওয়া হলো না। বাড়ীর গেটে সবাইকে বিদায় দিয়ে হাহাকার করে ওঠে দিবাকর। জীবনে এই প্রথমবার মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিয়ে বিবেকের দংশনে জর্জরিত তার অন্তর। এর ফলাফল কি দাঁড়াবে কে জানে ? ছট্‌ফট করে দিবাকর।

ডিগবয়ে ওদের আদর যত্নের খাম্‌তি ছিল না। কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় কোন খুঁত ছিল না। কোন অসুবিধাই বোধ করে না রমা। বেলা সাড়ে এগারটায় খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে আড়াটায় সবাইকে নিয়ে স্টেজে গেল রমা। কিছু আলাপ আলোচনা এবং কয়েকটা দৃশ্যের রিহার্সেল দিয়ে ফিরে এলো দাস সাহেবের বাড়ী। কাজল তৎপরতার সঙ্গে রমাকে সাহায্য করে। রওনা হবার সময় সবার সামনে দিবাকর কাজলকে সব সময় বৌদির পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য কবতে অনুরোধ করেছিল এবং বৌদির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সজাগ থাকতে বলে ছিল। সুতরাং ছায়ার মত বৌদির পেছনে কাজল

ছিল। অভাবিত এই সুযোগের জন্য ভাগ্য দেবতাকে মনে মনে প্রণাম জানায় সে।

যথাসময়ে পর্দা উঠলো। সবলীল ও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত শাপমোচন নৃত্য-নাট্য সকলেরই প্রশংসা অর্জন করলো। সত্যি কথা বল্‌তে কি ডিগবয় স্টেজে এমন মনোরম অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। অভিনয় শেষে দলে দলে ভদ্রলোক ও মহিলারা এসে রমাকে প্রশংসা করে গেলেন। রমার গানের প্রশংসা সবার মুখে মুখে।

অভিনয় শেষে ডিগবয় ক্লাবের অন্যতম পেট্রন মিঃ. স্বামীনাথন স্টেজে উঠে শিল্পী কর্মকর্তা ও ডিব্রুগড় ক্লাবের ভূয়সী প্রশংসা করে ডিব্রুগড় বেঙ্গলী ক্লাবের নামে ডোনেশন হিসেবে আড়াই-হাজার টাকার চেক রমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন— "জন্মসূত্রে আমি অ-বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্যের লোক আমি। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে কবি-গুরুর পদতলে বসে মানুষ হবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এ জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। বাংলা তথা রবীন্দ্র সংস্কৃতি আমার মজ্জায় মজ্জায়। গাইতে পারি না আমি কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতেব মর্ম আমি বুঝি। ডিব্রুগড় বেঙ্গলী ক্লাবের প্রতিভূ হিসেবে যিনি এসেছেন, যার সুদক্ষ পরিচালনায় এই নৃত্যনাট্য অভিনীত হলো, সেই শ্রীমতী রমা চৌধুরীর মতো এমন সুললিত রবীন্দ্র সঙ্গীত ইতিপূর্বে খুব বেশী শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বঙ্গ সংস্কৃতির পীঠস্থান কোলকাতার বাইরে এবং গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের আওতা থেকে বহুদূরে আসামের এই পূর্ব্বতম প্রান্তে এমন অনুষ্ঠান যে সম্ভব, তা আজকের অভিনয় না দেখলে জানাই যেতো না। আজ আমাদের মঞ্চে শ্রীমতী রমা দেবীকে পেয়ে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি। আমার কন্যা স্থানীয়া তিনি, তাই তাঁকে অনুরোধ করবো—এখানেই যেন তিনি থেমে না থাকেন। রবীন্দ্র সংস্কৃতির ধারাকে দেশ হতে দেশান্তেরে, কাল হতে কালান্তরে, বয়ে নিয়ে যাওয়ার এই গুরুদায়ীত্বকে যেন অস্বীকার না করেন। সময় ও সুযোগ মতো তিনি যেন মাঝে মাঝেই এখানে আসেন রবীন্দ্রনাথের নব নব ভাবধারা উন্মোচন করতে।

ডিগবয়ে ওয়েল কোম্পানী ও ক্লাবের তরফ থেকে সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ্য এই চেক খানা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছি।

দলের নেত্রী হিসেবে রমাকেও এবার কিছু বলতে হয়। কিন্তু কি বলবে সে? আজ দিবাকর উপস্থিত থাকলে এই দায়ীত্ব তারই ছিল। কিন্তু তার অবর্তমানে এ গুরু দায়িত্ব তার ঘাড়েই এসে পড়েছে। কোনদিন বক্তৃতা

দেয়নি সে, তবু ভাবাবেগে উঠে দাঁড়ায়, মনে মনে দিবাকরকে প্রণাম করে। হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে সে বলে, "আমার মত নগন্য শিল্পীকে যে সম্বর্দ্ধনা আপনারা দিলেন—তা অভূতপূর্ব। এ দিনটির কথা আমি ভুলবো না কোনদিনও। শৈশব থেকে সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। সে ভাবে কিছু শিক্ষাও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা প্রকাশের ছিল না কোন সুযোগ। জীবনে প্রথম সে সুযোগ পেলাম আমার স্বামীর উৎসাহ ও প্রেরণায়। দুঃখের বিষয় বিশেষ জরুরী কাজে জড়িয়ে পড়ায় তিনি আজ এখানে উপস্থিত হতে পারেননি। এই জন্য তাঁর পক্ষ থেকে আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। এই নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও সঙ্গীত ছাড়া আর সব কিছুই তাঁর এবং তার বন্ধু ভৈরববাবুর সাহায্য ও অবদানে সম্ভব হয়েছে।

আমার অশেষ সৌভাগ্য যে গ্রন্থনাপাঠে এবং অরুনেশ্বরের গান ও সংলাপে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়েছি। তাঁর কৃতিত্ব আপনারা আজ প্রত্যক্ষ করছেন। তাঁকে না পেলে এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হতো। যে সব মেয়েরা নৃত্যগীতে অংশ নিয়েছে ওরা খুব ছেলেমানুষ। কিন্তু তাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না ওদের জন্য গর্ব বোধ করি। যন্ত্র-সঙ্গীতে শ্রীযুক্ত প্রতুল বসু, দীপেন দাস, অমিতাভ নাগ ও শঙ্কর ঘোষাল সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। নিজ নিজ যন্ত্রে এঁরা প্রত্যেকেই কৃতি। নিস্বার্থভাবে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করতে এঁদের অবদান প্রশংসনীয়।

ডিগবয় ক্লাবের কর্মকর্তাবৃন্দ, পেট্রন মিঃ স্বামীনাথন, প্রেসিডেন্ট মিঃ দাস, সেক্রেটারী জীতেন তরফদার যে ভাবে আমাদের যত্ন ও আপ্যায়ণ করেছেন, তা তুলনা বিহীন। চিরকাল একথা আমাদের মনে থাকবে। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাচ্ছি।

সব শেষে এখানকার দর্শকদের প্রশংসা না করে পারছি না। এমন বিদগ্ধ ও সহৃদয় দর্শক সহসা পাওয়া যায় না। কবিগুরু বলেছেন, 'একাকী গায়কের নহেক গান/গাহিতে হবে দুইজনে/গাহিবে একজন খুলিয়া গলা/ আর জন গাবে অন্যমনে।' কবিগুরুর বাণী সার্থক করেছেন আজ এখানকার বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলী—" প্রবল হাততালিতে রমার গলা ডুবে যায়। থামতেই চায় না যেন। বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ স্বামীনাথন সবাইকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন। রমা আবার বলতে শুরু করে, "আমার বলার আর কিছুই নেই। শুধু শেষ কথা বলে যাই আপনাদের আনন্দ দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। সবাইকে আমাদের প্রণাম

জানিয়ে এবারের মতো বিদায় নিচ্ছি।" প্রবল হাততালির মধ্যে রমা বসে পড়ে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় রমার মনে। আজ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্তির পেছনে রয়েছে দিবাকরের প্রেরণা। দিবাকর সব সময়ই বলে এসেছে, "সুস্থ গণ্ডীর মধ্যে অভিজ্ঞাত্য বজায় রেখে সঙ্গীত চর্চ্চাই সম্মানজনক।" দিবাকরের উক্তি সত্যি বলেই আজ প্রমাণিত হয়েছে। একদিন দিবাকরের বিরোধিতা করে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল বলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। আর তাই পরম গৌরবের দিনে দিবাকরের অনুপস্থিতি তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

দলের সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। এবার ফেরার পালা। বাস এসে দাঁড়িয়েছে, মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। এমন সময় গুটিগুটি এগিয়ে এসে একটি সুবেশ অসমীয়া তরুণ নীচু হয়ে রমার পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। রমার সচকিত অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করে মৃদু হেসে ছেলেটি বলে, "বাই দেও (দিদি) চিনতে পারছেন না তো আমায় ?" রমা সত্যিই চিনতে পারছে না। অবাক চোখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটি হেসে বলে, "চেনার কথা নয়। শেষবার আমায় যখন দেখেছেন আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমার নাম প্রশান্ত হাজারিকা। আমার ককাই দেও (বড়ভাই) অনন্ত হাজারিকা দিবাদার অফিসে কাজ করতেন। তখন আপনাদের শান্তিপাড়ার বাড়ীতে কত গিয়াছি, কত খেয়েছি। "ওমা তুমি সেই প্রশান্ত—যাকে তোমায় দিবাদা অশান্ত বলে ডাকতেন ? সেই দুষ্টু চঞ্চল ছেলেটা ? কত বড় আর সুন্দর হয়েছ তুমি। এখন কি করছো তুমি ? মা কোথায়—?"

"মা এখন জোড়হাটে। ভালই আছেন। পূজাপাঠ নিয়েই ব্যস্ত। দাদা শিলং এ. জি অফিসে। আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ। আজ আপনাদের নৃত্যনাট্য দেখলাম। অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে।"

"ভাল লেগেছে তোমার ?" সস্নেহে প্রশ্ন করে রমা।

"ভাল জিনিস, ভাল লাগবে না ? ডিব্রুগড়ে দু'দুবার অল্পের জন্যে মিস্ করেছি। এবার এখানে হচ্ছে শুনে চিংরী সাতিলের কাজ ফেলে পালিয়ে এসেছি। আমার বন্ধু প্রবীন বড়দলৌ এখানে কাজ করে তারই দৌলতে টিকিট যোগাড় করেছি।"

"ছিঃ ছিঃ, তুমি টিকিট কেটে দেখলে ? কেন, দিদির কাছে আসতে পারোনি তুমি ?" আক্ষেপ করে বলে রমা। সলজ্জ হাসি হেসে প্রশান্ত

বলে, "না এই আর কি ? হঠাৎ যদি চিনতে না পারেন—"

"তাই বুঝি ? কেন, তোমায় চিনতে দেরী হয়েছে আমার ?"

"না, তা হয়নি অবশ্য। কিন্তু ভয় ছিল তো ? তবে দিবাদা এলে চিন্তার কিছুই ছিল না। জুলুম করে টিকিট আদায় করে ছাড়তুম। ভালো কথা—পথে দিবাদাকে দেখলাম।"

"দেখা হয়েছে ? কোথায় ? কি বল্লেন ? "উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে রমা।

"না, কথা হয়নি। হবে কি করে ? ওরা ছিলেন ফেরীবোটে মাঝনদীতে। আমাদের বাস ছিল এ পারে দাঁড়িয়ে। ফেরীর জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলুম—!"

"ফেরীবোট ! মরানের পথে ফেরী কোথায় ?"

"সবুজ রংয়ের গাড়ী নিয়ে পার হচ্ছিলেন দিবাদা। সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন।

"সঙ্গে মহিলা ? তুমি ঠিক দেখছ তো ?"

"ভুল হবে কেন ? তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যদিও আবছা আলো—তবু দিবাদাকে না চেনার কথা নয়। ও রকম উঁচু লম্বা বিরাট চেহারা ক'জনের আছে এ অঞ্চলে ? হাজার লোকের মধ্যেও দিবাদাকে চিনে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়।"

"কিন্তু নাহারকাটিয়া কেন ? ও পথ দিয়ে গেলে মরান বুঝি কাছে হয় ?"

"হাসালেন। এতদিন ধরে এখানে আছেন, তবুও কিছু জানেন না আপনি ? এপথেও মরান যাওয়া যাবে না কেন ? মেন রোড লিড্স টু রোম। তবে ডিব্রুগড় থেকে মরান যেতে হলে ভায়া নাহারকাটিয়া যায় না কেউ। কারণ প্রশস্ত মসৃণ ট্রাঙ্করোড দিয়ে গেলে মরান মাত্র ছাব্বিশ মাইল। কিন্তু নাহারকাটিয়া হয়ে গেলে পঞ্চাশ মাইল ঘুর পথে যেতে হয়। রাস্তাও ভাল নয়, বেশ কয়েক মাইল কাঁচা রাস্তা—।

"সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন—?"

"হ্যাঁ, ওরা ফেরীবোটের রেলিং এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিলেন। দূর থেকে প্রথম মনে হয়েছিল বুঝি আপনি। অস্পষ্ট আলোতে চেনা যায় না। পরে একটা লরির আলো পড়তেই স্পষ্ট দেখা গেল, বেশ কালো মেয়েটির হাত মুখ।"

"তোমার দিবাদাকে চিন্‌তে ভুল হয়নি তো ?"

"ভুল হবে ? দিবাদার সেই এক চেটিয়া উৎসবের পোশাক, ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী, সাদা শাল, সাদা গ্রীসিয়ান স্লিপার ! এরপরও ভুল হবে

বল্‌তে চান ?”

“তোমার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি ?”

“হবে কি করে ? ঘাটে বোট ভিড়তেই গোঁ গোঁ করে দিবাদার গাড়ী পূর্ণগতিতে নদীর পাড়ের চড়াই বেয়ে বেরিয়ে গেল। আমরাও ব্যস্ত ফেরী বোটে উঠ্‌তে—”

“গাড়ীতে আর কেউ ছিল ?”

“ড্রাইভার আর ওদের দু’জন ছাড়া—”

“ও হো এবার বুঝেছি। মনে পড়েছে, আমার এক ননদকে নাহার কাটিয়া পৌঁছে দেবার কথা ছিল. এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন তোমার দিবাদা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমা বলে, “যাক্‌গে কাজের জন্য নিশ্চয়ই তোমার ডিব্রুগড় আসতে হয়। এবার এলে দেখা করো। আমরা কিন্তু এখন খালিয়ামারীতে থাকি ! চিন্‌তে পারবে তো ?”

“চিনে নিব। দাদার নাম বল্লে যে কেউ দেখিয়ে দিবে। যাব একদিন—।”

“না না ভাই, দায়সারা গোছের দেখা করা নয় কিন্তু। দিদির বাড়ীতে উঠবে. থাকবে খাবে। মনে থাকবে ?” ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নেয় প্রশান্ত।

কথার মধ্যে কাজল কখন এসে দাঁড়িয়ে ছিল টের পায়নি রমা। তাই কাজলের কথা শুনে চম্‌কে ফিরে চায় সে। কাজল বলে, “কি বলছিলো ছেলেটা দাদার সম্পর্কে ?”

“এখন ও কথা থাক। পরে শুনো। এদিকে কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতো মালপত্র সব উঠ্‌লো কিনা। সবাই এলেন কিনা ?” ক্ষুণ্ণ হয় রমার কথায় কাজল। তবু গোপন উল্লাসে ফেটে পড়ে সে। সবই শুনেছে সে। এবার ফাঁদে পড়েছেন দিবাকর বাবু।

নির্জন ফাঁকা পথ। হেডলাইট জ্বেলে ছুটে চলেছে অতিকায় দৈত্যের মত বাসখানা গোঁ গোঁ শব্দ করে। চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। শুধু গাড়ীর সামনের আলোতে উদ্ভাসিত আঁকাবাঁকা পীচের রাস্তা সাপের পিঠের মতো চিক্‌ চিক্‌ করছে ! মাঝে মাঝে অদূরের চা-বাগানগুলির আলো ঝলোমলো রূপ ক্ষণিকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে।

রাত এগারটা পঁচিশ। গাড়ীর যাত্রীদের কথাবার্তা ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে এসেছে। সারাদিনের ক্লান্তি ও অবসাদ, যাত্রার পূর্বে গুরু ভোজন এবং

গাড়ীর গতির আমেজে ঝিমুনী এসেছে সবার চোখে। গদি-মোড়া নরম উঁচু সিটে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে সবাই। মাঝে মাঝে টুকরো কাশির দমক, সর্দির আধিক্যে নাক টানার আওয়াজ এবং হাই তোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। বাইরের প্রশান্ত নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে গাড়ীর ইঞ্জিনের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ বড় একঘেয়ে মনে হচ্ছে রমার কাছে।

রমার চোখে ঘুম নেই। তীব্র জ্বালায় বিক্ষুব্ধ তার অন্তর। এই জ্বালার কারণ যুগিয়েছে প্রশান্ত হাজারিকা। মরান ক্লাবের পিয়নের কাছ থেকে চিঠিখানা সই করে নিয়েছে সে নিজে। পড়েছে, জেনেছে তার বিষয় বস্তু। এরই জন্যে সখেদে ডিগবয়ের এত বড় চ্যালেঞ্জ তুচ্ছ করতে বাধ্য হয়েছে দিবাকর। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রমা বিনা প্রশ্নে, নিঃসন্দেহে। মরান ক্লাবে যাবার উপযুক্ত পোশাক, গরম ট্রাউজার, সার্ট, কোর্ট টাই বার করে সাজিয়ে রেখে এসেছে। নিজের হাতে কালি দিয়ে জুতো বুরুশ করে ধোয়া মোজা জোড়া গুছিয়ে দিয়ে এসেছে। অথচ প্রশান্ত বল্লো সে দেখেছে ধুতি পাঞ্জাবী, সাদা শাল গায়ে জড়িয়ে সাদা গ্রীসিয়ান স্লিপার পায়ে ফেরীবোটের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে এক লম্বা ছিপ্‌ছিপে মহিলার সঙ্গে আলাপচারী দিবাকরকে। কি করে তা সম্ভব? কে সেই কালো ছিপ্‌ছিপে মহিলা। কি রহস্য থাকতে পারে এর পেছনে?

মধ্যরাত্রি। সবাই নিশ্চিন্ত আরামে আপন আপন সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে গা এলিয়ে নিদ্রামগ্ন। পিঠ উচু সিটে পেছনের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তবু ঈর্ষা জাগে মনে। সে কেন ওদের মতো নিশ্চিন্ত আরামে গা এলিয়ে দিয়ে সুখ স্বপ্নে বিভোর হতে পারছে না? এত বড় জয়, এতো সম্মান করায়ত্ত করেও সে কেন বিষাদ-মগ্ন? কেন নিজেকে মনে হচ্ছে তুচ্ছ অবহেলিত অবমানিত? অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতর ধ্বনি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেবিয়ে যায় সহসা। সচকিত হয়ে পাশ ফিরে তাকাতেই কাজলকে দেখতে পেলো রমা। একেবারে পাশের সিটে। কখন, কেমন করে এসে বসেছে কাজল রমা জানে না। সবার থেকে আলাদা হয়ে ওরা দুজনে ড্রাইভিং সিটের পাশে এঞ্জিনের আড়ালে বসে আছে পাশাপাশি।

চোখে চোখ পড়তেই ম্লান হাসি হেসে পরম আদরে নিজের ভারী শালখানা রমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে কোলে ফেলে রাখা রমার নরম হাতখানা ধরে কাছে টেনে নেয় কাজল। বাধা দেয় না রমা। একটু

উষ্ণতা, একটু সহানুভূতি একটু সমবেদনার এখন বড় প্রয়োজন রমার। রমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মৃদু কণ্ঠে কাজল বলে, "এতো দুর্বল কেন? ভয় কি? আমি তো আছি!"

এই সান্ত্বনাটুকুর প্রয়োজন ছিল রমার। কাজলের কাছে তার অনেক ঋণ। আজ সারাদিন কাজল তাকে সাহায্য করেছে অকৃপণভাবে। শুধু তাই নয়—গ্রন্থনা ও সংলাপ পাঠে এবং গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল কাজল। এমনটি আর কখনও হয়নি এর আগে কোনও দিন। আর এখন? তার ভাঙ্গা, ছেঁড়া, দুমড়ে যাওয়া মনকে নতুন আশ্বাসে সজীব করে তুলতে চাইছে কাজল। কৃতজ্ঞতায়, পরম নির্ভরতায় দুহাত বাড়িয়ে কাজলের বাহুমূল চেপে ধরে গায়ে গা লাগিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রমা। বড্ড ভাল লাগ্‌ছে কাজলকে।

দুনিয়ার সব কিছুরই শেষ আছে। পথেরও শেষ আছে। শেষ আছে দেহ ও মনের উষ্ণতা নিয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে থাকার নেশার। হর্ন বাজিয়ে মোড় নিয়ে বাসখানা বাড়ীর সামনের পথ ধরলো। ঐ তো সাম্‌নেই কালভার্ট। আর ঠিক তখনই রমার চোখে পড়ে বাড়ীর সামনে দাঁড়ানো সবুজ হিন্দুস্থান ফোরটিন্ গাড়ীখানা স্টার্ট নিয়ে চলতে সুরু করেছে মাত্র! তবে?

গাড়ীর শব্দ এবং হর্ন শুনে বারান্দা ও বাইরের আলো জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নেবে এলো দিবাকর। পরণে তার ধুতি পাঞ্জাবী শাল, পায়ে সাদা জুতো। ঠিকই দেখেছে প্রশান্ত। ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও বিরাগে আড়ষ্ট হয়ে উঠে খাম্‌চে ধরে কাজলের হাত।

চিক্ চিক্ করে ওঠে কাজলের চোখ। এতো দিনের স্বপ্ন এবার বুঝি সফল হবে। মৃদু আকর্ষণ করে গালে গাল রেখে চাপা গলায় বলে, "ভয় কি? আমি তো আছি পাশে।" ধীরে ধীরে শালখানা গুটিয়ে নিয়ে রমার ঘাড়ে মৃদু চাপ দিয়ে সরে বসে কাজল।

সাংমাদের বাড়ী থেকে ঘুমন্ত দীপুকে নিয়ে মাত্র তক্ষুনি বাড়ী এসেছে দিবাকর। বাড়ীর সামনে অতিকায় বাসখানা যেন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। সাম্‌নের দরজা দিয়ে প্রথম নেমে এলো কাজল। দিবাকর এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, "কি হে ভায়া, অপারেশন সাক্‌সেস্‌ফুল তো?" মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয় কাজল। রমা ততক্ষণে বাসের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দিবাকরকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মুখ বিকৃত করে, বাস থেকে নেমেই বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিল সে। কোন রকম সম্ভাষণ না করে,

সবার সামনে এ ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় আহত হয় দিবাকর। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়—এ কিছু নয়, অভিমানির মান হয়েছে। মান ভাঙাতেই না রাত কাবার হয়।

ভৈরব জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। দিবাকর জিজ্ঞেস করে, "কিরে? ভাল করে উৎরেছে তো?"

"তা আর বল্‌তে? ডিগবয়কে চমকে দিয়ে এসেছি, যা হয়েছে এক কথায় সুপার্ব। তার চেয়েও বড় ঘটনা কি জানো? খোলা স্টেজে দাঁড়িয়ে বৌদি এক্সটেমপোর স্পীচ্ দিচ্ছেন, ভাবতে পার? আমাদের লাজুক বৌদি হল-ভর্তি একরাশ লোকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সুললিত ভাষায় ভাষণ দিচ্ছেন, এ কী ভেবেছি কখনও, না ভাবতে পারি? তৈরী না হয়ে তুমিও পারতে না দিবাদা। বৌদি কিন্তু পেরেছেন, আশ্চর্যজনক ভাবে পেরেছেন। আর তোমাকে কোথায় উঠিয়েছেন জানো? এই অনুষ্ঠানের সবটুকু কৃতিত্ব তোমার উপর চাপিয়ে বৌদি বললেন, 'জরুরী প্রয়োজনে তিনি উপস্থিত হ'তে পারেননি, তার জন্যে তাঁর হয়ে আপনাদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।' উঃ সে কি ক্ল্যাপ, কি ক্ল্যাপ, কান পাতা দায়।"

বিস্ময় বিমূঢ় দিবাকর। এই হলো তার আদরের রুমি! কিন্তু সে নিজে? লজ্জায় ঘৃণায় কুঁকড়ে যায় যেন সে। কিছু বল্‌তে হয় তাই বলে, "তাই নাকি রে? আশ্চর্য কাণ্ড? আমি তো ভাবতেই পারছি না। ঠিক আছে, কাল একসময় গুলজার হয়ে বসে শোনা যাবে।"

"ঠিক আছে। কাল সন্ধ্যায় একবার ক্লাবে এসো। ও হ্যাঁ ট্রাঙ্ক দুটো?"

"ও দুটো নাবিয়ে দিয়ে যা। লাইট আর মাইক তোর বাড়ীতেই নামাস্। কাল ক্লাবে গিয়ে ড্রামা সেক্রেটারীকে, সেট-সেটিং-পর্দা শুদ্ধ এগুলো সমঝে দিয়ে তোর বৌদির নামে রসিদ কাটিয়ে নিস্। এ সবই তোর বৌদি ক্লাবের ড্রামা সেকসনকে দান করলো, বুঝলি?"

"বাঃ বাঃ। ফাইন—খুব ভাল। চারদিকে বৌদির জয়জয়কার।"

গাড়ীতে উঠতে যাবার আগেই ভৈরব বলে, "মেয়েদের নামাবার জন্যে তোমায় কষ্ট করে আস্‌তে হবে না। আমি, অসিত, সোমেন আর হাবুল তো রয়েছি। সবাইকে নামিয়ে মালপত্রগুলি আমার বাড়ীতে নামিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দেব।" ওরা চলে গেল।

বাড়ীর দিকে ফিরতেই চোখে পড়ে কাজল তখনও দাঁড়িয়ে। দিবাকর বলে, "মিছামিছি ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ কেন? সারাদিন যথেষ্ট ধকল গেছে। যাও শুয়ে পড়োগে।"

কাজল মনঃক্ষুণ্ণ। ভৈরব বাঁধা না দিলে দিবাকর মেয়েদের পৌঁছে দেবার জন্যে চলেই যেতো। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক সময় হাতে পাওয়া যেত। গাড়ীতে যা শুরু সেই ঘনিষ্ঠতাকে আরও কিছুটা এগিয়ে নেওয়া সহজ হতো। আহা, সারাটা পথ বাঁ হাত দিয়ে আগ্‌লে গায়ে গা ঠেকিয়ে এসেছে। ভেলভেটের মত মসৃণ ত্বকের স্পর্শ, রমার দেহের সুগন্ধ-সুবাস এখনও লেগে আছে সর্বাঙ্গে, বন্ধুর কাজ করছে প্রশান্ত হাজারিকা নিজের অজান্তে। ধুতি, পাঞ্জাবী, শাল,জুতো সায় সবুজ গাড়ীখানা প্রশান্তের দেওয়া বিবরণ হুবহু মিলে গেছে। রমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন হাতেই রয়েছে। এমনভাবে খামচে ধরে ছিল রমা হাতের নখ ডুবিয়ে। গাড়ী থেকে নেবে অপূর্ব মুখভঙ্গী করে দিবাকরকে কেমন পাস কাটিয়ে গেল। ইস্ কি সুযোগটাই না গেল। শুধু একটি ঘণ্টা—মাত্র একটি ঘণ্টা। আজ রাতই রমাকে নিজের করে পেতে পারতো। যাক্ পথ তো তৈরী। সময় নষ্ট করা চল্‌বে না। ষ্ট্রাইক হোয়াইল দ্য আয়রণ ইজ হট্। রমার মত মেয়ে বলে কথা। কখন যে চট্ করে পাল্টে যাবে মতটা। এখন কি ভাবে এগোবে তাই নিয়ে ভাবতে বসে কাজল।

বারান্দায় উঠেই রমার গলা শুনতে পেলো দিবাকর। দীপু তো ঘুমোচ্ছে তবে কার সঙ্গে কথা বল্‌ছে রমা? নিজের ভুল বুঝতে পারে দিবাকর। ফোনে কথা বলছে রমা "হ্যাঃ হ্যাঃ এই তো মোটে নামলুম গাড়া থেকে। উনি মেয়েদের পৌঁছে দিতে গেছেন, ওহো, না, না, ঐ তো উনি আস্‌ছেন। উঃ, কি যে আদর যত্ন পেলাম আপনাদের কাছ থেকে জীবনে ভুলবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এখানে এলে আমাদের বাড়ীতেই উঠ্‌তে হবে আপনাদের। না, না, কোন কথা শুনবো না। কি যে বলেন? সবই আপনাদেব আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে। ঐ যে উনি এসে গেছেন। নিন্ কথা বলুন।" রিসিভারটা টেবিলে শুইয়ে শোবার ঘরে চলে গেল রমা পেছন ফিরে গট্‌গট্ করে।

দাস সাহেব কথা বল্‌ছেন। অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিলেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। এত ভাল যে হ'বে ভাবতেই পারেননি তিনি। "ইনফ্যাক্ট ডিগবয় ষ্টেজে এত সুন্দর পারফরমেন্স কোন কালেই হয়নি, সেই তেপান্ন সালে উদয়শঙ্করের নাচের পর। সে তো প্রফেসন্যাল ব্যাপার। কোন এমেচার গোষ্ঠীর পক্ষে এত সুন্দর সাজসজ্জা, আলো ও শব্দ তরঙ্গ ম্যানেজ করা কি চাট্টিখানি কথা? তারপর নাচ? গান? একেবারে তুলনাহীন। গ্রন্থনা পাঠ যিনি করলেন, সংলাপ পাঠ ও গান গাইলেন তা এ্যাভারেজ থেকে অনেক

উপরে। কিন্তু সবার উপরে মায়ের গলা। ওঃ সুপার্ব। তা হবে না কেন? আমাদেরই তো মেয়ে?" আরো বলেন তিনি, "জানো, মিঃ স্বামীনাথনের অভিনন্দনের জবাবে কি চমৎকার ভাষণ দিলেন আমার মা? কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়া এত সুন্দর করে যে বল্‌তে পারে! মনে রেখো, সি ইজ আ ট্যালেন্টেড, লেডী এণ্ড ইউ মাষ্ট বি প্রাউড অব হার। ওকে যত্ন করো, সমাদর করো।" বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার বলেন, "ওহো, তোমায় তুমি বলে ফেলেছি। কিছু মনে করোনি তো বাবা।" আনন্দ বিহ্বল দিবাকর। প্রায় মিনিট দশেক এক নাগাড়ে কথা বলে অবশেষে প্রথম সুযোগেই ওঁরা স্বামীস্ত্রী ডিব্রুগড় আসবার বাসনা জানিয়ে লাইন ছেড়ে দিলেন মিঃ দাস। ফোন রেখে বস্‌বার ঘরের দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় দিবাকর।

খুশীর আমেজে মশগুল দিবাকর। আয়াস করে ইজিচেয়ার টেনে বস্‌লো আলাপচারী হবার জন্যে। কিন্তু বিছানার দিকে চোখ পড়তেই দমে যায় সে। তার মাথার বালিশ ওপাশে সরিয়ে দিয়ে দীপুকে মাঝখানে টেনে এনে জড়িয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে রমা। এ হলো রমার মনের ক্ষুব্ধ অভিমানের অভিব্যক্তি। মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে শালখানা ইজি-চেয়ারের হাতলে ছুঁড়ে দিয়ে পাঞ্জাবীর বোতাম খুল্‌তে খুল্‌তে বলে, "বিজয়িনীর মুখ এমন গোমড়া কেন গো?" রমা নীরব। কোন সাড়া নেই।

"কি গো, কথাই বলছো না যে! রাগ হয়েছে বুঝি?"

"আঃ, দয়া করে একটু থামবে? ভাল লাগছে না, একটু ঘুমোতে দাও।" বিরক্তিমাখা সুরে বলে রমা। খাটের পাশে এসে দাঁড়ায় দিবাকর। মশারী তুলে পাশে বসে রমার মাথায় হাত রাখ্‌তেই ধড়মড় করে ছিট্‌কে দূরে সরে যায় রমা। বলে, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ঘেন্না করে, সরে যাও।" ওর মুখে হিংস্র ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখে ভয় পায় দিবাকর। এমন তো কখনও ঘটেনি! এতো নিছক মান অভিমানের ব্যাপার নয়! এমন কি ঘট্‌লো হঠাৎ? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দিবাকর। কি বল্‌বে ভেবে পাচ্ছেনা সে। খাটের ওপাশ দিয়ে নেমে দীপুকে টেনে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়ায় রমা।

"ঘুমন্ত ছেলেটাকে টানাটানি করছো কেন?" দিবাকর বলে।

"এখানে ঘুমোতে পারবো না। গেষ্টরুমে শোব—"

"ওঃ। ঘেন্না? তা তোমরা যাবে কেন? আমিই চলে যাচ্ছি—" পেছন পানে তাকায় না দিবাকর। আল্না থেকে পাজামা, গেঞ্জি ও শালখানা নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যায়। অপসৃয়মান দিবাকরের দিকে রুদ্র দৃষ্টি মেলে হিস্ হিস্ করে বলে রমা—"তাই যাও। লজ্জার মাথা খেয়ে আর কোনদিন এ ঘরে আসবে না।" কোন উত্তর দেয় না দিবাকর।

গেষ্টরুমের দরজা সশব্দে বন্ধ হ'তেই চম্‌কে ওঠে রমা। সত্যই চলে চলে গেল দিবাকর? যাবেই তো? মন তো তৈরীই ছিল। তাই প্রথম সুযোগেই এতো সহজে চলে যেতে পারলো সে! ঐ উড়ো চিঠি-গুলোকে মূল্য দেয়নি। কিন্তু প্রশান্তের কথা শুনে ভয় করছিল বটে তবুও একটা ক্ষীণ আশা ছিল। কিন্তু সবুজ গাড়ী, দিবাকরের সাজ পোষাক দেখেই মন একেবারে ভেঙে গেল। আর এখন? প্রমাণই হলো মিথ্যে নয় উড়ো চিঠিগুলি। মিথ্যে নয় প্রশান্ত। সামান্য প্ররোচনায় কেমন অনায়াসে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল দিবাকর। অনাদরে আহত, অপমানে ক্লিষ্ট রমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

দরজা বন্ধ করে গেষ্টরুমের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় দিবাকর। রমার এই চেহারা কোনদিন কল্পনাও ছিলনা তার। মতান্তর হয়েছে কিন্তু মনান্তর ঘটেনি কদাচ। ঝগড়াঝাটি, তর্কবিতর্ক হয়েছে, মান অভিমানের চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু তার ইতি হয়েছে গভীর আলিঙ্গনে, একে অপরের বুকে আশ্রয় নিয়ে। কিন্তু আজকের ব্যাপারটাই অদ্ভুত অন্যরকম! কিন্তু কেন? কেন এমন হলো? অন্ধকার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায় দিবাকর। আর তখনই তার দৃষ্টি আটকে যায় কাজলদের বাড়ীর একটি জানালায়। ঘরের জোরালো আলোর সামনে জানালায় দাঁড়ান একটি মানুষের অবয়ব। হাতে তার জ্বলন্ত সিগারেট। কে? কাজল? হ্যাঁ কাজল ছাড়া আর কে হ'তে পারে? রাত জেগে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কেন কাজল এই দারুণ শীতে? কিসের আশায়, কার প্রতীক্ষায়? সারাদিনের ক্লান্তি ও অবসাদে এতক্ষণ বিছানায় এলিয়ে পড়ার কথা। কি কারণ ঘট্‌লো? কারণ? থম্‌কে যায় দিবাকর।

নাহরকাটিয়া ফেরীঘাটে আজই সন্ধ্যায় অনেক কথা বলেছে অপর্ণা, যা কোনদিনও তার জানবার কথা নয়। পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে রমাকে নিয়ে কাজলের কথাবার্ত্তা—তার হাতে রমার ফটো থেকে শুরু করে সেদিন সন্ধ্যায় লুকিয়ে বাগানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করা দৃশ্যের বর্ণনা কিছুই বাদ দেয়নি অপর্ণা। সেই বর্ণনায় রমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না

বটে কিন্তু রমা কি একেবারে নির্দোষ? দাদাভাইকে ব্যথা না দেবার জন্যে অর্পণা কি কিছু গোপন করার চেষ্টা করেনি? যতটুকু সেদিন সে প্রত্যক্ষ করেছে তাই কি সব? এর আগে বা পরেও কি কিছু ঘটেনি সবার অগোচরে, গোপনে? তা না হলে সেদিন কাজলের বাড়াবাড়ি করার সাহস হলো কেমন করে? আর রমাই বা এই বাড়াবাড়ি সহ্য করলো কি করে বিনা প্রতিবাদে?

সেদিন কলিতার ফোনের ব্যাপারে রমা ও কাজলের চোখাচোখি এর কি কোন অর্থ নেই? আজই একটু আগে বাসে করে দীর্ঘপথ ড্রাইভিং সিটে পাশাপাশি বসে এলো, এ কি শুধু কাকতালীয় না ইচ্ছা প্রসূত? গাড়ী থেকে সবার আগে নেমে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে রইল কেন কাজল, নীরবে একপাশ ঘেঁষে? সে কি শুধু মেয়েদের পৌঁছে দেবার জন্যে দিবাকরের গাড়ীতে ওঠার প্রতীক্ষায়? কোথায় ছিল তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস? চিরকালের চঞ্চল, বাকপটু, সুরসিক কাজলের এ কি চেহারা? এত বড় জয়ের পর কেন এই বিমর্ষ নীরবতা? কেন তার প্রশ্নের জবাবে নীরবে শুধু ঘাড়নাড়া?

কে জানে, তার অবর্তমানে ডিগবয়ে কিছু ঘটেছে কিনা দু'জনের মধ্যে? নয়ই বা কেন? তা না হলে রমার আজকের চেহারা এমন অচেনা মনে হলো কেন? কেন গেষ্টরুমে চলে আসতে চেয়েছিল রমা? সে কি কাজলের সান্নিধ্যের জন্যে নয়? সন্দেহের ছায়া বিচলিত করে তোলে দিবাকরকে।

নাঃ, আর ভাবতে পারে না দিবাকর। মাথায় শিরা উপশিরা টন্ টন্ করে ওঠে। কার জন্যে রক্ত জল করে এত সব সে করছে? মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা। দুহাতে কপাল চেপে ধরে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে দিবাকর।

পরদিন একটু সকাল সকাল শুধু এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে যায় দিবাকর। লুচি ভেজে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই মটর বাইকের আওয়াজ শুনে চম্‌কে ওঠে রমা। এতদূর? প্রচণ্ড ক্রোধে ফুঁস্‌তে ফুঁস্‌তে বাইরের ঘরে সোফাই গা এলিয়ে দেয় রমা।

বাইকের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে কাজল। কোষ্ট ইজ ক্লিয়ার। গলির পথ ধরে এগিয়ে আসে কাজল। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে পা দিয়েই দেখে দু'হাতে চোখ ঢেকে সোফায় গা এলিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে রমা। মানসিক দ্বন্দ্বের আঁচ পাওয়া যায় সহজেই। ধীরে ধীরে পাশে বসে মৃদুস্বরে ডাকে, "মিষ্টি বৌ?" চম্‌কে ওঠে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সরে বসে রমা।

"মনমরা হয়ে বসে আছ যে বড় ?" দাদা কোথায় ?

"বাড়ী নেই—"

"রবিবারেও ? এত বড় একটা এচিভ্‌মেণ্ট ! কোথায় কথার ফুলঝুরি ঝরবে, চায়ের কাপে তুফান উঠ্‌বে ? কিন্তু কোথায় কি ? ঠিক যেন কন্যা বিদায়ের পর বিয়ে বাড়ীর দশা। সবাই বিমর্ষ, বিষণ্ণ, ক্লান্ত, অবসাদ গ্রস্ত। ব্যাপার কি বলো তো ?" কোন জবাব দেয় না রমা। একটু এগিয়ে এসে রমার হাতখানা তুলে নিয়ে মমতা ভরে হাত বুলাতে থাকে। বলে, "তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। ভয় পেয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজেকে কখনও একা ভেবো না। যত বড় দুর্দিনই আসুক জেনো আমি আছি তোমার পাশে সব সময়। মন খারাপ করে বসে থেকো না।" উঠে দাঁড়ায় কাজল। সম্বিৎ ফিরে পায়ে রমা বলে, "একী উঠ্‌লে যে ? কোথায় যাচ্ছ ? খেয়ে যাও, লুচি—"

"না, আজ থাক্‌। পরে এক সময় হ'বে। চলি, কিছু জরুরী কাজ আছে।" কাজল বেরিয়ে যায়।

কাজলের যাওয়ার পথে চেয়ে থাকে রমা। সত্যি বড় ভাল ছেলেটা। সত্যিকারের বন্ধু, আপনজন। মিছামিছি দু'একবার অন্যায় ভাবে আঘাত করে বড় ভুল করেছে। ছেলেটা যে ভাল বাসে তাকে তা' আর মোটেও অস্পষ্ট নয়। কিন্তু কি ভদ্র! না হলে কাল রাতে গাড়ীতে কি বাড়াবাড়ি করতো না ? করলে কি বাধা দিতে পারতো রমা ? দেহ-মনের অবস্থা তো স্বাভাবিক ছিল না মোটেই! কিন্তু কোন সুযোগ নেয়নি কাজল। এখানেই তার মহত্ব। প্রতিদানে কি দিতে পারে সে ? কিছুই না, শুধু বন্ধুত্ব। তার সব কিছুই তো গ্রাস করে বসে আছে দিবাকর। রাহুগ্রাস। এর থেকে মুক্তি নেই তার।

দিবাকর ফিরে এলো দুটোয়। চান করে খেতে বসে দিবাকর। রমা শোবার ঘরে বসে ছিল। খেতে বসে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে রমার জন্য কিন্তু কোন সাড়া পায় না। উঠে ডাক্‌তে গিয়েও পিছিয়ে আসে। গত রাতের বেদনাদায়ক অপমানের জ্বালা দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলে ছড়িয়ে সে উঠে পড়ে।

রমা প্রতীক্ষায় ছিল দিবাকরের আহবানের। কিন্তু বৃথাই সে প্রতীক্ষা। খেয়ে দেয়ে মুখ ধুয়ে দিবাকর যখন গেষ্টরুমের দরজা বন্ধ করে দিল। হতাশায় বেদনায় কাতর হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে রমা। খাওয়া হলো তার।

বিকেলে ক্লাবের সেক্রেটারী বিভূতিবাবু, ড্রামা সেক্রেটারী সুকুমার, ভৈরব এবং আরও দু'চার জন এলেন। আড্ডা জমে উঠ্‌লো। চা, খাবার পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরেই বসে ছিল রমা। কিন্তু ভৈরবের পীড়াপীড়িতে আড্ডার সামিল হতে হলো তাকে। শুরু হলো রমার প্রসংশা। রমার দৌলতে শুধু নগদ আড়াই হাজার টাকা লাভ করছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো এই ক্লাবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হলো এমন স্তরে, যা এই অঞ্চলের অন্যান্য ক্লাব বা সংস্থার পক্ষে একান্ত দুর্লভ। ড্রামা সেক্রেটারী সুকুমার যখন মাইক, লাইট, সেট সেটিং ও পর্দার জন্যে রমাকে ধন্যবাদ জানালো—সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠ্‌লেন। রমা হতভম্ব। তার ধারণা ছিল, এগুলি ক্লাবেরই সম্পত্তি। কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে রমাকে ইতঃস্তত করতে দেখে ভৈরব বলে ওঠে, "বারে এখন লজ্জা করলে চলবে কেন বৌদি ? ডিগবয় থেকে ফেরার পথে বাসে বসেই তো এগুলি ক্লাবের ড্রামা সেকসনে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। আপনার কথামতই ড্রামা সেকসনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিন্ আপনার রসিদ!" রসিদখানা হাতে নিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে দেখ্‌লো নির্বিকার চিত্তে বসে আছে দিবাকর। এই নিত্যনাট্যের ব্যাপারে যে তার কোন যোগাযোগ আছে, মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। বুঝতে পারে সবই দিবাকরের চাল, কিন্তু এতো সহজে কাবু হবে রমা ? বাচাল হয়ে ওঠে সে। বলে, "এই নৃত্যনাট্যের ব্যাপারে সব কৃতিত্ব শুধু আমারই তা মনে করার কোন কারণ নেই। উনি, ভৈরববাবু এবং তাঁর দলবল, ক্লাবের কর্ণধারদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অবদান রয়েছে যে সব মেয়েরা অংশ নিয়েছে তাদের, আর সেই যন্ত্রশিল্পী যাঁরা ক্ষতি স্বীকার করেও সহযোগীতা করেছেন বিনা স্বার্থে। এ ছাড়া আরও একজন আছেন যাঁর অবদান কখনই তুচ্ছ করা যাবে না, তিনি আমাদের স্নেহ ভাজন কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সহায়তা না পেলে এ নৃত্যনাট্য কখনই সফল হতে পারতো না। আমার মনে হয় ড্রামা সেকসনের কর্তব্য হ'বে তাঁকে সাদরে ক্লাবের সভ্য করে নেওয়া, যাতে এই সেকসনে একজন সত্যিকারের গুণীর মর্য্যাদা দিতে পারেন"—বল্‌তে বল্‌তে দিবাকরের দিকে তাকায় রমা। সারা মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে দিবাকরের। এই তো চেয়েছিল রমা—শঠে শাঠ্যং।

স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্ব কিন্তু কারুর নজরে আসে না। সবাই সমস্বরে রমাকে সাধুবাদ জানন। বিভূতিবাবু বলেন যে আগামী কাউন্সিল সিটিং-এ এই ব্যাপার নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হ'বে। দিবাকর নীরব।

এমনি করে ওরা ক্রমশঃ পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। দুজনেই এই দুঃসহ অবস্থার অবসানের জন্য উন্মুখ। দুজনই প্রতীক্ষা করে আছে অপর পক্ষ ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে এগিয়ে আসবে। একজন শুধু এক পা এগিয়ে এলেই অপর জন সাদরে তাকে টেনে নেবে। তাদের জীবনে এমন অস্বস্তিকর পরিবেশ এমন ভাবে দেখা দেয়নি কখনও। কিন্তু আত্ম-সম্মানের সু-উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে বসে দিন গুনে চলেছে দুজনেই। সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ, সেই আড়াল ভেদ করে এগিয়ে আসার।

কাজল তার দৈনন্দিন পরিক্রমা অব্যাহত রেখেছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছাড়া ছাড়া ভাব তার লক্ষ্য এড়ায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রমার মনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট নয় তার কাছে। স্বামী স্ত্রীর এই দ্বন্দ্ব গোপন রাখতে যেন সচেষ্ট রমা। সেদিনকার বাসের ঘটনার কোন ছাপ রমার মনে পড়েছে তাও স্পষ্ট নয়। রমা যেন এক প্রহেলিকা। বুঝতে পারে আরও কিছু আঘাতের প্রয়োজন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পর পর আরও দুখানা উড়ো চিঠি সে পাঠিয়েছে।

প্রথম চিঠিখানা এলো। সেই একই কাগজ, একই টাইপ। লিখেছে "আপনি কি জানেন গত ২৮শে অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যায় নাহারকাটিয়া ফেরি বোটে একটি কালো ছিপছিপে মহিলার সঙ্গে নিভৃতে ঘনিষ্ঠ আলাপে মগ্ন অবস্থায় মিঃ চৌধুরীকে দেখা গিয়েছিল? আপনি কি জানেন ঐ মহিলাকে? মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে মহিলার কি সম্পর্ক সে বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন কি? এ কথাও কি আপনি জানেন যে শহর এবং শহরের বাইরে এই মহিলার সঙ্গে মিঃ চৌধুরীকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কেন? এখনও সাবধান হোন—বন্ধু।" পুরানো কথা। প্রশান্ত সেদিন যা বলেছে এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু শহর ও শহরের বাইরে ওদের দেখা যাওয়ার কথাটা কেন জানি বিশ্বাস হয় না রমার, অথচ অবিশ্বাস করতেও পারে না।

কিন্তু এ চিঠির চেয়েও ভয়ঙ্কর দলিল হাতে এলো নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষের ইন্ধন যোগালো সেই ছোট্ট কাগজখানা। ধোপাকে কাপড় দিতে গিয়ে দিবাকরের শার্টের পকেট থেকে বার হলো। কাগজখানি তারই হাতে লেখা- "রিসিভড্ আ লেটার অব মরান ক্লাব —রমা চৌধুরী ফর দিবাকর চৌধুরী।"

দুয়ে দুয়ে চার। বুঝতে আর কিছুই বাকী থাকে না। ক্লাবের চিঠিখানা

আসলে জাল এবং তা দিবাকরেরই রচনা। কিন্তু উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য বোঝার বাকী আছে নাকি কিছু? উড়ো চিঠিগুলি, প্রশান্তের বিবৃতি। সবুজ-গাড়ী এবং ধুতি, চাদর, জুতো, জামা কি যথেষ্ট নয়?

নাঃ। আর নয়। এ পাপ সংসারে বাস করা অসম্ভব। দিবাকরের পতন হয়েছে। এখানে আর নয়। সে চলেই যাবে। বাপের বাড়ীতে আশ্রয় মিল্‌বে না? ওখানে গিয়ে ব্যবস্থা করে রেডিও, রেকর্ডে গান গেয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে, দীপুকে মানুষ করার প্রয়োজন হলে ভিক্ষে করবে, তবু পাপ অন্ন গ্রহণ করবে না সে। মনস্থির করে রমা।

কাজল সেদিন এলো বিকেলে। রমাকে দেখে বলে, "তোমার কি হয়েছে বলো তো?"

"আমার মন ভেঙ্গে গেছে কাজল। কিছুই ভাল লাগে না।"

"ব্যাপার কি? সব খুলে বলো, শুনি। সেদিন প্রশান্তের কথা নিয়ে দাদার সঙ্গে কথা বলেছ? কি বল্‌লেন তিনি—"

"না, তার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ ঘটনা চক্রে যা জেনেছি, তার চেয়ে বেশী কিছু জানাবার মত বিষয়বস্তু তোমার দাদার কাছে নেই, মিথ্যে কথার ঝুড়ি ওল্টানো ছাড়া।" "ঠিক বুঝতে পারছি না। আরও কি কেউ কিছু বলেছে তোমায়? আমি তোমায় ভালবাসি শ্রদ্ধাও করি। আমায় তুমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করতে পার। ভাল ছাড়া ক্ষতি হ'বে না তোমার—" কাজলের কথায় অভিভূত রমা। ছলছল চোখে বলে, "তোমাকেই সব বল্‌বো। আমি বড্ড একা কাজল! বন্ধু হয়ে পথের সন্ধান তুমি আমায় দিয়ো কাজল!" হাতেহাত রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে ওরা।

রমা বলে, "সামনা সাম্‌নি এসে কেউ কিছু বলেনি বটে, কিন্তু—" একটু থেমে রমা বলে—"দেখ্‌বে সে সব?" বুঝতে পেরেও না বোঝার ভাণ করে কাজল বলে, "কি দেখাবে বলো তো?"

"একটু অপেক্ষা করো"—বেরিয়ে যায় রমা। সুখেন কে দু'কাপ চা দিতে বলে শোবার ঘরে ঢোকে।

এক গুচ্ছ চিঠি হাতে নিয়ে রমা এলো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, "কয়েকটা উড়ো চিঠি পেয়েছি সেই পুজোর সময় থেকে। এতাদন ধারণা ছিল এগুলি আমাদের শাপমোচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হ'চ্ছে। তাই কোন মূল্য দিইনি। তাছাড়া—"। সুখেন এসে দু'কাপ চা এনে টেবিলে রাখে। সুখেন চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রমা, তারপর

বলে, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি নিজেই পড়ে দেখো।" চিঠিগুলি কাজলের দিকে এগিয়ে দেয়।

কি দেখ্‌বে কাজল? নিজের কীর্তি এই চিঠিগুলির প্রতিটি লাইন তার মুখস্ত। তবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিঠিগুলি পড়ার ভাণ করে সময় নিয়ে। এক সময় রমা বলে, "চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।"

"ওঃ হ্যাঁ", হাত বাড়িয়ে কাপ তুলে নেয় হাতে। চোখে মুখে গভীর চিন্তা ও যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়ে কাজল চিঠিগুলি রমাকে ফেরত দেয়। "কি বুঝলে?" ব্যগ্র জিজ্ঞাসা রমার।

"স্পষ্ট নয়, তবু মনে হয় একটা গোলমেলে জট পাকিয়ে উঠেছে। কিন্তু যাচাই না করে শুধু চিঠির উপর নির্ভর করলেও তো ভুল হবে।" "ভুল হ'বে? ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে। কিন্তু মজা কি জানো? তোমার দাদার হাবভাব কথাবার্ত্তা শুনে এক সময় মনে হয়েছিল—এ সবই কারুর বদমায়েসী। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"ডিগবয় যাবার আগে যা ঘট্‌লো এবং ডিগবয়ে প্রশান্ত যা বল্লো এরপর সন্দেহের আর কোন অবকাশই থাকে না।" "মানে? ঠিক বুঝতে পারছি না—"

"তোমার দাদা ডিসাংমুখে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হলেন। উনি বাড়ী ফিরে আসার আগেই মরান ক্লাবের চিঠি পেলাম। উনি না থাকায় মরান বাগানের পিওন চিঠিখানা আমায় দিয়ে গেল রসিদ নিয়ে। ডিগবয় শোব দিনেই মরান ক্লাবে মিটিং ডাকা হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলের বাগানগুলির মালপত্র আনা নেওয়ার কাজের জন্যে ওকে ঐ মিটিংএ উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছে।"

"সে তো সবাই আমরা জানি—"

"প্রশান্ত যা বল্লো তা তো জানো? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মরানের রাস্তা তো নাহরকাটিয়া ঘুরে নয়। তবে কেন ঘুরপথে গেলেন? সঙ্গে ঐ কালো ছিপ ছিপে মেয়েটিই বা কেন?"

"মেয়েটি কে? চেনো তাকে?"

"না, চিনি না। তবে অনুমান করতে পারি। প্রশান্ত যা যা বলেছে সেই সবুজ গাড়ী, ধুতি পাঞ্জাবী, শাল, সাদা স্লীপার সব মিলে গেল। সামাজিক কোন ব্যাপারে বা পুজোটুজো ছাড়া তো ধুতি পাঞ্জাবী পরেন না তোমার দাদা। সাহেবদের ক্লাবে বা বাগানে এ পোশাক পরে কোনদিন

তো তাকে যেতে দেখিনি—সেদিন ওভাবে গেলেন কেন? কিন্তু শুধু প্রশান্তের কথা নয়, আরও একটা প্রমাণ রয়েছে আমার হাতে সেটা এই। নিজের হাতে লেখা ও সই করা সেই চিঠি প্রাপ্তির রসিদখানা বের করে মেলে ধরে রমা। কাগজখানা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে রমার মুখের দিকে তাকায় কাজল।

"এখানা পেয়েছি তোমার দাদার পকেটে। মরান বাগানের পিওন নিয়ে গেল ওটা, চিঠি সঠিক ডেলিভারী দেওয়ার নিদর্শন স্বরূপ। কিন্তু তোমার দাদার পকেটে গেল কোন ভোজবাজীতে।" "হয়ত মিটিংএ ম্যানেজার ফেরৎ দিয়েছিল দাদাকে"। "দাদার হয়ে ওকালতি করতে হবে না। যদি ম্যানেজার ফেরৎ দিতেন রসিদখানা তবে তোমার দাদার সাদা গরম পাঞ্জাবীর পকেটেই ওটা থাক্‌তো। কিন্তু ওটা পাওয়া গেল ডিসাংমুখ ঘাট থেকে যে সার্ট পরে ফিরেছিলেন তারই পকেটে।" "সত্যি চিন্তার বিষয়ই বটে!"

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলে না। দীপুর মাষ্টারমশায় এলেন। দীপুকে পড়তে বসিয়ে রমা ঘরে ফিরে এলো। কাজল বলে, "এখন কি করতে চাও তুমি?"

"ভাবছি কোলকাতা চলে যাব—"

"সেটা কি ঠিক হ'বে? হয়তো কিছুদিনের মধ্যে এ মোহ কাটিয়ে উঠ্‌বেন দাদা। সেদিনের জন্য অপেক্ষা করা কি ভাল নয়?" ফুঁসে ওঠে রমা, "যা তা কথা বলো না কাজল। যা ঘটেছে এরপর এখানে থাকার কোন রুচি নেই আমার। ভিক্ষে করে খাব সে বরঞ্চ সহ্য হবে কিন্তু—" শেষ করে না কথাটা রমা। কাজল আঁচ পেয়ে গেছে। কাজ বারোআনা হাঁসিল হয়েছে। বাকীটা কমলাবৌদির দৌলতে হাসিল হ'বেই। মনের ভাব চেপে বলে, "ঠিক আছে। ক্ষুব্ধ হয়ো না। বল্‌ছি তো আমি আছি তোমার পাশে। শুধু একটু ভাবতে দাও তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ কিছু না করাই ভাল। পণ্ডিতেরা বলেন, 'সহসা বিদাধিত নঃ ক্রিয়াম্।' দুজনে মিলে ভেবে চিন্তে একটা পথ বার করা যাবে।"

দিন বয়ে যায়। সংসারের কাজ কর্ম যেমন চলছিলো তেমনিই চল্‌ছে। শুধু প্রাণহীন ভাবে। রান্না বান্না, মাজাধোয়া, খাওয়া-দাওয়া চলছে—কিন্তু নেই তাতে প্রাণের সাড়া। আপন ক্ষীণ কলকণ্ঠে ঘরটিকে মুখরিত করে তুলতে পারে না দীপু একা একা। ঝি চাকর কাজ করে যায় নীরবে। ওদের মনে সন্দেহ, কিছু ভয়। বুঝতে পারে হাওয়া অনুকূল নয়, চিড় ধরেছে সংসারের স্নায়ুতে।

এক টেবিলে বসেই স্বামী স্ত্রী খায়। কথা নেই, হাসি নেই, ঠাট্টা তামাসা নেই। সোজাসুজি একে অপরের দিকে তাকায় না। রাত্রে দু'ঘরে দুজনে চলে যায় রাতভোর মনের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরতে। দু'জনেই ভাবে খোলাখুলি আলোচনা করে এই অস্বস্তির অবসান দরকার। কিন্তু ভাবাই সার। যাই যাই করে কেউ এগিয়ে আসে না। আসল কথা বলা হয় না। ধীরে ধীরে একে অপরের নীরবতাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে শুরু করে।

নীরবতা ভঙ্গ অবশেষে রমাই করলো, একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর। মুখধুয়ে সেদিনে খবরের কাগজখানা নিয়ে দিবাকর যখন গেস্টরুমে ঢুক্‌তে যাবে তখন হঠাৎ বলে ওঠে, "আমার কিছু কথা ছিল।" "কি কথা ?"

"এক কথায় বলা যাবে না। সময় লাগ্‌বে—"

"বেশ তো এসো"— গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

"না, ওঘরে নয়। বাইরের ঘরে।" দিবাকর দিক পরিবর্তন করে বাইরের ঘরে চলে আসে। বড় সোফায় আয়াস করে বসে সিগারেট ধরায়। পাথর তবে গলেছে। খুশী খুশী ভাব দিবাকরের চোখেমুখে। রমা ঘরে এসে ঢোকে, হাতে তার একটা পুলিন্দা। ও পাশের কৌচে খাড়া হয় বসে পুলিন্দা থেকে একখানা চিঠি বার করে দিবাকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "পড়ো"। ডিগবয় থেকে ফেরবার পর প্রথম উড়ো চিঠি এটা। চিঠিখানা হাতে নিয়ে পড়ে। মনোযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে টেবিলে রেখে দিয়ে বলো, "সো হোয়াট ?" শাপমোচনের রিহার্সেলের সময় দুটো উড়ো চিঠি এসেছিল। আমি বলেছিলাম—আমাদের শাপ-মোচন বানচাল করতে ডাঃ মুখার্জীর চাল এই চিঠি দুটো। তুমি তা মেনে নাওনি। বলেছিলে, মুখার্জী নয় অন্য কেউ এর পেছনে আছে। এ কথাও তুমি বলেছিলে শাপমোচন শেষ হবার পরও এ ধরনের চিঠি আরও আস্‌বে। তোমার বোকামীতে সেদিন আমি হেসেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার কথাই ঠিক। চিঠি এখনও আস্‌ছে এবং হয়ত আরও আস্‌বে। আমার প্রশ্ন, "এমন সঠিক ধারণা তোমার মনে এলো কি করে ?"

"এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। কতকটা ইনটিউসন বল্‌তে পার। কেমন যেন সন্দেহ হলো—"

"সন্দেহ ? কি সন্দেহ ? কাকে সন্দেহ ?"

"দেখো একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হ'চ্ছে তোমার সঙ্গে আমার পূর্ব

নির্ধারিত প্রোগ্রামের হেরফের যখনই হয়েছে শুধু তখনই ঐ চিঠিগুলি এসেছে। ডাঃ মুখার্জীর তো আমাদের ভেতরের খবর জানার কথা নয়। তাই ওঁকে অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে। শাপমোচনের পালা শেষ হয়েছে। চিঠি হয়ত এখন আস্‌বে না কিছুদিন—"

"না, শেষ হয়নি। এরপরও এসেছে গত পরশু। এই দেখো—" মোটা একখানা খাম দিবাকরের দিকে এগিয়ে দেয় রমা।

চিঠিখানার মর্মার্থ হলো, আঠাশে অক্টো'র মরান ক্লাবে আদৌ কোন মিটিং হয়নি। কেন না সেদিনই ছিল ম্যাগনিক এসোসিয়েসনের জোড়হাট শাখা "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ২০৭১"-এর বার্ষিক অধিবেশন। যেহেতু মরান সার্কেলের প্রায় সব য়ুরোপীয়ান ম্যানেজারই 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া'র সদস্য তাই মরান ক্লাবের মিটিং ৪ঠা নভেম্বর ধার্য্য করা হয়েছিল, এবং এই মর্ম্মে ছাপানো নোটিশও বিলি করা হয়েছিল ক্লাবের মেম্বারদের। সেই নোটিশের এক প্রত্যায়িত কপি সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে,"এই পরিপ্রেক্ষিতে আটাশে অক্টোবর হনুমানবাবুর সবুজ গাড়ী নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন মিঃ চৌধুরী ডিগবয়ের অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে? নাহারকাটিয়া ডাকবাংলোয় কি? সঙ্গিনী সেই ছিপ্‌ছিপে তরুণীটিই বা কে? তরুণীটি সম্পর্কে কোন খবর রাখেন কি?"—বন্ধু।

চিঠি ও সারকুলার ভাল করে দেখে দিবাকর। চাপা ক্রোধ ও হতাশার চিহ্ন ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে। কাগজ ভাঁজ করে খামে পুরে টেবিলে রেখে বলে, "সবই তো ঐ একই ব্যাপার। মনে হয় অতঃপর আর কোন চিঠি অদূর ভবিষ্যতে তুমি পাচ্ছ না।" "কি করে বল্লে?" প্রশ্ন করে রমা। ম্লান হেসে দিবাকর বলে—"দুঃখের ব্যাপার হলেও এ চিঠিগুলি ব্যর্থ হয়নি। ফলে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে কোন প্রোগ্রাম আপাততঃ হচ্ছে না। তাই মাল মশলার অভাবে আপাততঃ চিঠি তাড়াতাড়ি পাবে না তুমি। তবে অন্য দিক্ থেকে আঘাত যে আস্‌বে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না"।"এই অপচেষ্টার পেছনে কার হাত আছে বলে তোমার মনে হয়?" "এই মুহূর্তে সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় চিঠিগুলি যে পাঠাচ্ছে সে আমাদের গতিবিধি ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পাচ্ছে।"

"তাকে কি চিনতে পারছো না।"

"না, এখনও ঠিক চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু মনে হয় আমাদের খুব চেনা-জানা কেউ হ'বে—"

"তবে তাকে ধরার চেষ্টা করছো না কেন?" আগ্রহের সঙ্গে রমা বলে। তার দীপ্ত মুখের পানে চেয়ে ভাললাগে দিবাকরের। দীর্ঘ বিরহের জ্বালায় দগ্ধ মন ফিরে পেতে চায় পুরোনো সেই দিনগুলি। সে হেসে বল্‌লো, "চেষ্টা করছি না কে বল্লো? তাকে ধরবো। ধরা সে পড়বেই। এতদিন ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার মধ্যে যে আত্মগোপন করেছিল ক্রমশঃ তার চেহারা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে—"

"সত্যি? বলো না গো, কে সে?" রমার কণ্ঠে পুরনো সুর বেজে ওঠে। খুসির জোয়ারে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে ওঠে দিবাকরের চোখ। ভাবে, না কিছুই হারায়নি। এই উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে রহস্য মাখা সুরে দিবাকর বলে, "এই মুহূর্তে তার নাম প্রকাশ করা ঠিক হ'বে না। যথেষ্ট প্রমাণ হাতে না এলে বেফাঁস কিছু বলে মানহানির দায়ে পড়তে হ'বে। ভয় নেই। ধরা সে পড়বেই এবং খুব শিগ্‌গীরই। আচ্ছা, তুমি নিজে কিছু আঁচ করতে পারছো না?"

"পারছি আর কই? পারলে কি এতদিন চুপ করে থাক্‌তুম? আর কিছু না হোক্ ভাল মন্দ কয়েক জোড়া স্যাণ্ডেল তো আমার আছে। তার এক পাটি না হয় নষ্টই হ'তো।" রমার কথায় মজা পায় দিবাকর। শব্দ করে হেসে বলে, "কিন্তু তোমার পক্ষেই তো তাকে চিনে নেওয়া সহজ রুমি।" সেই আদরের ডাক দিবাকরের। রোমাঞ্চিত হয় রমা, বলে, "সহজ নয় বলেই তো চিনে উঠ্‌তে পারছি না এখনও। কিন্তু না চিন্‌লেই বা ক্ষতি কি? আমার একটি প্রশ্নের জবাব পেলেই তো সব মিটে যায়—"

"কি তোমার প্রশ্ন?" দিবাকর বলে।

"আমার প্রশ্ন হলো এই চিঠি গুলির বক্তব্য কি একেবারেই মিথ্যে?"

রমার এই প্রশ্নে হঠাৎ যেন চুপসে যায় দিবাকর। যে সুর ও মেজাজ নিয়ে আলোচনা চলছিল হঠাৎ যেন তাল ভঙ্গ হলো তার। দিশাহারা দিবাকর। রমার আসল উদ্দেশ্য কি? একটা কূট সন্দেহের ছায়া গ্রাস করে দিবাকরকে। তবু তা অগ্রাহ্য করে নড়েচড়ে বসে দিবাকর বলে, "চিঠিগুলির বক্তব্য বিকৃত এবং অর্ধ সত্য নিশ্চয়ই। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন তুল্‌লে কেন তুমি?"

"সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে। কারণ তার উপরই নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যত—" ধীরস্থির কণ্ঠে বলে রমা যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে।

"তোমার ভবিষ্যৎ?" একটু থেমে দিবাকর বলে, "তুমি কি আমায় জবাবদিহি করতে বল্‌ছো?"

"যদি তাই মনে হয় তোমার তবে বল্‌বো, হ্যাঁ তাই। কারণ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি সেদিন মরান ক্লাবে তুমি যাওনি—"

"মরান ক্লাবে যাইনি? মানে?" উত্তেজিত হয়ে বলে দিবাকর।

"উত্তেজিত হয়ো না। শান্ত হয়ে সব শোন। আমন্ত্রিত হয়ে মরান ক্লাবে যাচ্ছ এই বিশ্বাসে, ডিগবয় রওনা হবার আগে তোমার ফ্ল্যানেলের ট্রাইজার, সার্ট, কোট, টাই, এমনকি তোমার জুতো বুরুশ করে, ধোয়া মোজা গুছিয়ে দিয়ে তোমায় দেখিয়ে দিয়ে গেলাম। কিন্তু আজও সেগুলি ঐ ভাবেই ওঘরে পড়ে আছে কেন? ধুতি, পাঞ্জাবী, শাল, সাদা গ্রীসিয়ান স্লিপার পরে গেলে কেন তুমি? ডিব্রুগড় থেকে সোজা পথে মরান যেতে নাহারকাটিয়া পড়ে কি? নাহারকাটিয়া ফেরীবোটে রেলিংএ হেলান দিয়ে কালো ছিপ্‌ছিপে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে মগ্ন অবস্থায় তোমায় লোকে দেখে কি করে?" বল্‌তে বল্‌তে উত্তেজিত হয়ে ওঠে রমা। আর সেই উত্তেজনার মুহূর্তে মুখ ফসকে বলে ওঠে, "আসলে বিশেষ গোপন কারণে মরানের চিঠি জাল করেছিলে তুমি।"

"জাল? চিঠি জাল করেছি আমি?" উত্তেজনায় পাংশুমুখ দিবাকর উঠে দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ। চিঠি জাল করেছ তুমি। প্রমাণ? তাও আছে। এক মিনিট দাঁড়াও।" উত্তেজিত রমা ছুটে বেরিয়ে যায়। লজ্জা, ঘৃণা, দুঃখে ম্রিয়মান দিবাকর। পাশার দান উল্টে গেছে।

ছুটে ঘরে ঢোকে রমা। চিরকুট খানা দিবাকরের সামনে মেলে ধরে বলে, "এইটে—"

"এটা? এটা কি?" কোণ ঠাসা বিভ্রান্ত দিবাকর যেন তোত্‌লায়।

"তোমার সার্টের পকেটে ছিল। ধোপাকে কাপড় দেবার সময় তোমার সার্টের পকেট থেকে বের হলো।"

নিজের কুকীর্তির জলজ্যান্ত প্রমাণ চোখের সাম্‌নে দেখে কুঁক্‌ড়ে গেল দিবাকর। এখন স্বীকার করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। সেইদিনই তো সে স্বীকার করতে তৈরী ছিল। তাই ইচ্ছে করেই ধুতি পাঞ্জাবী পরেই বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেদিন কোন সুযোগই রমা দেয়নি' অপমান করে ঘর থেকে বার হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। এখন এই পরিস্থিতিতে আসামী সেজে সব স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে নিজের আত্মসম্মানে প্রবল চাপ অনুভব করে দিবাকর। অথচ এ ছাড়া মিট্‌মাটের অন্য কোন উপায়ও নেই। দীর্ঘ দিন এই যন্ত্রণাময় ছন্নছাড়া জীবন যাপন করে সে ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত। যে

কোন মূল্যে এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসানের প্রয়োজনে নিজেকে প্রস্তুত করে দিবাকর।

কিন্তু বাদ সাধলো রমাই। দিবাকরের এই অসহায় অপ্রস্তুত ভাব এবং নীরবতা তার শেষ ভরসাটুকু যেন ছিন্নভিন্ন করে দিল। তীর্যক দৃষ্টিতে ঘৃণা ও বিদ্রুপ ছড়িয়ে বলে ওঠে সে, "কাক চোখ বুজে ঘরের চালে খাবার লুকোয়, ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও কেউ তা দেখ্‌তে পায়নি। তুমিও ভাবছো লুকিয়ে চুরিয়ে যে কীর্তি করে বেড়াচ্ছো দিনের পর দিন কারোর চোখে তা পড়েনি?" "কীর্তি? আমি? কি করেছি আমি?"

"না, সাধু পুরুষ। কিছুই করোনি তুমি! লজ্জা করে না কথা বল্‌তে? এরপরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেমন করে? জেনে রেখো তোমার কোন কিছুই আর গোপন নেই। যাক্ সব শেষ হয়ে গেল। দীপুর পরীক্ষার পরই আমি কোলকাতা চলে যাব। সব ব্যবস্থা করে দিয়ো। তোমার ঘরে বাস করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" বিষের জ্বালা ধরিয়ে বলে রমা। সহ্য করতে আর পারে না দিবাকর। মিটমাটের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "আমিও জানি—"

"কি জানো তুমি?" তীক্ষ্মস্বরে প্রশ্ন করে রমা।

"তোমার মন অন্যত্র বাঁধা পড়েছে"—বলেই আর দাঁড়ায় না, একরকম ছুটে বেরিয়ে গেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রমা ছুটে এসে তার পথ রোধ করে বলে, "এ কথার অর্থ?"

"তোমার ভাল করেই জানা আছে।"

"নিজে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ বলে বুঝি ভেবেছ সবাই তোমার মত?"

"আমি নই। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ তুমি। আর নির্বিবাদে যাতে সে জল খেতে পার, তারই জন্যে ষড়যন্ত্র করে এই সব অর্ধসত্য বিকৃত চিঠিগুলি পাঠাচ্ছ, তোমার সেই প্রেমিক প্রবরের যোগসাজসে। পথ ছাড়ো। তোমার কোলকাতার টিকিট হ'বে যাতে দীপুর পরীক্ষার পরই যেতে পার। ক'খানা লাগ্‌বে টিকিট?"

স্তব্ধ হয়ে যায় রমা। কি বল্‌ছে দিবাকর উন্মাদের মত? এই চিঠিগুলি ষড়যন্ত্র করে সেই পাঠাচ্ছে তার গোপন প্রেমিকের যোগসাজসে? গোপন প্রেমিক কে? কাকে সন্দেহ করে দিবাকর?

"কি বল্‌লে না, ক'টা টিকিট চাই?"

"দুটো, আমার আর দীপুর—"

"আর সে? সে যাবে না?"

"কার কথা বল্‌ছো তুমি? যা তা কথা বল্‌বে না তুমি।"

"যা—তা? হা,-হা-হা"—পাগলের মত প্রবল অট্টহাসি হেসে নির্দয় ভাবে রমাকে এক পাশে সরিয়ে গেস্টরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় দিবাকর হতবাক রমার চোখের সাম্‌নে।

কি হ্‌তে পারতো—আর কি হয়ে গেল! ঘরে ঢুকে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে দিবাকর। সে জানে, দরজার ও পাশে দাঁড়িয়ে রমা কাঁদছে। খুল্‌বে? খুলে জড়িয়ে ধরবে রমাকে নিজের বুকে? খুলে বল্‌বে সব কিছু? নতজানু হয়ে রমার ক্ষমা ভিক্ষা করবে? একটু আগে, কাজলকে জড়িয়ে যা বলেছে, তা প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইবে? সে জানে কথাটা সত্য নয়। আত্মরক্ষার খাতিরে মিথ্যে আঘাত করেছে সে। না, আজ রাত্রেই, এখনই এই দুসহ জ্বালার সমাপ্তি ঘটাবেই দিবাকর। দরজার ছিট্‌কিনিতে হাত দিতে না দিতেই শুন্‌তে পেলো শোবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছিটিকিনি দেওয়ার শব্দ শুন্‌লো সে। সব শেষ হয়ে গেল। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে দিবাকর।

স্তম্ভিতের মত বেশ কিছুক্ষণ গেস্টরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল রমা। এত বড় নিষ্ঠুর মিথ্যা নিয়ে বিদ্রূপ করে গেল দিবাকর কি করে? এ তো তার এতদিনের পরিচিত দিবাকরের কথা নয়! এ ক'দিনে এত পরিবর্তন হয়েছে দিবাকরের? এত নীচে নেমে গেছে যে নিজের অপরাধ ঢাকৃতে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হলো তাকে? তবু একটা প্রত্যাশা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। আশা ছিল বেরিয়ে এসে ওকে বুকে তুলে নেবে দিবাকর। কোনদিন কোন আঘাত তো করেনি দিবাকর! কিন্তু কোথায়? কোথায় এলো সে? একেবারে বদলে গেছে দিবাকর!

শোবার ঘরে এসে খিল দেয় দরজায়। চিঠি জালের প্রসঙ্গ একেবারেই তুলবে না বলে—সেই রসিদখানা নিয়ে যায়নি সে। কিন্তু কি যে হলো মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা প্রবল উত্তেজনার মুখে। হায়, এ ভুলটা না করলে এই দুর্বিসহ অবস্থার পরিবর্তন হ'তো আজই রাত্রে।

প্রেমিক বলে কাকে সন্দেহ করে দিবাকর? কাজল? হ্যাঁ কাজল ভাল বাসে তাকে তা মিথ্যে নয়। হাবে ভাবে নিজের মনের ভাব গোপন করেনি সে। কিন্তু সে নিজে? কাজলকে ভাল লাগে ঠিকই। কিন্তু সে কি ভালবাসা? কাজলের ঘন ঘন, যখন তখন আসা যাওয়া হয়ত দৃষ্টি সুন্দর নয়। বাইরের লোক কি ভাবে কে জানে? কিন্তু দিবাকরের মনে কোন বিরক্তি বা সন্দেহের আসন তো এতকালের মধ্যে

পায়নি রমা। সন্দেহ করার কোনো কারণও তো ঘটেনি তবে ?

চলে যেতেই হ'বে। বড় মুখ করে যখন একবার বলেছে তখন যেতেই হ'বে বইকি ? কিন্তু কি আশ্চর্য দিবাকর তো কোন বাধা দিল না। এর মানে কি দিবাকরও চায় যে সে চলে যাক্ ? বেশ তাই হ'বে। চলে যাবে সে এবং ফিরবেও না কোনদিন। আপনাকে নিয়েই সুখী হোক্ দিবাকর। দরজায় দরজায় ভিক্ষা করবে যদি দরকার হয়, কিন্তু দিবাকরের দয়া সে গ্রহণ করবে না জীবন থাকতে।

* * *

ওদিকে রঙ্গমঞ্চে আর একটি নাটক শুরু হয়ে গেছে নেহাৎ আকস্মিক ভাবে। নায়ক তারক, নায়িকা অপর্ণা। এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে টকি হাউসের সাম্‌নে রিক্সা থেকে নেমে টিকিট কাউণ্টারের পাশে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। উত্তম সুচিত্রার বই। কাউণ্টারের সাম্‌নে লম্বা লাইন। ফ্যাকাসে হয়ে যায় অপর্ণার মুখ। সহজেই বুঝতে পারে, লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারে এসে পৌঁছবার আগেই টিকিট ফুরিয়ে যাবে। অথচ সেদিনেই ছবিখানার শেষ রজনী।

একটি সুবেশ তরুণ কাছে এসে মৃদুস্বরে বলে, "লেডিস ক্লাস ফুল। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট পাবার আশা দুরাশা। ভীড় দেখেই বুঝতে পারছেন। ছবি দেখতে যদি চান ব্যাল্‌কনির জন্যে চেষ্টা করতে পারি। যাবেন ?" ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেটির দিকে তাকায় অপর্ণা। চিন্‌তে পারে। ক্যাবলাকান্ত তাদের পাড়ারই ছেলে, নাম তারক। পথে ঘাটে চল্‌তে ফিরতে লক্ষ্য করেছে, ছেলেটির দু'জোড়া চোখ সার্চ লাইট হয়ে তাকাই অনুসরণ করে প্রায় প্রত্যহ। মনে মনে হাসে অপর্ণা। কাছে পৌঁছবার সুযোগ পেয়ে কেমন স্মার্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে ! মুখে বলে, "ব্যালকনির টিকিট পাওয়া যাবে ?" ব্যাগ খুলতে খুলতে বলে, "কত দেব ?"

"টাকার কথা পরে। আগে দেখি টিকিট আছে কি না ?" অনায়াসে ভীড়ের মধ্যে 'ম্যানেজার' খোলা দরজা দিয়ে গলে যায় তারক। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলো সে। হাতে তার টিকিট। তুলে ধরে বলে, "হয়ে গেছে, চলে আসুন।" ব্যালকনির সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় তারক। এগিয়ে যেতে যেতে অপর্ণা বলে, "কত দিতে হ'বে ?"

"উঠে আসুন তো আগে, ভাল সিট যদি চান। টাকাটা পরেও দিতে

পারবেন। উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে শুরু করে তারক। অগত্যা পেছন পেছন অপর্ণাও এগিয়ে যায়।

তারকের এই অযাচিত সাহায্যকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না অপর্ণা। যখন তখন জানালায় দাঁড়িয়ে হ্যাংলার মতো ওদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখেছে ছেলেটিকে প্রায় নিত্য, প্রতিদিন। কাজলকেও ঘন ঘন ওর বাড়ীতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে দেখেছে সে। কাজলকে সে জানে, অন্য নামে কাজলও তাকে জানে। কাজলের কাছে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছে ছেলেটি। তাই, আজ একা এবং অসুবিধাজনক এই অবস্থায় পেয়ে ঘনিষ্ঠ হবার এই সুযোগ নিল সে। মুখে কিছু বলা যায় না। বিরক্তি চেপে রেখে ছেলেটির পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আপাততঃ।

ছবিশেষ হলো। পাশে বসে থাকা ছেলেটির দিক থেকে কোন রকম সাড়া বা কথা বলার চেষ্টা করতে দেখা গেল না। বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টির তোড়। লবিতে এসে বুঝতে পারে, শিগ্‌গীর এ বৃষ্টি ছাড়বে না। ছেলেটি পেছন ফিরে বলে, "ছাতা নেই সঙ্গে না? আচ্ছা, একটু দাঁড়ান।" মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে পথে নেবে যায়। কয়েক মিনিট পরে রিক্সা নিয়ে ফিরে এলো। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, "চলে যান, এক টাকা চেয়েছে। টাকা আছেতো?" বলেই থম্‌কে যায়। কথার রেশ টেনে বলে, "টাকা মানে এক টাকার নোট! দুটাকার নোট দিলে একটা আধলি বার করে, বুঝতেই তো পারছেন ওদের ট্রিক্‌স্।" না বেশ বুদ্ধিমান বটে ছেলেটি।

"কিন্তু আপনি যাবেন কেমন করে এই বৃষ্টির মধ্যে।"

"একটু অপেক্ষা করে দেখি। জল না ধরলে অগত্যা—" কথাটা শেষ করার আগেই অপর্ণা বলে, "কি দরকার? একই জায়গায় দুজন যাচ্ছি, তখন দুটো রিক্সা কেন? আসুন, রিক্সায় উঠে আসুন।" প্রতিদানের সুযোগ নিতে ছাড়ে না অপর্ণা।

স্বল্প চেনা বা সম্পূর্ণ অচেনা পুরুষের পাশে বসে রিক্সায় করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এই টুকু বয়সেই যথেষ্ট হয়েছে অপর্ণার। রিক্সার পর্দার আড়ালে কিংবা স্বল্পালোকিত নির্জন পথের আলো আঁধারিতে যা ঘটে, কিছুই অজানা নেই অপর্ণার। পুরুষ বলতে একমাত্র দাদাভাই ছাড়া আর কেউ তার দেহকে রেহাই দেয়নি। এই ছেলেটি নিশ্চয়ই সুযোগ নেবে আজ। এতে ভয় পায়না অপর্ণা। দরকার হলে প্রতিরোধ করবার সাহস তার আছে।

বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে পর্দা টেনে দিতে হলো। এখনই শুরু হ'বে—ভাবে

অপর্ণা। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোন ঘটনাই ঘট্‌লো না। বরঞ্চ দেখা গেল ভাঙাচোরা পথে রিক্সার ঝাঁকানিতে গায়ে গা ঠেকানো এড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ছেলেটি। অপর্ণার চোখে বিস্ময়। ছেলেটা কি ভীরু, না সত্যি সত্যিই ভদ্র?

শান্তিপাড়ার রেলগেট ছাড়িয়ে কিছুটা পথ আসার পর ছেলেটি রিক্সা থামায়। রিক্সাওয়ালার হাতে ভাড়ার টাকা গুঁজে, দিদিমনিকে বাড়ী পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে ঝিরঝিরি বৃষ্টির মধ্যে নেমে দাঁড়ায়।

'একি? শুধু শুধু ভিজছেন কেন? উঠে আসুন রিক্সায়"—অপর্ণা বলে।

"বৃষ্টি প্রায় নেই। আপনি এগোন। আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাড়ী পৌঁছে যাব"—

"বাড়ীতে কেউ দেখে ফেল্লে নিন্দে হ'বে সেই ভয়েই তো?"

"না, না, তা নয়। আপনার সম্মান এবং নানা অবস্থার প্রশ্নের হাত থেকে আপনাকে রেহাই দিতেই নেমে গেলাম এখানে"—

"কিন্তু টিকিটের দাম আর রিক্সাভাড়া?" পার্স খুলে অপর্ণা বলে।

"সখ করে একদিন আপনাকে সিনেমা দেখাতে পারি না আমি? রিক্সায় চড়াতে পারি না? বন্ধু হ'তে পারি না আমরা?"

"বন্ধু?" বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে বলে অপর্ণা।

"হ্যাঁ বন্ধু।"

"মনে থাকে যেন কথাটা" —বলেই এক গাল মিষ্টি হেসে, মুখ বাড়িয়ে অপর্ণা বলে, "বন্ধুরা কিন্তু আপনি আজ্ঞে করে কথা বলে না—"

"তোমার বলার অপেক্ষায় ছিলুম। ধন্যবাদ। রাত হয়েছে আর দেরী করোনা। আবার দেখা হ'বে কেমন? আমার নাম তারক, তারক সরকার। ডাকনাম বাচ্চু। মনে থাক্‌বে?"

"কেন থাকবে না? আমার নাম অপর্ণা। অপু বলে ডাকে সবাই।" চলন্ত রিক্সা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে অপর্ণা।

যেদিন দিবাকর ও রমা পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল, সেই দিনই মাইজান স্পারে তারক ও অপর্ণার মধ্যে ভাসবাসার সেতু রচনা হলো।

সেই সিনেমা দেখার পর বেশ কয়েকবারই ওদের দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়েছে। আরও কয়েকটা সিনেমা দেখেছে দু'জনে। রেঁস্তোরায় নিরালা কোণে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসেছে ওরা কয়েকবারই। ওরা কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

শুরু থেকেই তারক অপর্ণার প্রতি আকৃষ্ট। যাকে বলা যায় 'লাভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট।' প্রথম পরিচয় থেকেই ভদ্ররুচি ও শালীনতা বোধ তারককে অপর্ণার চোখে মূল্যবান করে তুলেছে। এমনি করে কখন যে তারক তার দিনরাত্রির ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে অপর্ণা নিজেই তা জানে না। আর তাই, এক কথায় তারকের অনুরোধে মাইজান স্পারে যেতে আপত্তি করেনি।

স্পারের ওপর পাড় ঘেঁসে বসেছিল ওরা দুজন। দিনশেষের সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়েছিল ওদের চোখে মুখে। শুধু দেহ নয়, মনও রাঙিয়ে দিয়ে ছিল দুজনার। অপর্ণার চোখে চোখ রেখে এক সময় অপর্ণার একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আপনার মনেই ডেকেছিল, 'পর্ণা'। শিউরে উঠে অপর্ণা। তারকের হাতখানা দুহাতে আঁকড়ে ধরে সে। পর্ণা —কি মিষ্টি নাম, এনামে তো কেউ কোনদিন ডাকেনি তাকে ?

"পর্ণা" আবার ডাকে তারক।

"বলো" মৃদুস্বরে সাড়া দেয় অপর্ণা।

"পর্ণা' কদিন ধরেই কথাটা বল্‌বো বল্‌বো করছি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না, সুযোগও পাইনি। আজ সে কথা বল্‌তেই এখানে ডেকে এনেছি তোমায়।"

"আমি জানি, কি বল্‌তে চাও তুমি। কিন্তু আমি যে তোমার ভালবাসার যোগ্য নই—"

"কে বল্লে ? আমার ভালবাসার যোগ্য নও তুমি ? নিজেকে কতটুকু চেনো তুমি ? শোন শুধু ভালবাসা নয় তোমায় চিরকালের জন্যে নিজের করে নিতে চাই আমি। তুমি কি পারবে সব সামাজিক, পারিবারিক বাধা নিষেধ তুচ্ছ করে আমাকে গ্রহণ করতে ?"

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে অপর্ণা। কি জবাব দেবে সে ? কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে তার দেহ। বোঝা যায় প্রবল কান্নার বেগ বুকে চেপে ধরে রেখেছে সে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে থেকে তারক বলে, "কিছু বল্‌বে না তুমি ?"

"না, না, আমায় তুমি চেয়ো না। ওভাবে চেয়ো না। আমি—"আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে অপর্ণা। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায় শেষ করতে পারে না কথাটা। একবার অপর্ণার দিকে তাকিয়ে দিগ্‌চক্রবালের দিকে শূণ্য দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারক। তারপর কোন কথা না বলে, ধীরে ধীরে স্পারের অপর প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

নিজের দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে ছিল অপর্ণা। চোখের জলে

দৃষ্টি তার ঝাপসা, কান্নার আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ, মন ভারাক্রান্ত দুঃসহ বেদনায়। যে ক'জন পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিল সে, তারা কেউ ভালবেসে কাছে আসেনি। এসেছিল যৌন ক্ষুধা মেটাবার তাগিদে। ওর মনের দুয়ারে করাঘাত করেনি কেউ, ওর যৌবনকে চট্‌কে চট্‌কে উপভোগ করেছে অর্থের বিনিময়ে দেহ সম্ভোগই ছিল ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মনের খোঁজ নিতে বয়েই গেছে তাদের।

আর বাচ্চু? এই তারক? জানালার আড়াল থেকে চোরের মত উঁকি ঝুঁকি দিয়ে তাকে দেখ্‌বার কসরৎ করতো। ভাল লাগেনি অপর্ণার। মনে হয়েছিল ছেলেটি পাজী, বদমাস, উদ্দেশ্য ভাল নয় মোটেও।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য। সুযোগ পেয়েও স্পর্শ করা দূরে থাক, কোনো নোংরা রসিকতাটুকুও করেনি ছেলেটি। আজ সে-ই প্রথম অদ্ভুত সুন্দর নাম ধরে ডাক্‌লো তাকে। যে নামে কোনদিন ডাকেনি তাকে কেউ। সে-ই জীবনে প্রথম ঘর বাঁধবার দাবী নিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু কি করে সে ডাকে সাড়া দেবে সে? সেও যে ভালবাসে বাচ্চুকে। কি করে এই অপবিত্র দেহ তার পরম ভালবাসার ধনকে উপহার দেবে সে? তা কি কখনও হয়?

মাথা তুলে, আশেপাশে বাচ্চুকে না দেখে ভীত, চঞ্চল হয়ে ওঠে অপর্ণা। বাচ্চু কি তবে চলে গেল? ওকে একা ফেলে চলে গেল? উঠে দাঁড়িয়ে সাম্‌নের দিকে তাকাতেই ভয়ে চম্‌কে ওঠে। কী সর্বনাশ, স্পারের শেষ প্রান্তে মাঝ নদী বরাবর বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাচ্চু। আর দাঁড়ায় না। ছুটে গিয়ে বাচ্চুর হাতখানা ধরে টেনে এপাশে নিয়ে এসে বলে, "একি পাগ্‌লামি করছো বাচ্চু? জানো না, ওদিকে যাওয়া নিষেধ? বোর্ডে লেখা রয়েছে পড়োনি?"। উদ্‌ভ্রান্ত চোখ মেলে ওর দিকে তাকায় বাচ্চু। কোন কথা বলে না। তারকের হাতখানা নিজের দু'হাতে চেপে ধরে বলে, "রাগ করেছ?" "রাগ? কার ওপর? ওসব কথা থাক্‌। দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলো বাড়ী পৌঁছে দিই"। "না, একটু দাঁড়াও"। তারপর মিনতিমাখা সুরে বলে, "বলো না গো তুমি রাগ করছো?" "রাগ? কার ওপর রাগ করবো? অধিকার যেখানে নেই—"

"ও ভাবে কথা বল্‌ছো কেন?" উতলা হয়ে বলে অপর্ণা।

"আমায় ক্ষমা করো অপর্ণা। মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে অন্যায় করেছি—"

"না, না, অন্যায় করোনি তুমি। তোমাকে ফেরাতে বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে

আমার। কিন্তু কি করবো আমি ? আমি, আমি, আমি যে নষ্ট, একেবারে নষ্ট।" হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে অপর্ণা। আঁৎকে ওঠে তারক। সবলে অপর্ণার ডানহাতের কব্জি চেপে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "নষ্ট ? কবে থেকে নষ্ট ? কে তোমায় নষ্ট করেছে ? তোমার সোহাগের দাদাভাই ? দিবাকর চৌধুরী ?" বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মত চমকে উঠে অপর্ণা। দলিত ফণীনির মত ফুঁসে হিস্ হিস্ করে বলে, "হাত ছাড়ো। যা তা কথা বলো না। যাঁকে জানো না, চেনো না, তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করো না।"

"রাখো, রাখো আর উপদেশ দিতে হ'বে না। অনেক কথাই শুনেছি। সহরের অনেকেই জানে। তবু মনে হ'য়েছিল হয়ত বা রটনা—" হিংস্র সুরে বলে বাচ্চু।

"কি শুনেছ তুমি ?" প্রবল উত্তেজনায় যেন হাঁপাচ্ছে অপর্ণা।

"অনেক কথা। গভীর রাতে মত্ত অবস্থায় দু'জনে জড়াজড়ি করে রিক্সা করে বেড়ানো। নির্জন দুপুরে খালি বাড়ীতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকা। আর কত শুনতে চাও ?"

"থামো। ছিঃ ছিঃ এই মিথ্যে খবরগুলি কে দিল তোমায় ?"

"নাম বল্লেই চিনতে পারবে ?"

"প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে কি পার পাবে ? তুমি না বল্লেও বুঝতে মোটেই অসুবিধা হচ্ছে না ? ঐ যে কালো মতন এক ভদ্রলোক তোমার কাছে আসেন প্রায়ই—কাজল বাবু—তিনিই তো ?"

"ওঁকে তুমি চিনলে কি করে ?"

"সে কথার জবাব পরে দেব। শুধু বলো আমার অনুমান ঠিক কিনা ? কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে নির্জন দুপুরে আমাদের বাড়ীতে কি ঘটেছিলো, তিনি তা দেখলেন কি করে ?"

"শুধু তো কাজলদাই নন, কমলা বৌদি—।"

"বাঃ বাঃ চমৎকার ! কাজলদা, কমলাবৌদি"—কেটে কেটে বলে অপর্ণা দাঁতে দাঁত চেপে। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে বলে, "শুধু এইটুকুই শুনেছ ? আর কিছু নয় ?"

"শোনার আর কি বাকী আছে ? দিবাকর চৌধুরী তোমাদের পরিবারের জন্যে কত কি করেছেন। প্রতিদানে কিছু নেবেন না ? ঘরে সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী থাক্‌লেই বা কি ? বড়লোকের একটা দুটো উপপত্নী থাকে না ? রাতদিন এত খাটাখাটনীর পর একটু আমোদে প্রমোদে স্ফুর্তি করবেন না ? আমার চেনা আগের সেই দিবাকর চৌধুরী তো আর নেই !

হালে দিবাকর চৌধুরীর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে আকাশ ছোঁয়া হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে টাকার গদীর ওপর বসে আছেন তিনি। নিয়মের ব্যতিক্রম তো হ'তে পারে না। হাতের ধারে আছো তুমি—সহজ শিকার। রক্ষকই তো ভক্ষক হয়।"

"চুপ করো। দাদাভাইকে নিয়ে মস্করা করো না। পরের মুখে ঝাল খেয়ে কোন কথা বলো না তাঁর সম্বন্ধে। কতটুকু জানো তুমি দাদাভাইকে? বুঝতে পারছি এ সবই তোমার পরম বন্ধু কাজলদার শ্রীমুখের বাণী। কিন্তু আর কিছু বলেননি তিনি?"

'আর কি বল্‌বেন?"

"কেন? আমার সম্পর্কে? বলেননি আমি চরিত্রহীন? পয়সার বিনিময়ে দেহ দান করি? বলেননি কোন একদিন ডাক বাংলোয় এক পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমায় দেখছেন? বলেননি সে কথা? এক সুন্দরী মহিলার ফটো সেই পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারকে দেখিয়ে কি বলে-ছিলেন?"

অপর্ণার কাটা কাটা কথাগুলি শুনতে শুনতে উত্তেজিত তারক মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। দু'হাত দিয়ে অপর্ণার দুই কাঁধ খামচে ধরে বলে, "কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মতো?"

"সত্যি কথাই বলছি। তোমার কাজলদার যদি সাহস থাকে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে বলো—"। অন্ধকার তারা ভরা খোলা আকাশের নীচে ওরা দাঁড়িয়ে. চোখে চোখ রেখে নীরবে। একসময় ভেঙ্গে পড়ে অপর্ণা। প্রবল কান্নার বেগে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে তারকের পায়ে। ভাঙ্গা গলায় বলে, "বিশ্বাস করো, সত্যি আমি নষ্ট, একেবারে নষ্ট। কিন্তু দাদাভাই এর জন্যে কখনও দায়ী নন। আমাদের এই সংসারে দাদাভাইয়ের আবির্ভাব যদি আরও তিনমাস আগে ঘটতো তবে এই দুর্ভাগ্য কখনই ঘটতো না। তোমার কাজলদাও এজন্যে দায়ী নন্। দায়ী আমাদের দারিদ্র্য আর আমার পোড়া অদৃষ্ট। শুনবে? আমার সেই অধঃপতনের কাহিনী?" ওর পাশে বসে পড়ে, ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে তারক বলে, "বলো, বলে যদি একটু শান্তি পাও।"

ধীরে ধীরে নিজের জীবনের নোংরা অধ্যায় সবই খুলে বলে সবিস্তারে। কি করে এই নোংরা পাপচক্র থেকে দাদাভাই তাকে মুক্ত করলেন। সে কথাও বলতে ভুলে না অপর্ণা। চিত্রাপিতের মত একমনে সব শোনে তারক। অভাবনীয়, অকল্পনীয় সব ঘটনা। বলা শেষ হলে নড়েচড়ে বসে অপর্ণা

বলে, "এই হলো আমার জীবনের ইতিহাস।" উঠে দাঁড়ায়, ম্লান হাসি হেসে বলে, "তোমার মোহ কেটেছে তো?" তারপর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, "চলি কেমন? হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা—।" পেছন ফিরে তীরের দিকে এগিয়ে যায় অপর্ণা। ছুটে আসে তারক, পথরোধ করে বলে, "না, তুমি যাবে না।" দুহাত বাড়িয়ে অপর্ণাকে বুকে চেপে ধরে বলে, "তোমায় যেতে দেবো না। তুমি আমার, শুধু আমার-ই। শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দাও, বলো, তুমি কি পারবে সব বাধা তুচ্ছ করে, সমাজ সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে আমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে?"

"বাচ্চু—" দুহাত দিয়ে তারকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে অপর্ণা। "বলো, বলো অপর্ণা তুমি পিছিয়ে যাবে না তো?"

"সব শুনেও তুমি আমায় চাও?"

"চাই। তোমায় ভালবেসে ছিলাম। সে ভালবাসা আরও গাঢ় হলো তোমার অকপট সত্য ভাষণে। কে বলে তুমি নষ্ট? তুমি শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর। তোমার পারিবারিক দৈন্য ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ওরা যা করে গেল, সে তো বলাৎকার। এ দুর্ঘটনা এড়াবার শক্তি তো তোমার ছিল না।"

অপূর্ব আনন্দ অনুভূতিতে স্বপ্নময় মনে হয় সব কিছু। তারকের মহানুভবতা অভিভূত করে তোলে অপর্ণাকে। পরম নির্ভরতায় দু'হাতে আঁকড়ে ধরে তারককে।

ওদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হলো। তখনই একদিন তারকের রাঙাদা ও রাঙাবৌদির কথা ওঠে। তারক বলে পঞ্চাশ সালে তার সর্বকনিষ্ঠ সাকরেদ তারকের পিঠ চাপড়ে রাঙাদা দিবাকর বলেছিলেন, "মনে সাহস রাখিস্ বাচ্চু। অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে কোনদিন যেন ভয় পাস্‌নে। সত্য ও ন্যায়ের জন্যে সব কিছু, এমনকি নিজের জীবনও যদি দিতে হয় দিবি নির্ভয় চিত্তে। কখনও পিছিয়ে যাবি না। মানুষের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, দেশের কল্যাণের কাছে প্রাণের দাম কতটুকু? নেতাজীর আদর্শ সাম্‌নে রেখে চল্‌বি। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস কোনদিনও নয়।" সেদিন থেকেই রাঙাদা তার আদর্শ। কিন্তু হঠাৎ হলো ছাড়াছাড়ি। তারককে যেতে হলো কোলকাতা। সেখানে পড়াশুনা শেষ করে মেশোমশায়ের সুপারিশে এই ব্যাঙ্কের চাকরী। প্রথম বৎসর কোলকাতা, পরের দুটো বৎসর জলপাইগুড়িতে কাটিয়ে এবারই এপ্রিলমাসে চেষ্টা চরিত্র করে ডিব্রুগড় বদলী হয়ে এসেছে। তদ্দিনে নতূনবাড়ী বানিয়ে চলে গেছেন

রাঙাদারা শান্তিপাড়া ছেড়ে। মাঝে মাঝে পথে ঘাটে দেখা হয়, কিন্তু রাঙাদা বোধহয় চিনতে পারেন না। কতকটা সঙ্কোচ, কতকটা বা অভিমানে, নিজে থেকে পরিচয় দিতে পারেনি তারক। এরপর কাজলের প্ররোচনায় সে রাঙাদাকে রীতিমত ঘৃণা করতে শুরু করেছিল।

মাস কয়েক আগে, কাজলের সঙ্গে পরিচয় হয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম উপলক্ষ্য করে। ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়ায়। সুদর্শন চেহারা, কথাবার্তায় পটু সুতরাং ভাব জমতে দেরী হয় না। ছ'মাস আগে, কথায় কথায় সাম্‌নের বাড়ীর মেয়েটির প্রতি এক তরফা ভালবাসার কথা ফাঁস করে ছিল কাজলের কাছে। শুনে আঁৎকে ওঠে কাজল বলে, "সর্বনাশ, করেছ কি? ভুলে যাও হে, ভুলে যাও। এ মেয়ের ধারে কাছেও যাবার সাধ্য তোমার নেই। ব্যাঙ্কের কেরানী, কেন হাত বাড়াচ্ছ আকাশের চাঁদের দিকে। শ্রীমতী তো শোনা যায় সহরের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাগরিকের প্রেমাস্পদী।" তখনই রাঙাদাকে জড়িয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। কাজলকে অবিশ্বাস করতে পারেনি সে। কাজলের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। সময় বুঝে সে সময়ই ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু হলো রাঙাদার অপর্ণাদের বাড়ীতে, সুতরাং দুয়ে দুয়ে চারের হিসেব মিলে যায় সহজেই। কাজলদা দুঃখ করতেন রাঙাবৌদির জন্য, বলতেন, "আহা এই অপরূপ সুন্দরী মহিলা হয়ত কল্পনাও করতে পারেন না, কোন চুলোয় মাথা মুড়িয়েছেন তাঁর গুণধর স্বামীরত্নটি।"

অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না, তবু রাঙাবৌদিও রাঙাদার সংসারে সুখ ছিল, আনন্দ ছিল, হাসি ছিল আর ছিল গান। কি চমৎকার গান গাইতেন রাঙাবৌদি। মনে পড়ে সেই শোকবিহ্বল দিনটির কথা, যেদিন চার মাসের মেয়েটি মারা গেল। সে করুণ দৃশ্য আজও চোখে ভাসে। ঘরে শোকে অচেতন রাঙাবৌদিকে পাড়ার মহিলাদের জেপাজতে রেখে, ফুলের মত নরম, সুন্দর সেই শিশুটিকে বুকে নিয়ে চলেছেন রাঙাদা ব্রহ্মপুত্রের চর ভেঙ্গে। সঙ্গে তারক এবং আরও কয়েকজন। ব্রহ্মপুত্রের চরে সেই নরম দেহখানি পরম যত্নে সমাহিত করে, সেই সমাধির উপর আছড়ে পড়ে রাঙাদার সে কি কান্না। ঐ একদিনই কান্না দেখেছিল রাঙাদার।

এই ঘটনার মাস দুয়েক পরই কোলকাতা চলে যায় তারক তার বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর। যাবার বেলা ছলছল চোখে তার হাতখানা ধরে রাঙাবৌদি বলে ছিলেন, "হনুমান, কোলকাতা গিয়ে ভুলে যাবি না তো

তোর রাঙাবৌদিকে ?" "কক্ষনো না, তারক বলেছিল, পাস করে ফিরে আসবো। আবার তোমার সঙ্গে একপাতে বসে খাবো।" সেই রাঙাবৌদিকে রাঙাদা এ ভাবে প্রতারণা করবে, অপমান করবে, সইতে পারে না তারক। এদিকে যে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে রাঙাবৌদির এই হেনস্থা সেই মেয়েটিও তারই মানসী। শুরু হলো রাঙাদার ছল চাতুরী বানচাল করার জন্যে শলা পরামর্শ আর তারই ফলে শুরু হলো রাঙাবৌদির কাছে উড়োচিঠি পাঠানো, কাজলেরই পরামর্শে।

"উড়ো চিঠি ? সে আবার কি ?" প্রশ্ন করে অপর্ণা।

"বেনামী চিঠিকে উড়ো চিঠি বলে। রাঙাবৌদিকে জানিয়ে দিতুম, কবে, কখন তোমায় নিয়ে রাঙাদা কোথায় গেলেন। গাড়ীর নম্বর পর্যন্ত দেওয়া হ'তো। উদ্দেশ্য ছিল চিঠি মারফত সব জেনে রাঙাবৌদি এমন ব্যবস্থা নেবেন যে রাঙাদা বাধ্য হয়ে তোমার পেছন নেওয়া ছাড়বেন। অবশ্য নির্ভেজাল সত্য কথা বলা হ'তো না কোন সময়ই। তুমি তো আর একা রাঙাদার সঙ্গে যাওনি ? সঙ্গে তোমার বাবা বা মা একজন থাকতেনই। আমরা তা উল্লেখ করতাম না—যাতে রাঙাবৌদি গুরুত্ব দেন। কাজলদা অবশ্য আমায় বুঝিয়ে ছিলেন যে বাবা মার যোগ-সাজসেই, বিশেষ উদ্দেশ্যে রাঙাদার এভাবে ঘন ঘন তোমায় নিয়ে বাইরে যাবার পরিকল্পনা। শুনে আমি বেশ ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম।"

"ছিঃ ছিঃ কি অন্যায় করেছ তুমি, তা জানো না—"

"বারে, আসল ব্যাপারটা তখন জানতুম নাকি আমি ? নিজের জ্বালায় জ্বলছি আমি। যা বোঝানো হচ্ছে তাই বুঝছি। তখন তো তুমি পাশে ছিলে না ? কাজলদা শুধু বোঝাচ্ছে এই ধূমকেতু যতদিন আছে ততদিন তুমি দূর অস্ত। দীর্ঘ দিনের অদর্শনে রাঙাদার ইমেজ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেই রাঙাদাকে কোথায়ও দেখতে পেলাম না। মালকোঁচা মেরে সার্ট গায়ে ভাঙ্গা সাইকেলে করে যিনি এখানে ওখানে যাওয়া আসা করতেন তিনি কোথায় ? রাঙাদা আর সেই রাঙাদা নেই। বিত্তবান বিশিষ্ট নাগারক তিনি। থাকেন পশ্ এলাকায়। কানের ধারে কাজলদা ক্রমাগত কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছেন। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আমার যত আক্রোশ সব রাঙাদার উপর চেপে বসলো।

"বুঝলাম। কিন্তু চিঠিগুলি পাঠানোর ফলাফল কি দাঁড়াল ?"

"স্পষ্ট বোঝা গেল না। সব যেমন চলছিলো তেমনি চলছে। কোন কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না। কেন না, এই তো সেদিন কাজলদা

কমলাবৌদিকে বারবার বোঝাচ্ছিলেন আর দেরী না করে তার প্রত্যক্ষ করা ঘটনা অবিলম্বে রাঙাবৌদিকে যেন জানিয়ে দেন।"

"সর্বনাশ, তোমার কমলাবৌদি বলেছেন সেকথা?"

"বোধহয় না।"

"দ্যাখ, তোমার ঐ 'হয়ত', 'বোধহয়' কথাগুলি শুনতে একটুও ভাল লাগছে না। আর ঐ শয়তানটাকে কাজলদা বলে আর কক্ষনো আমার সাম্‌নে বলবে না।"

"তথাস্তু দেবী। ঐ শয়তানটাকে আজ থেকে কেলো বলে ডাক্‌বো, কেমন?"

"ঠাট্টা রাখো। শোন, চিঠিগুলিতে কি লেখা ছিল মনে আছে?"

"না, মনে নেই বটে তবে চিঠিগুলির খসড়া এবং টাইপকপিগুলি আমারই দেরাজে পড়ে আছে। কাল তোমায় দেখাবো।"

"চিঠিগুলি তুমি লিখেছ?"

"আরে না না। টাইপ মেসিনটা শুধু আমার। চিঠির খসড়া ও টাইপ করেছে ঐ কেলোটা নিজে—"

"ওঠো, বাড়ী চলো। ওগুলি এখুনি ওখান থেকে সরাও। না, না, ওগুলি আমায় দাও।"

"কেন? কি হলো? হঠাৎ সিরিয়াস্ হয়ে উঠ্‌লে যে?"

"ঐ শয়তানটাকে তুমি চেনো না। পরের হাতে হুঁকো রেখে টান্‌তে ওস্তাদ। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ভুজুং-ভাজং দিয়ে তোমায় দলে টেনেছে। ওর লক্ষ্য তোমার রাঙাবৌদি।"

"রাঙাবৌদি?"

"হ্যাঁ, রাঙাবৌদি! কেমন করে জানলাম? শোন তবে—।"

সেই পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কাজলের কথাবার্তা। রমার ফটো দেখিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলা, 'এই অপূর্ব সুন্দরী নারীরত্ন থাক্‌তে অন্য কোন নারীতে তার স্পৃহা নেই।' অপর্ণা বলে চলে, "সেই তোমার কমলা বৌদির প্রত্যক্ষ দর্শনের ব্যাপারটা জানো? যে দাদাভাইকে বৌদির কাছে হেয় ও ঘৃণ্য করে তুলতে চাইছে কাজল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সেই দাদাভাইয়ের কাছে আমি আমার জীবনে প্রথম প্রচণ্ড চড় খেয়েছিলাম, কেন জানো? কাজল সম্পর্কে একটু মন্তব্য করে তাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে না দিতে আমি অনুরোধ করেছিলুম। পাশের ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিলুম। আঘাত যত না পেয়েছিলুম শরীরে, তার দ্বিগুণ ব্যথা পেয়েছিলুম মনে।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে বিছানায় লুটোপটি খাচ্ছি আর কাঁদছি। চড়টা হঠাৎই মেরেছিলেন দাদাভাই। তারপরই তাঁর সম্বিত ফিরে এলো। পাশের ঘরে এসে বিছানায় আমার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিছিলেন আর কাতর কণ্ঠে বল্‌ছিলেন, 'আমায় ক্ষমা কর্‌, ক্ষমা কর্‌ ভাই।' সেই মুহূর্তেই কমলা মাসী, মানে তোমার কমলা বৌদি এলেন—দেখলেন। এই হলো প্রত্যক্ষ ঘটনা।"

"তাই ? কি সর্বনাশ—? ভদ্রমহিলা তো ভীষণ ডেন্‌জারাস্‌ ?"

"সে তো ঠিকই। শোন তোমার কেলোর কীর্তি। বৌদিরা ডিগবয় যাবার আগের ঘটনা।

সেদিন রিহার্সেল ছিল না। দাদাভাই আর প্রফুল্লদা সন্ধ্যের সময় আমাদের বাড়ীতে আমার বিয়ের নতুন সম্বন্ধ নিয়ে মা বাবার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন। হঠাৎ কি মনে হলো আমার চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম। দৌড় দৌড় দৌড়। পৌছুলুম গিয়ে দাদাভাইয়ের বাড়ীতে। বৌদি আর শয়তান গানের রিহার্সেল দিচ্ছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি তাদের দেখছিলুম। শয়তানটার চালচলন কথাবার্তা কেমন জানি লাগ্‌ছিলো! রিহার্সেল তো নয়, হাসি মস্করা চল্‌ছিল। বৌদিও কেমন জানি লোকটাকে বেশ আস্কারা দিচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছিল। মনে মনে ভয় হয়েছিল আমার। এখন তোমার কথা শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। বৌদিকে নিজের কব্জায় আনতে পারেনি বলেই তোমার কমলাদির দ্বারস্থ হয়েছে বদমাসটা।"

শুনে চক্ষু চড়কগাছ তারকের, বলে, "এখন কি করা যায় বলো তো ?"

"দেরী না করে ঐ কাগজপত্রগুলি দাদা বৌদির হাতে তুলে দিতে হ'বে।"

"কিন্তু দেবেটা কে ? তুমি ?

"ওমা, আাম কেন ? দেবে তুমি—"

"ওরে বাবা—"

"ওমা, এই বুঝি তোমার সাহস ? কেন গো, রাঙাদার কথা ভুলে গেলে এরই মধ্যে ? অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করবে তুমি ?" ঠেস্‌ দিয়ে বলে অপর্ণা।

"না, কক্ষনো নয়—"

"তবে ?"

"যাবই। বল্‌বো সব কথা—কাগজগুলি সব দেখাবো। কিন্তু তুমি সঙ্গে থাক্‌বে তো ?"

"আমায়ও যেতে হ'বে ?"

"যাবে না ? না গেলে চল্‌বে কেন ? তোমায় পাশে না পেলে সাহস পাব না যে ?"

"যাব না কেন ? নিশ্চয় যাব—। কিন্তু কবে যাবে ?"

"যত শিগ্‌গীর সম্ভব। দেরী করা ঠিক হ'বে না ?"

* * *

সেদিন রাতের পর দিনগুলি বিচ্ছিরি ভাবে কাট্‌ছে রমা ও দিবাকরের। এক সঙ্গে বসে খাওয়া বন্ধ আছে। মুখ দেখা দেখিও প্রায় বন্ধ। এতদিন শোবার ঘরের আলমারী থেকে কাগজ-পত্র, কাপড়-চোপড় নিজের হাতেই বার করে এনেছে দিবাকর, প্রয়োজন মত। এখন ওঘর মুখোই হ'চ্ছে না দিবাকর। আধ ময়লা, ইস্ত্রি ভাঙা জামা কাপড় পরেই সে বেরিয়ে যায়। খারাপ লাগে রমার। একদিন দিবাকরের অনুপস্থিতিতে, গেস্টরুমে ঢুকে জামা কাপড়, জুতো সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে এলো। বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর বদলে টান টান করে পেতে দিয়ে এলো।

রাত্রে বাড়ী এসে সব দেখে ক্ষেপে ওঠে দিবাকর। "দরকার নেই এই আদিখ্যেতার। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবো। কারুর সাহায্যের দরকার নেই। কাউকে চাই না আমি—।" রমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে দিবাকর। চুপটি করে শুনে যায়—কোন জবাব দেয় না রমা। রমার এই নীরবতায় অধৈর্য্য হয়ে ওঠে দিবাকর। বলে, "সরেই যাচ্ছি চিরকালের জন্যে। সে ব্যবস্থাই করছি। আমার সুখশান্তির দায়-দায়ীত্ব কাউকে নিতে হ'বে না।" পরদিন দিবাকর বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধে'র তক্‌মা এঁটে। রাগে আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে রমার।

এর পরদিন বাড়ী থেকে বেরোল না দিবাকর। হিসাবের খাতা পত্র, গাদা গাদা ফাইল পত্র নিয়ে দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটে তার দিন। ফোন আস্‌ছে, ফোন করছে—ঠিক যেন যুদ্ধকালীন ব্যস্ততা। কয়েক বারই ম্যানেজার সীতেশবাবু এলেন গেলেন। বোঝা গেল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা কোম্পানীর উকিল ধীরেন দত্ত এলেন। দরজা বন্ধ করে ঘণ্টা দুয়েক শলাপরামর্শ হলো। দফে দফে চা দিতে হলো সুখেনকে।

বাড়ীতে বসে অফিসের কাগজপত্র নিয়ে দিবাকরের ব্যস্ততা, অফিসের বাবু পিওনদের ঘন ঘন আনাগোনা এবং শেষ পর্যন্ত উকিল দত্তমশায়কে নিয়ে পরপর দু'সন্ধ্যা দরজা বন্ধ করে গোপন পরামর্শ—কারণটা ঠিক বুঝতে

পারে না রমা। বিচলিত বোধ করে। হয়ত বা ভয়ও পায় একটু। সেদিন বারান্দায় সাঁতেশবাবুকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল রমা। উনি বল্লেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না। ক'দিন যাবৎ মেজাজ খুব খারাপ। হিসারপত্র নিয়ে খিটিমিটি করছেন। উকিলবাবু সব জানেন। বলতে চান না স্পষ্ট করে। শুনছি কারখানা বন্ধ করে দিবেন। যদি তা হয় এতগুলি লোক কি বিপদেই যে পড়বে৷" খুব চিন্তিত সাঁতেশবাবু। রমাও চিন্তিত হয়ে পড়ে।

দিবাকরের এভাবে ঘরে বসে থাকায় বিব্রত কাজল। এ বাড়ী আসা সম্ভব হ'চ্ছে না। লক্ষ্য করেছে, কিছুকাল যাবৎ দিবাকর সহজভাবে কথা তো বলেই না, মাঝে মাঝে এমনভাবে গোল গোল চোখে তাকায় যে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে কাজলের। সে নিজেও সহজভাবে দিবাকরের সঙ্গে কথা বল্‌তে পারে না আগের মতন।

রমা বারান্দায় এসে বিরাট লেটার বক্সের কোণে একখানা কার্ড পড়ে থাকতে দেখে—তা খুলে পড়ছিলো। কমলাদির চিঠি। কার্ডখানা পড়ে অবাক না হয়ে পারে না রমা লিখেছেন প্রচণ্ড হাঁপানীর টানে শয্যাশায়ী, তাই তিনি নিজে আসতে পারছেন না। কিছু জরুরী কথা ছিল যা এখুনি বলা দরকার। রমা যদি কষ্ট করে দু' একদিনের মধ্যে দেখা করে, ভাল হয়। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, "তোমার নিজের প্রয়োজনেই আসা দরকার।"

স্পষ্ট করে কিছু লিখেন নি। চিঠির সুর কেমন জানি রহস্যঘেরা। ব্যাপারটা কি হতে পারে? কি জানি গিয়ে কি শুনবে। এর চেয়ে না যাওয়াই ভাল। বিষয়টা জেনে পস্তানোর চেয়ে অজ্ঞতার স্বর্গে বাসই শ্রেয় মনে হয় তার।

"কি ব্যাপার? কার চিঠি? এত মনোযোগ দিয়ে দেখছো?" চমকে ওঠে রমা। কাজল বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে! কাজলের উপস্থিতি অন্ততঃ এ সময়, যখন দিবাকর বাড়ীতে—তার পছন্দ নয়। দিবাকরের মনে যে একটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহের বীজ দানা বেঁধেছে তা গোপন করেনি দিবাকর। এসে গেছেই যখন, প্রশ্নের জবাব দিতেই হয়, বলে, "কমলাদির চিঠি।" "কে হোন তিনি তোমার? কোত্থেকে লিখেছেন?" এই সুযোগে রমাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে কমলাদি বলে কাউকে সে চেনে না। চক্রান্তের এটা একটা প্রধান শর্ত।

"শান্তিপাড়ায় থাকেন; অসুস্থ, তাই দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।" "ওঃ", ব্যাপারটা যেন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিল। মনে মনে খুশী হয় সে।

কমলাদি কথা রাখবার চেষ্টা করছেন। গলা বাড়িয়ে বলে, "এদিকে কি ব্যাপার বলো তো? দাদা ঘরে বসে—আর অফিসটা যেন বাড়ীতেই উঠে এসেছে?"

"কি জানি। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। ভাল লাগে না।"

"অসুখ বিসুখ নয় তো?"

"নাঃ—অসুখ কেন হ'বে?"

"দাদার হঠাৎ কি হলো বলো তো? আমার সঙ্গে কথাই বলেন না। দেখা হলেই গোল গোল চোখ করে চেয়ে থাকেন—। আমি কি অন্যায় করেছি বুঝতে পারি না।"

"কি করে বলি?" গা ছাড়া কথা শুনে কাজলের ভাল লাগে না। তবু জিজ্ঞেস করে—"আচ্ছা, সেদিন যে চিঠিগুলি দেখিয়েছিলে তা' নিয়ে দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে?"

"হয়েছে—"

"কি বুঝলে?"

"এখানে দাঁড়িয়ে এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না। অবসর মতো এসো—এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।"

"দেখ, বলাটা ঠিক হ'বে কিনা জানি না—তবু বল্‌ছি, চিঠির বক্তব্য মিথ্যে নয়—। পরশু এক ভদ্রলোকের কাছে অনেক কথাই শুনলাম—"

"কি? কি শুনেছ?" উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে রমা।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে-কথা বলা যাবে না। সময় করে এসে সব বল্‌বো—।"

"বল্‌বে তো? কবে বল্‌বে?" আগ্রহভরা সুরে বলে রমা।

"একটু ফাঁকা হোক্—"

"এসো কিন্তু! তোমাকে এখন আমার ভীষণ দরকার।" দাঁড়ায় না রমা। ভেতরে চলে যায়। খুশীতে ঝলমল করে ওঠে কাজলের চোখ।

* * *

ভীষণ ব্যস্ত দিবাকর। হঠাৎ বেরিয়ে যায়—ফিরেও আসে তেমনি। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কোন কোন দিন পড়তি বেলায় বা সন্ধ্যার সময় গেষ্টরুমের ঠাণ্ডা জলে হুড়মুড় করে চান করে। রমা সেদিন সকালে ইমারসন হীটারখানা বন্ধ দরজার পাশে টুলের ওপর রেখে গেল। সেদিনও ঠাণ্ডা জলেই চান করলো। হীটারখানা যেমন পড়েছিল—তেমনি পড়ে থাকে। রাগে দুঃখে জ্বলে ওঠে রমা।

সকালে একটু বেলা করে উঠেছে কাজল। মটর বাইকখানা বারান্দায় না দেখে খুসী হয় সে। মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতে ঘরে এসে ঢোকে কাজল। ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় সে। বাইরের ঘরে বসে মোটা হিসেবের খাতা থেকে কিছু নোট করছেন দিবাকর। ম্লান হয়ে যায় কাজলের মুখ।

বাইক নেই অথচ দিবাকর বাড়ীতে বসে? এ কেমন কথা? দিবাকর বেরিয়ে গেছে জেনেই তো সে এলো? এ কী বিড়ম্বনা!

একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছে যখন, তখন দিবাকরকে এড়িয়ে সরাসরি ভেতরের ঘরে যাওয়া শোভন হ'বে না মনে করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে, "আজ অফিসে যাননি? শরীর খারাপ?"

"শরীর খারাপ? আমার? কখনও দেখেছ?" সোজা কাজলের চোখে চোখ রেখে বলে দিবাকর। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে পড়ে কেমন জানি মিইয়ে যায় কাজল, বলে, "না, সে কথা নয়—, এই আর কি—" রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। এই শীতের সকালে ঘেমে ওঠে সে। ওর এই বিব্রত অবস্থা দেখে মুচকি হেসে দিবাকর বলে, "আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ?"

"না। এলাম মানে আসি তো প্রায়ই--" কি বলবে, কি বলা উচিত ভেবে পায়না কাজল। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে দিবাকর বলে, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। যাও ভেতরে যাও। এখানে বসে আরাম পাবে না।"

"না। কিন্তু—" আমতা আমতা করে কাজল। রীতিমত ঘেমে উঠেছে। "আর কথা নয়। যেখানে যাবার জন্য এসেছ, সেখানেই যাও। আমি এখন খুব ব্যস্ত।"

ইতস্ততঃ করে গলা চড়িয়ে হাঁক দেয় কাজল, "বৌদি, ও বৌদি, এক কাপ চা হবে?" উত্তরের অপেক্ষা করে না আর। পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘরে পালিয়ে বাঁচে সে। চোখ তুলে পলায়নপর কাজলের দিকে ঘৃণা ভরা দৃষ্টি মেলে দিবাকর বলে, "যত্তো সব—।" কাজলের এই ভীরুতা সন্দেহকে গাঢ় করে। কিন্তু রমা? রমাও কি তবে এ ব্যাপারে জড়িত? ব্যথায় ম্লান হয়ে যায় দিবাকরের মুখ।

দীপুর পরীক্ষা তখন চলছে। সময় হয়ে গেছে। ওকে তৈরী করতে রমা ব্যস্ত। কাজলের সাড়া পেয়ে ঘর থেকেই রমা বলে, "কি, চা খাবে, না কফি?"

"কফিই ভাল, কি বলো?" দিবাকরকে শুনিয়েই যেন কাজল বলে।

"সুখেন, দু'কাপ কফি করতো ?" শোবার ঘর থেকেই রমা বলে।

একটু পরে, খাবার টেবিলে দীপুকে নিয়ে এসে বসে রমা। কেমন জানি রুক্ষ, শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা রমার। কাজল বলে, "শরীর খারাপ নাকি ? কোন উত্তর দেয় না রমা ; দীপুকে খাওয়াতে শুরু করে। সুখেন ট্রেতে করে দুকাপ কফি নিয়ে এলো। এক কাপ নামিয়ে কাজলের দিকে এগিয়ে দিয়ে সুখেনকে রমা বলে, "বাইরের ঘরে দাদাবাবুকে দিয়ে এসো।" সুখেন চলে যায়।

"তুমি খেলে না ?"

"না, ভাল লাগছে না।" মৃদুস্বরে বলে রমা। খাওয়া শেষ হলো দীপুর। ওর মুখ ধুয়ে দিয়ে, হাতমুখ মুছে রমা বলে, "যা, এবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রণাম করে আয়।" দীপু চলে যেতেই আঙ্গুল দিয়ে বাইরের ঘর নির্দেশ করে ফিস্‌ফিস্ করে কাজল বলে, "একেবারে সুন্দরবনের বাঘের মুখে পড়েছিলাম আর কি ? এখনও বুকের কাঁপুনি থামেনি।" রমা কিছুই বলে না। দীপু ফিরে এলো। ওকে জুতো মোজা পরিয়ে দেয় রমা। পরানো শেষ হ'তেই উঠে মাকে প্রণাম করে দীপু। রমা ওর কপালে দইয়ের টিপ পরিয়ে কড়ে আঙ্গুল দাঁতে কাটে, বুকে জড়িয়ে চুমো খেয়ে বলে, "কাকুকে প্রণাম করে, বাপীকে প্রণাম করে সোজা রিক্সায় উঠে বসো। সময় হয়ে গেছে।"

"না, শুধু বাপীকে প্রণাম করবো আমি—" কাজলকে উপেক্ষা করে বাইরের ঘরে ছুটে চলে যায় দীপু। মাথা নীচু করে কাজল লজ্জায়। রমা বলে, "দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে দীপু। ভবিষ্যতে কি যে আছে কে জানে ?" বাইরের ঘরে ছেলে ও বাপের সম্ভাষণ ও কলধ্বনি কানে বিষ ছড়ায় কাজলের।

"না, কিছু ভাল লাগে না।" দীপুর এঁটো থালা বাটি গুটাতে গুটাতে যেন আপন মনেই বলে রমা। ওগুলি নাবিয়ে রেখে বেসিনে হাত ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে কাজলের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বলে, "অনেক কথা আছে। সময় করে বিকেলে আসবে একবার।"

"আস্‌বো ? কিন্তু কি ব্যাপার ?" কাজল বলে।

"চুপ্ ! আস্তে। এসো কিন্তু—আমি অপেক্ষা করবো। এখন যাও।" সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বাইরের ঘরের দিকে চেয়ে রমা বলে। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়ায় কাজল। একটু জোরে জোরেই বলে, "মেনি থ্যাঙ্কস্ বৌদি। কফির জন্য ধন্যবাদ। এবার চলি—" কাজল বেরিয়ে যায়।

রমার এই চুপি চুপি কথা বলার ধরনে সে মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে। বাঘিনী ধরা দিল বটে।

দীপুকে রিক্সায় তুলে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল দিবাকর। কাজল বেরিয়ে আস্‌তেই বলে, "চল্লে ?"

"হ্যাঁ চলি, কাজ আছে—"

"হ্যাঁ কাজ, কাজ, কত কাজ! কাজই বটে—।" আনমনে বলে দিবাকর।

"কিছু বল্লেন ?" ভয়ে ভয়ে বলে কাজল।

"না, কিছু নয়। কাজ করগে যাও।" দিবাকর ঘরে ঢুকে যায়। কাজল দাঁড়ায় না। পা চালিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে যায়।

কাজলকে দরকার রমার। সব কিছু কেমন জানি জট পাকিয়ে উঠেছে। দিবাকর ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠ্‌ছে। বিরাট রহস্যের বেড়াজালে জড়িয়ে দিবাকর নিজেকে দূরে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই রহস্যের জাল ভেদ করবে কেমন করে সে জানে না। দরকার একজন দরদী বন্ধুর। কাজল ছাড়া তেমন বন্ধু আর কে আছে তার ?

বার কয়েক রিং হলো। রিসিভার তুলে কথা বল্লো দিবাকর। মনে হয় সব ক'টিই ট্রাঙ্ককল। হিসেবের কচ্‌কচানি, কখনও রাগ, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার ছোঁয়াচ ফুটে উঠ্‌ছিল দিবাকরের গলায়। অফিসের সিতাংশু-কাকুর সঙ্গেও দু' একবার কথা হলো। কণক দু'তুবার কিছু ফাইল আর টাইপ করা কাগজপত্র নিয়ে এলো।

সাড়ে বারোটায় চানে গেল দিবাকর। ফোনে আরও কথা বল্লো। খেয়েদেয়ে জামাকাপড় পরে ফাইলপত্র গুছিয়ে রামলালকে একটা রিক্সা আন্‌তে বল্লো। বেরিয়ে যাবার আগে রামলালকে ডেকে রমাকে শুনিয়ে জোরে জোরে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ও ছোট হোল্ডঅল বার করে রাখতে বলে রিক্সায় চড়ে বস্‌লো।

দিবাকর বেরিয়ে যাবার পরই বাইরের ঘরে গিয়ে রমা দেখ্‌তে পেলো, যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল, তেম্‌নি ভাবে কফির কাপ পড়ে আছে। ছুঁয়েও দেখেনি দিবাকর। "এতদূর ?" সার্বঙ্গ জ্বলে ওঠে রমার।

ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দিবাকরকে রিক্সাকরে বেরিয়ে যেতে দেখ্‌লো কাজল। এই ফাঁকে রমার সঙ্গে দেখা করে আস্‌বে কি ? না, সাহস হয় না তার। কেমন জানি ভয় ভয় করে দিবাকরকে আজকাল। ঘরে বসে অফিসের কাজকর্ম করতে দেখেনি এর আগে কখনও। দেরী করে অফিসে

যাওয়াও দিবাকরের অভ্যাস নয়। তাছাড়া রিক্সা কেন? বাইকখানা গেল কোথায়? না, বাপু, দরকার নেই। কে জানে কখন নিঃশব্দে এসে পড়বে দিবাকর। ধৈর্য্য ধরে একটু রয়ে সয়ে এগোনেই ভাল।

ছটোর একটু আগে ট্যাক্সি করে ফিরলো দিবাকর সঙ্গে দীপুও। বাড়ীতে ঢুকেই হাঁক দিয়ে দিবাকর বলে, "সুখেন শিগ্‌গীর আমায় এক কাপ চা দিয়ে যাও। আর শোনো, দীপু এসেছে। ওর খাবার ব্যবস্থা করো। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছে আমাদের দীপুসোনা।" শেষের কথাগুলি যেন রমাকেই শুনিয়ে বলা। চা খেতে খেতে ব্যাগে কিছু জামাকাপড় ভরে নেয় দিবাকর। রামলালকে ডেকে বিছানাপত্র নাবিয়ে বেঁধে দিতে বলে। বাইরে কোথাও যাবার সময় নিজের হাতে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে এসেছে রমা এতকাল। শুধু আজই প্রথম এ কাজের জন্যে রমার প্রয়োজন হলো না দিবাকরের। কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কিছুই জানা হলো না রমার। ছঃখে বেদনায় মুষড়ে পড়ে রমা।

দিবাকর নির্বিকার। জামাকাপড় বদলে, কিছুক্ষণ দীপুকে নিয়ে মেতে থাকে। দীপুর শেষ পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে, এবার সে প্লেস্ রাখ্‌বেই —বাপ ছেলেতে এনিয়ে কি ফুর্তি? অবশেষে গাড়ীতে জিনিষপত্র তুলতে বলে শোবার ঘরের দরজায় টোকা দেয় দিবাকর। দরজা খোলাই ছিল। সাড়া না দিয়ে শুয়েই থাকে রমা। অগত্যা, এতদিনের মধ্যে এই প্রথম-বার, পর্দা সরিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে দিবাকর বলে, "একটু শুনে যাবে?" মুখে নিস্পৃহ ভাব ফুটিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায় রমা। একখানা ভারী খাম বাড়িয়ে দিয়ে দিবাকর বলে, "এতে দু'হাজার টাকা আছে। এ দু'দিনের বাজার খরচ চালিয়ে যা বাঁচবে তোমার হাতখরচের জন্যে রেখে দিয়ো। আর এই তোমাদের প্লেনের টিকিট উনিশ তারিখের। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি। আজ রাতে জোড়হাট হয়ে কোহিমা পৌছাব বলে আশা করি। যদি কাজ হয়ে যায়, তবে তোমরা পরশু রওনা হবার আগেই চেষ্টা করবো ফিরতে। যদি একান্ত না পারি তবে—" থেমে যায় দিবাকর। তারপর আবার শুরু করে, "তোমাদের প্লেন একটায় ছাড়বে। আমি না এলেও তোমাদের মোহনবাড়ী পৌছান আর প্লেনে তুলে দেওয়ার সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছি। কোন অসুবিধা হ'বে না। শুধু বেলা বারোটার মধ্যে রেডি হয়ে থেকো।"

টিকিট ছটো হাতে নিয়ে দেখে রমা বলে, "রিটার্ণ টিকিট? কেন?"

"ফেরার সময় টিকিট কাটার ঝামেলা রইলো না। শুধু রিজারভেসন কনফার্ম করলেই হবে।"

"ফিরে আস্‌বো আমি, কে বল্লো তোমায়? ম্লান মুখে রমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দিবাকর বলে, "ফিরে আসবে না?" মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রমা বলে, "না, আর ফিরে আস্‌বো না।"

"কেন?"

"এই অবাস্তব প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। তুমি ভাল করেই জানো কেন আমি আর ফিরে আস্‌বো না—" একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দিবাকর বলে। "গানুকে দিয়ে বকেয়া টাকা ফেরৎ নিয়ে নিতে পারবে।"

"খুব হিসেব করেই উনিশ তারিখের টিকিট কেটেছ, না?" শ্লেষের সঙ্গে বলে রমা। শ্লেষ গায়ে না মেখে স্বাভাবিক সুরে দিবাকর বলে, "উপায় ছিল না। আঠেরো থেকে চব্বিশ তারিখ পর্য্যন্ত কোন টিকিটই ছিল না। সব বুকিং হয়ে গেছলো। হঠাৎ একজন উনিশ তারিখের তিনখানা টিকিট ক্যানসেল করায়—দু'খানা নিয়ে নিলাম তোমার তাড়ায়। চাও তো এগুলি ফেরৎ দিয়ে চব্বিশ তারিখের পরের কোন দিনের—"

"না, দরকার নেই। উনিশ তারিখই ভাল—।"

"এবার আমি চলি। সাবধানে থেকো। রামলাল যেন এই ক'দিন বাইরের ঘরে শোয়। তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হ'বে কিনা জানি না। হয়ত—" হঠাৎ যেন কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যায় দিবাকরের শুধু বলে,"আচ্ছা-চলি।" এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে রমার বুক। কিছু বল্‌বে বলে মুখ তুলে তাকায় রমা কিন্তু ততক্ষণে দ্রুত পা চালিয়ে খাবার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেছে দিবাকর। বেরিয়ে এসে খাবার ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায় রমা। দীপুকে কোলে নিয়ে আদর করছে দিবাকর গেটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। হাহাকারে ভরে ওঠে তার অন্তর। ভিজে চোখে দৃষ্টি তার ঝাপসা।

বারান্দায় এসে ছোঁ মেরে দীপুকে বুকে নিয়ে আদরে আদরে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে দিবাকর। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু বলে, "তোমার চোখে জল কেন বাপী? তুমি কাঁদছো? কেন?"

"দূর বোকা! কাঁদবো কেন? কিছু পড়েছে যেনো চোখে। এবার আমি চলি। খুব ভাল থেকো সোনা। মাকে কষ্ট দিয়ো না, জ্বালাতন করো না কক্ষনো, তার কথার অবাধ্য হ'বে না, কেমন? চলি—" দীপুকে নাবিয়ে দিয়ে চোখ মুছে ম্লান হাসি হেসে চলে যায় দিবাকর।

গেট পেরিয়ে সোজা গাড়ীতে উঠে বসে দিবাকর। আর পেছন ফিরে তাকায় না। বৃথাই হাত নেড়ে টা টা করে দীপু। অশ্রুমুখী রমা

তখনও দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। তার মনে অভিমান কেন দিবাকর একবারও বল্লো না। 'তোমায় কোলকাতা যেতে হ'বে না। যেতে দেবো না আমি।' কেন বল্লো না? কেন?

দীপু ছুটে আসে মার কাছে নালিশ নিয়ে। এত টা টা করলো, কিন্তু বাপী ঘুরেও দেখ্‌লো না চেয়ে। কিন্তু মায়ের চোখে জলের ধারা দেখে বলে, "তুমিও কাঁদছো মামণি! কেন?"

"যাঃ। কাঁদবো কেন? চোখ ভীষণ জ্বালা করছে। চোখে ড্রপ্‌ দিতে হবে।"

কাজলের চোখ এড়ায়নি। ব্যাগ, হোল্ড-অল নিয়ে দিবাকরকে গাড়ীতে উঠ্‌তে দেখে উল্লাসে নেচে ওঠে তার মন। ভগবানের কি দয়া। ডিগবয় থেকে ফেরার দিন থেকে ঘটনা প্রবাহ এমন মোড় নিয়েছে যে রমা এখন তার মুঠোর মধ্যে। ব্যাগ, হোল্ড-অল নিয়ে গেছে, দু-একদিনের আগে দিবাকর ফিরছে না। কি অপূর্ব সুযোগ এনে দিল সম্মুখে দিবাকর। আজ, আজ, আজই। কানে বাজে ফিস্‌ফিস্‌ করে রমার কথা, 'চুপ্‌! আস্তে। এসো কিন্তু? আমি অপেক্ষা করবো। এখন যাও।' দিবাকর চলে যাবে জেনেই তবে এই আমন্ত্রণ। দরুণ উত্তেজিত কাজল। চট্‌পট্‌ প্রসাধন সেরে সেণ্ট মেখে গলিপথ দিয়ে এগিয়ে আসে সে।

কিন্তু, এ আবার কি? ট্যাক্সিটা ফিরে আস্‌ছে যে! সত্যি সত্যিই গাড়ীখানা গতিবেগ কমিয়ে বাড়ীর গেটের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। টাক মাথা এক মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক নেবে এলেন, পেছন পেছন এক ভদ্র-মহিলা এবং কিশোরী। দু'বার হর্ন বাজিয়ে ড্রাইভার নেবে এসে পিছনের কেরিয়ার খুলে বিছানা, ট্রাঙ্ক ও সুটকেশ নাবিয়ে দিল।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে গলা চড়িয়ে ডাকেন ভদ্রলোক, "রমা, ওরে রমা, তোরা আছিস তো?" দীপু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলো। এক অপরিচিত ভদ্রলোককে মার নাম ধরে ডেকে ভেতরে ঢুকতে দেখে, "মা, মামণি" বলে মাকে ডাকতে ভেতরে চলে যায়।

রমা দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, "ওমা, পিসেমশায়, তুমি!" এগিয়ে এসে প্রণাম করে উঠতেই গেটের দিকে চোখ পড়ে। আনন্দে ফেটে পড়ে রমা। বলে ওঠে, "ওমা, কি মজা, পিসীমা, রীণাও এসেছে যে?" ছুটে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, "বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন গো তোমরা? এসো ভেতরে এসো। এ্যাই রীণা, আয় চলে আয়। ওরে ও দীপু রামলালকে ডাক বাবা শিগগীর—" বলে নিজেই গলা চড়িয়ে ডাকে

"রামলাল, রামলাল।" ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে রমা। এই ব্যস্ততার মধ্যে বেড়া ধরে দাঁড়ানো কাজলের দিকে চোখই পড়ে না তার। বিক্ষুব্ধ কাজল, মুখ কালো করে ফিরে যায় নিজের ডেরায়। একেই বলে অদৃষ্ট।

রমার আপন পিসেমশাই। নেফার চাকরীতে বর্তমানে তেজুতে আছেন। শিলং যাবেন পরদিন ভোরের বাসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেন, "যাই ট্যাক্সিটা নিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসি মটর আপিসে—। সময় মত টিকিট বুক না করলে কাল যাওয়াই হ'বে না। অথচ যে করেই হোক কাল শিলং পৌঁছাতেই হবে। তা হ্যা রে জামাই কোথায়?"

"এই তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন জোড়হাটে। ফিরতে দু' একদিন দেরী হ'বে—।"

"আহা, একটুর জন্যে দেখা হলো না। যাক কথাবার্তা পরেই হ'বে, দেরী করে লাভ নেই। আমি চলি রে—।"

"বসো বসো যাচ্ছ কোথায়? টিকিটের জন্যে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। এক মিনিট বসেই যাও না? কালকের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেই তো হলো?" রমা ছুটে গিয়ে ফোন তুলে দিবাকরের অফিসের সীতেশবাবুর সঙ্গে কথা বলে। রমা ফোন নাবিয়ে রাখতেই পিসেমশাই ব্যস্ত হয়ে বলেন, "এ সব কি ফোনে হয়? নিজে গিয়ে—"

"বসো দেখি ঠাণ্ডা হয়ে। যাঁদের বলেছি ওঁরা যদি না পারেন, তাহলে তুমি নিজে গিয়েও কিছু করতে পারবে না—"

"তুই জানিস্ না। নিজে গিয়ে বিষয়টা বুঝিয়ে বল্লে কাজ হয়। তুই যাঁকে বললি, উনি যদি না পারেন—"

"মিথ্যে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি। পারলে উনিই পারবেন। ট্যাক্সিটা প্যাঁক প্যাঁক করছে ওটাকে ছেড়ে দাও।"

"দাঁড়া, দেখে নিই ভদ্রলোক কি বলেন। এখন গাড়ী ছেড়ে দিলে দরকার মত পাব কোথায়?" কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠলো। সীতেশবাবু জানালেন, তিনটে আপার ক্লাসে টিকিট পাওয়া গেছে। টাকা নিয়ে কনক সাইকেলে চলে গেছে। টিকিটগুলি নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

"কী? দেখলে তো? ঘরে বসেই তোমার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলুম? এখন ওঠো, ট্যাক্সি বিদায় করে হাত মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। চা-টা খাও। হাতমুখ ধোবে একটু গরম জল করে দিই?"

"গরম জল হ'বে? রক্ষে করলি না।"

ট্যাক্সিটাকে ভোরে আসতে বলা হয়েছিল। ভোরে চা জলখাবার খেয়ে সবাই গাড়ীতে উঠে বসলেন। দীপুকে নিয়ে রমাও সঙ্গে গেল ওদের বাসে তুলে দিতে।

বেলা আটটায় ঘুম ভেঙ্গে উঠেই পড়িমরি' করে ছুটে এলো কাজল। বাড়ী ফাঁকা, রেগে টং কাজল। বাইরের ঘরে সোফায় গা এলিয়ে সুখেনকে এক কাপ চা দিতে বলে।

বাস ছেড়ে দিল। চৌকিডিঙ্গী মটর অফিস থেকে সাংমাদের বাড়ী মাত্র কয়েক গজ দূরে। দীপুর আগ্রহে ওদের বাড়ীর গেটে ঢুকতেই হা হা করে ছুটে এলেন মিসেস্ সাংমা, পেছনে রোমেল, দীপুর সহপাঠী ও বন্ধু। ও'রা গাড়ী নিয়ে বের হবার বন্দোবস্ত করছিলেন দীপুকে নিয়ে আসার জন্যে।

"কি আশ্চর্য্য, আজকের কথা তোমরা জানতে নাকি?" মিসেস সাংমা বলেন।

"কেন? কি কথা?"

"বারে, আজকে রোমেলের জন্মদিন। আমরা তোমাদের বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম, দীপুকে নিয়ে আসতে। কি ভাগ্য, তোমরা নিজেরাই এসে গেছ—একেই বলে "টেলীপ্যাথী—"

মা ও ছেলেকে থেকে যেতে বলেন মিসেস্ সাংমা। রমা আপত্তি করে। দীপু থাকতে পারে—কিন্তু তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কালই কোলকাতা যাচ্ছে—গোছ গাছ কিছুই হয়নি। সংসারের বিলি ব্যবস্থাও বাকী। হাতে সময়ও খুব কম। অবশেষে ঠিক হলো ব্রেকফাষ্ট খেয়ে দীপু ও রোমেলকে নিয়ে মার্কেটিং করতে যাবে রমা সাংমাদের গাড়ীতেই। দীপু ও রোমেলকে পৌঁছে দিয়ে রমা বাড়ী চলে যাবে। খাইয়ে দাইয়ে রাত্রি আটটার মধ্যে দীপুকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নিলেন মিঃ সাংমা।

ব্রেকফাষ্টের পর সাংমাদের সঙ্গে গল্প গুজব সেরে সাড়ে নটায় দীপু ও রোমেলকে নিয়ে বাজারে এলো রমা। "ডিব্রুগড় লাইব্রেরী" থেকে রং-চংয়ে ইংরিজি ছড়ার বই, কলম, রং-পেনসিল, 'উদয়ন' থেকে সুন্দর গরম কোট জন্মদিনের উপহারের জন্যে কিনে ওদের নিয়ে ফিরে চলে চৌকিডিঙ্গীর পথে।

চৌকিডিঙ্গী রেল-গেটে এসেই মনে পড়ে কমলাদির কথা। কালই তো চলে যাবে—। হাতে যখন সময় আছে দেখা করে যাওয়াই ভাল। হাজার হলেও অসুস্থ মানুষ তো? কত আর সর্বনেশে কথা শোনাবেন কমলাদি?

যা' শুনেছে, যা' দেখেছে এরচেয়ে বেশী কি বলবেন কমলাদি ? রেল-গেট নেবে পড়ে—। দীপু ও রোমেল চলে যায়। একটা রিক্সা নিয়ে কমলাদির বাড়ীর পথে রওনা হয় রমা। বেলা তখন এগারটা।

কমলাদি সত্যিই বড় অসুস্থ। এখনও উঠে বসতে পারেন না। রমাকে দেখে উৎসাহ ভরে কমলাদি বলেন, "ওমা, এত দেরী করে এলে ?"

"কি করি ? সময়ই পাই না। রোজই ভাবি আসবো—কিন্তু একটা না একটা ফেচাং লেগেই থাকে। কাল কোলকাতা যাচ্ছি, তাই অসময় হলেও চলে এলাম। কোন অসুবিধা করলুম না তো ?"

"না, না, না, অসুবিধা হ'বে কেন ? আমি তো বিছানা ছেড়ে নড়তে পারি না—লোকজন এলে ভালই লাগে। ভালই হয়েছে তুমি এসেছ এ সময়।"

"কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো ? ব্যাপারটা কি এমন জরুরী যে আমায় যে করেই হোক আসতে লিখেছ ?"

"বলবো সবই বলবো। বসো চা টা খাও। কতদিন পরে এলে ?"

"এখন চা ছাড়া আর কিছু খাবো না। এই মাত্র সাংমাদের বাড়ী খেয়ে এলাম।'

চা খেতে খেতে সাধারণ কুশলবার্তা, মহিলা সমিতির কাজকর্ম ও কাণ্ড কারখানা নিয়ে আলোচনা হলো। রমা বারবার তাড়া দিচ্ছে সেই জরুরী কথার জন্য। বারবারই কমলাদি এটা ওটা নানা কথার ছলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

শেষ পর্যন্ত রমার তাগিদ এড়াতে না পেরে—রমার হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলেন, "কবে থেকে তোমায় সব জানাবো ভাবছি—কিন্তু কিছুতেই সাহসে কুলায়নি। অথচ সব জেনেও চুপ করে থাকা নিতান্ত অন্যায়। ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমি চাই সব কিছু জেনে বুঝে শক্ত হাতে অন্যায়ের প্রতিকার করো তুমি। ব্যাপারটা ক্রমশঃই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চুপ করে থাকলে চলবে না। এ অবস্থায় প্রতিরোধের চাবিকাঠি তোমারই হাতে।" অসহিষ্ণু কণ্ঠে রমা বলে, "লম্বা ভূমিকা ছেড়ে স্পষ্ট করে বলো ব্যাপারটা কি ? আর আমায় দিয়ে কি সাহায্য হ'বে ? কালকের প্লেনেই তো কোলকাতা যাচ্ছি। কবে ফিরবো এখনই বলা মুশকিল।"

"তোমরা সবাই যাচ্ছ বুঝি ?" সাগ্রহে প্রশ্ন করেন কমলাদি।

"না, শুধু দীপু আর আমি। ওঁর যাওয়া হ'বে না। হাতে অনেক কাজ।"

"উহুঁ, উহুঁ। এ ভাল কথা নয়। ওঁকে এখানে একা রেখে যেয়ো না।"

"যাক্ ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। কিন্তু কমলাদি, আমি এর মধ্যে আর থাকতে চাই না বলেই—চলে যাচ্ছি।"

"পাগল আর কাকে বলে? রাক্ষুসীটার কবলে স্বামীকে রেখে পালাবে তুমি?"

"ওঃ, সেই উড়ো চিঠিগুলি তুমিই পাঠিয়ে ছিলে?"

"উড়ো চিঠি? সে আবার কি?" কমলাদির চোখে মুখে অপার বিস্ময়। মুখ দেখেই বোঝা যায় যে কমলাদি এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। সুর পাল্টে রমা বলে "ও কথা থাক্। আগে খুলে বলো সব। শুনি সেই রাক্ষুসীর পরিচয়—"

"দিবাকরবাবুর কথাই বলছি। কিছুদিন যাবৎ তাঁর সম্পর্কে নানা কানাঘুষা শুনে আসছি---কিন্তু এতদিন কোন গুরুত্ব দিইনি। শত্রুতা করেও তো মিথ্যে রটনা করে মানুষ? দিবাকরবাবুর উন্নতিতে কিছু লোকের চোখ যে টাটায়নি তাতো নয়। তাই এ সব কথায় কান দিইনি---"

"কি কানাঘুষা শুনেছ ভেঙ্গে বলো—"

"সে অনেক কথা। শোনা কথা পরেই শোন। কিন্তু যা' প্রত্যক্ষ করেছি—"

"কি প্রত্যক্ষ করেছ তুমি?" আর্ত্তনাদের মত শোনায় রমার কণ্ঠস্বর। ওর দিকে চেয়ে ইতস্ততঃ করেন কমলাদি, তারপরে বলেন, "বলছি, বলছি। কিন্তু ভাই এত উতলা হলে কি চলে? পুরুষ মানুষ মাত্রই একটু রাশ-আলগা। ওদের চালিয়ে নিতে হয়। তুমি চলে গেলে সামনে কোন বাধাই থাকবে না। এখন তুমি যেয়ো না। এখানে থেকে কড়া শাসনে না রাখলে—"

"কি করবো, না-করবো সে আমিই ঠিক করবো। সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে, আগে বলো কী দেখেছ তুমি?" কঠিন সুরে বলে রমা।

"বলছি, বলছি ভাই। তোমাদের নৃত্যনাট্যের মহড়া চলছিল। সম্ভবতঃ ডিগবয় যাবার আগে কোন এক সময়। তখন বেলা সাড়ে বারোটা হবে। সমিতির কিছু সেলাইয়ের কাজ সেই হতচ্ছাড়ী রাক্ষুসীর মার হাতে ছিল। ঐ তোমাদের অপর্ণার মার হাতে আর কি! সেদিনই বিকেলে সেলাইগুলি নিতে লোক আসবে। তাই মনে হলো, আগে ভাগে গিয়ে দেখে আসি কতটুকু কাজ এগোল। ওদের বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে উঠোনে পা দিলুম। জনমানবের সাড়া নেই। সারা বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। শুধু

বড় ঘরের পেছনের দরজা একপাট খোলা। ঢুকে দেখি, সে ঘরেও কেউ নেই। অবাক কথা, সবাই গেল কোথায়? পাশের ঘরে যেন নড়াচড়ার শব্দ পেলুম। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই—ছিঃ ছিঃ পালিয়ে এলুম।

"কি দেখলে, খুলে বল সব।"

"বলার মত নয় ভাই। ছিঃ ছিঃ ভাবতেও লজ্জা হয়। মেয়েটা যে খারাপ---সেকথা সবাই জানে। কতজনের সঙ্গে দিনরাত্রি ঢলাঢলি। কিন্তু সেদিন যা' দেখলাম, ছিঃ ছিঃ ছিঃ"—লজ্জায় নুইয়ে পড়েন কমলাদি।

"বড় ফেনাচ্ছ কমলাদি। স্পষ্ট করে বলো কি দেখেছ তুমি?"

রমার দাবড়ানিতে ঘাবড়ে গিয়ে কমলাদি বলেন, "দেখলাম, দেখলাম পাশের ছোট ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে মেয়েটি আর দিবাকরবাবু মেয়েটাকে, ছিঃ ছিঃ"—দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকেন কমলাদি।

এক ধাক্কায় টেবিলটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় রমা। থমথমে মুখ। সারা মুখে বেদনার ঘন ছায়া। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, বলে, "তোমায় ধন্যবাদ কমলাদি। এতদিন যা' অস্পষ্ট ছিল, আজ তা স্পষ্ট হলো। এরপর আমার আর করার কিছুই নেই। প্রবৃত্তিও নেই। চলি এবার"। দরজার বাইরে পা দিতেই কমলাদি বলে উঠেন, "এভাবে চলে যেয়ো না ভাই। একটা বিহিত করা দরকার। সেজন্য শলা-পরামর্শ—"

"বিহিত? শলা-পরামর্শ?" ম্লান হেসে রমা বলে, "না, কমলাদি, আর হয় না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে—।" গট গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে যায় রমা। পেছনে কমলাদি চিৎকার করে ডাকেন, "সমীর, ওরে ওরে ও সমীর শোন। ধ্যাত তেরী, কেউ বাড়ী নেই নাকি? বেলা, এই বেলা, শীগগীর তোর দাদাকে ডেকে দে।" আর কিছু শুনতে পায় না রমা। রাস্তায় নেবেই রিক্সা পেয়ে উঠে বসে রমা।

সারাপথ কি ভাবে এসেছে জানে না রমা। সংশয় সন্দেহের অবসান হলো। জানার যা, জানা হলো। কিন্তু কি হলো তাতে? পরাজয়ের গ্লানি, শুধু কি পরাজয়? এমন একজনের কাছে মাথা নীচু হলো তার, যাকে এতকাল পাত্তা দেয়নি, হাতে তোলেনি—শুধু দয়া করেছে, করুণা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাও করেছে। রূপে-গুণে, স্বভাব-চরিত্রে, সম্ভ্রমে, রুচিতে কখনই তার পায়ের আঙ্গুলের কাছে দাঁড়াতে পারে না যে, সেই উদ্বাস্তু মেয়েটার কাছে দিবাকরকে হারানোই শুধু নয়, নিজের মান-সম্মান, সম্ভ্রমটুকু হারিয়ে আজ সে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা এরপর? এরপর কি নিয়ে সে বেঁচে থাকবে? অসীম শূন্যতা নিয়ে বাড়ীর গেটে নেমে পড়ে বিধ্বস্ত,

বিবর্ণ, একদা গরবিনী সেই রমার ভগ্নাংশ। সে দেখেনি, কিন্তু শান্তিপাড়া রেলগেটে ভীড়ের মধ্যে আটকে পড়া রিক্সায় রমাকে দেখে অবাক হয় অপর্ণা। এত শুকনো, পাংশু মুখ কেন বৌদির? কি হলো তার?

দরজা খুলে দেয় সুখেন। ওর কাছেই জানতে পারলো যে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করে দশটা নাগাদ কাজল চলে গেছে। কিছু না বলে শোবার ঘরে চলে যায় রমা।

ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় সুখেন। একটু ইতস্ততঃ করে মৃদু কণ্ঠে ডাকে "বৌদিমণি?" শুয়ে ছিল রমা। মনে পড়ে তার। উঠে এসে বলে, "তোমায় যেতে হ'বে? ঠিক আছে। তুমি আর দাঁড়িয়ো না। ও হ্যাঁ, তোমার ভাইঝির বিয়ে কবে?"

"সামনের রবিবার মাত্র পাঁচদিন পরেই—"

"ঠিক আছে। তুমি এসো। বিয়ের বাজার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু কাল একটু সকাল সকাল এসো। আমরা বারোটার মধ্যে বেরিয়ে যাব। কোন অসুবিধা হবে না তো?"

"না, না, আমি কাল ভোরেই চলে আসবো। আপনার ভাত বেড়ে টেবিলে ঢেকে রেখেছি। রাতের জন্য ডাল, তরকারী, মাছ রেঁধে জালের আলমারীতে রেখে গেলাম। বেশ কয়েক টুকরো বাড়তি মাছ ছিল ভেজে রেখে দিয়েছি। কাল ওতেই সবার হয়ে যাবে। রাত্রে শুধু কষ্ট করে ভাতটা—"

"সে জন্যে ভাবতে হ'বে না। ও আমি করে নেবো। শোন, এক মিনিট দাঁড়াও।" রমা ভিতরে চলে যায়। একটু পরে ফিরে এলো হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা সুখেনের হাতে তুলে দিয়ে বলে, "তোমার ভাইঝির বিয়েতে আমাদের তরফ থেকে উপহার বলে গ্রহণ করো। আর এই নাও, তিনশো টাকা রাখো। বিয়ের ব্যাপার-- খরচের তাল পাবে না। এ টাকাটা কাজে লাগবে তখন।"

"বৌদিমণি, এত টাকা। আমি---"

"কেন সঙ্কুচিত হচ্ছো? দাদা-বৌদি নেই, একমাত্র ভাইঝিকে বুকে করে মানুষ করেছ। তাতে বিয়ে দিচ্ছ। ভাল ভাবে দেবে না বিয়ে? শোন, এ টাকা কিন্তু তোমার হিসেবের টাকা নয়। খুসী হয়েই তোমায় দিচ্ছি। নাও, আর দেরী করো না।" ভাবাবেগে শান্ত নিরীহ সুখেন ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, "আপনি সত্যিই স্বর্গের দেবী।" প্রণাম করে চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে রমা। সুখেনের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পেরেছে---দুঃখের মধ্যেও কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে কিছুটা শান্তি যেন পায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে? বার বার কানে ভাসছে একটু আগে কমলাদির কাছে শোনা এক দুপুরে অপর্ণাদের বাড়ীর সেই ঘটনা। এত নীচে নেমে গেল দিবাকর, যে তারই আশ্রিত এক উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে আসঙ্গ লিপ্সায় মেতে উঠতে বাঁধে না তার? সে কি পায়নি রমার কাছে, যার জন্যে অপর্ণার দ্বারস্থ হ'তে হলো তাকে?

কি লজ্জা, কি লজ্জা! এতদিন যাকে তুচ্ছ হেয় মনে করেছে সেই উদ্বাস্তু মেয়েটা কেমন অক্লেশে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল দিবাকরকে?. কি ছিল ঐ ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু মেয়েটার, যার টানে দীর্ঘ তের বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা এ সংসার মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেল দিবাকরের কাছে?

বড্ড পুরনো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে রমা। তাই কি? তাই দিবাকর ছুটেছে নতুনের মোহে, পুরনো যা' কিছু তুচ্ছ করে? কিন্তু মেয়েটা তো নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক নয়? যা শোনা যায় বহুজন ভোগ্যা এক স্বৈরিণী মাত্র। তবে? তবে কি, সেই শাশ্বত সত্য চরিত্রহীন, বহুজন ভোগ্যা নারীই পুরুষের মন কাড়ে—কথাটাও প্রযোজ্য দিবাকর ক্ষেত্রেও। মুখে যতই বড়াই করুক না কেন—আসলে দ্বিচারিণী, স্বৈরিণী, নটিনী, এরাই তো পুরুষের মন কাড়ে? মনের গহনে এদেরই ছবি বুকে ঝুলিয়ে—সুরুচি ও নীতিশাস্ত্রের শ্লোক আওড়ায় ওরা, পুরুষেরা। দিবাকরও তার ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু কি অদ্ভুত। কাল সে কোলকাতা যাচ্ছে একা। এবার দিবাকর গেল না সঙ্গে। জীবনে এই প্রথম। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তের বছর আগে এক উনিশে নভেম্বর এই সংসারে তার আগমন ঘটেছিল। আর আগামীকাল তের বছর পর সেই উনিশে নভেম্বরই ঘটবে এই সংসার থেকে তার নির্বাসন। জন্ম আর মৃত্যু যেন লিখে গেল একই দিনে। তের সংখ্যাটাকে অপয়া বলে মনে করে খ্রীস্টানরা। সত্যি কি তাই? সত্যি হোক, মিথ্যে হোক তার নিজের বেলা কিন্তু সত্যি বলেই প্রমাণিত হলো। যেতে হ'বে—যাবেই সে। কিন্তু তারপর? কোন পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াবে সে?

"বৌদিমণি গো, বারোডা বাইজ্জা গেল। খাইবেন কখন?" পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বিমলা বলে।

"ভাল লাগ্‌ছে না। এ বেলা খাবো না আমি—"

"কিয়ের লাইগ্যা? না খাইয়া কি থাকন্ যায়? লন্ লন ওঠেন, খাইয়া লন্"।

ঠিকই তো? খাবে না কেন সে? কিসের শোক—কার জন্যে শোক? দিবাকর? কে দিবাকর?. তারজন্যে দেহপাত করবে কেন সে? দিবাকর কি তার কথা ভেবেছে—না ভাবে? সেই বা কেন ভাববে দিবাকরের কথা? এ দেহ তার নিজের। এ দেহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার নিজেরই ওপর। এ দেহ নষ্ট হ'তে দেবে না সে।

কিন্তু খেতে বসে খেতে পারে না রমা। সব কিছুই কেমন জানি বিস্বাদ মনে হয় তার। গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। কেন যে এমন হয় কে জানে। নেড়ে চেড়ে কিছু খায়, কিছু ফেলে এক সময় উঠে পড়ে রমা। সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কেমন যেন গরম লাগছে। মেঘে ঢাকা আকাশ। হয়ত রাত্রে বৃষ্টি হ'বে। শীতের দিনের বৃষ্টি ভীষণ বাজে লাগে। কিন্তু এ অঞ্চলে এ সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়েই। লোকে বলে বৃষ্টির জন্যেই চায়ের প্রাচুর্য এ অঞ্চলে।

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় জর্জরিত হয়ে ওঠে রমা। কি করা উচিত তার? কোলকাতা না হয় গেল। কিন্তু কতদিন বাপের বাড়ি থাকা যায়। এক সময় ওঁরাই তাকে এখানে ফেরৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সে তো এখানে ফিরে আস্‌বার জন্য কোলকাতা যাচ্ছে না? তবে কি শাশুড়ীর কাছে চলে যাবে? ওখানে দিদি আছেন, দিনান্ত আছে। কিন্তু ওখানেও কতদিন থাকতে পারবে সে? ভেবে কূল পায় না রমা। তবে কি আত্মহত্যা করবে? সবার করুণা মাখা দৃষ্টি এড়াতে মৃত্যুই একমাত্র পথ। কিন্তু দীপু? দীপুর কি হ'বে? ঐ রাক্ষুসীর কবলে দীপুকে তুলে দিয়ে মৃত্যুর অমৃতপান করাবে সে? না, কক্ষণো না। সে বাঁচবে—বেঁচে থাকবে দীপুর জন্যেই বাঁচতে হবে তাকে

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে রমা। আর ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না সে। আজ এখন এই একাকীত্ব অভিশাপ বলে মনে হয়। যেন দিনক্ষণ বুঝেই রোমেলের জন্মদিনে নেমন্তন্ন হয়েছে দীপুর। দীপু থাকলে ওর সঙ্গে ক্যারাম বা বাগাটেলী খেলা যেতো। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে দুজনে গলা জড়িয়ে ঘুমিয়েই পড়তো। নিখিলটাও নেই। বোম্বে গেছে। ওর সঙ্গে আড্ডা জমে না বটে—তবু ও থাকলে, আর কিছু না হোক পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় কাটতো। সবচেয়ে ভাল হতো এখন যদি কাজল আসতো। আহা, বেচারী দু'ঘণ্টা ধরে

অপেক্ষা করে গেছে, কোথায় গেছে কে জানে? ও এলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেতো—টেরই পেতো না রমা। হাসি, ঠাট্টা, গান দিয়ে সব চিন্তা ভাবনাকে হটিয়ে দিতো খান্ খান্ করে। "হে ভগবান, ওকে একবার এনে দাও। ওকে এখন আমার ভীষণ দরকার—।" জোরে জোরেই বলে রমা।

শোবার ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় রমা। চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখে। কত মিষ্টি মধুর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এ ঘর। মাঝে মাঝে কিছু গোলমাল আছে বটে, কিন্তু তাতে এর মাধুর্য্য একটুও কমে যায়নি। কাল, হ্যাঁ কাল বারোটার পর—চব্বিশ ঘণ্টা পর—এ ঘর ছেড়ে চিরবিদায় নিয়ে যাবে। আর কোনদিন ফিরে আসবে না—থাকবে না এ ঘরে। কাল সেই উনিশে নভেম্বর। এ সংসারে আগমন ও নির্গমনের দিন। জন্ম মৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। দূর ছাই কি হবে এসব ভেবে। তার চেয়ে গোছগাছ করে নেওয়াই ভাল।

আলমারী খুলে কাপড় চোপড় নাবায়। না, দিবাকরের দেওয়া কোন কিছুই সে নেবে না। বাপের দেওয়া গয়নাগাটি, কাপড় চোপড় বেছে বেছে আলাদা করে রাখে। বিয়ের সময় বাপের বাড়ী থেকে পাওয়া ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশ নিয়ে গুছাতে বসে রমা।

* * *

টেলিগ্রাম। সঙ্গে টেলিগ্রাম পিওন। কাজলের নামেই টেলিগ্রাম। খুসী মনে টেলিগ্রামখানা রাখে। কিন্তু খুলে পড়েই মুখের চেহারা পাল্টে যায় কাজলের। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

[illegible] কোলকাতা হেড-অফিসের টেলিগ্রাম। জানিয়েছে দু'একদিনের মধ্যেই নতুন রিলিভার মিঃ দেবব্রত সেন যাচ্ছেন। তাঁকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে কাজল যেন গৌহাটী ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করে। এর অর্থ হলো, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের প্রত্যক্ষ তদারকিতে তাকে কাজ করতে হ'বে। তার ওপর কোম্পানীর আর কোন আস্থা নেই—ভদ্র ভাষায় তা' জানিয়ে দেওয়া হলো। রীতিমত অপমান জনক প্রস্তাব। আর ভরসা করে স্বাধীনভাবে তাকে কাজ করতে দিতে প্রস্তুত নয় কোম্পানী। এই পরিস্থিতির একমাত্র বিকল্প হচ্ছে চাকরীতে ইস্তফা দেওয়া। আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন লোক তাই করে। সেও তাই করতো। কিন্তু ভাগ্যমন্দ, এই মুহূর্তে সে তা করতে পারছে না। আর কর্মই হ'লো তার একমাত্র কারণ। সময় বুঝেই হঠাৎ যেন ডুব মারলো সে। চিঠিপত্র দিয়েও

কয়েকমাস যাবৎ সাড়া পাচ্ছে না তার। কণা যে এখন কোথায় আছে সঠিকভাবে তাও জানে না সে। দিন কয়েক আগে কোলকাতা থেকে অনুপ জানিয়ে ছিল বৃন্দাবন হয়ে কণার বেনারস পৌঁছানোর কথা দু'একদিনের মধ্যে। সেখান থেকে সোজা কোলকাতা আস্‌বে কণা। অনুপকে বলা ছিল কণা কোলকাতা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই টেলিগ্রাম করে জানাতে। অনুপের মনে করে উৎফুল্ল হয়ে খুলে ছিল টেলিগ্রাম খানা। কিন্তু হায় অদৃষ্ট মন্দ। জীবনে অনিশ্চয়তার ছায়া পড়েছে। চাকরী, কণা এবং রমা কোন ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে।

আর বসে থাক্‌তে পারে না। কিছু শলা পরামর্শ করে এখনই ব্যবস্থা করা দরকার। বজরঙ্গ বাবু তার অন্তরঙ্গ। তাঁর ওখানে এখনই যাওয়া দরকার। টেলিফোনে কোলকাতায় কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, অনুপ এবং সম্ভব হলে কণার সঙ্গে এখনই যোগাযোগ দরকার। আর অপেক্ষা করা হলো না। তাড়াতাড়িতে ম্যাগাজিনের একটা কোন ছিঁড়ে লিখল—"প্রয়োজনে ১৬৯ এ রিং করো। আমায় পাবে কাজল।" কাগজ-খানা রমাদের বাড়ীর ফোনের নীচে চাপা দিয়ে গেল।

বেলা বারোটায় ব্যাঙ্কের দরজায় সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ায় অর্পণা। কোণের টেবিল থেকে ওকে দেখে ওঠে এলো তারক। বাইরে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

"কি ব্যাপার বলোতো? একেবারে সোজা ব্যাঙ্কে চলে এসেছ?"

"ভীষণ-কাণ্ড"—চোখ মুখ লাল অপর্ণার।

"কি কাণ্ড?" তারকের কণ্ঠে উদ্বেগ।

"আজ বাড়ীতে একখানা চিঠি এসেছে। ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন—আমাকে পুত্রবধূ করতে তিনি প্রস্তুত। ভাল দিন দেখে চিঠি দিলেই নিজে এসে আশীর্বাদ করে বিয়ের দিন স্থির করে যাবেন। বাবা কালই চিঠিখানা নিয়ে দাদাভাইয়ের কাছে যাবেন। বাড়ীতে রীতিমত নৃত্য শুরু হয়ে গেছে।"

"ও এই কথা? তা' একটু নেচে নিক্ না তারা। ভয় পাচ্ছ কেন? অত তাড়াতাড়ি কিছু হচ্ছে না"

"বাঃ, কি চমৎকার কথা! জানো আলাপটা দাদাভাইয়ের খুব পছন্দের। বাবা এ চিঠি দেখাবার আগেই আমাদের কথা দাদাভাইকে বলা দরকার।

"কিন্তু দাদাভাইকে পাচ্ছ কোথায়? দাদাভাই সম্ভবতঃ জোড়হাটে। দু' একদিনের আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না।"

"ঠাট্টা হচ্ছে। এত খবর জান্‌লে কি করে?"

"যার গরজ সেই জানিয়েছে—"

"কে? ওঃ, বুঝেছি তোমার কাজলদা?"

"ঠিক ধরেছ! কাজলদা, থুড়ি ঐ কেলোটাই খবর দিয়েছে। অবশ্য বিনা কারণে নয়। আরও একখানা চিঠির খসড়া নিয়ে এসেছিলেন কাল সন্ধ্যায় টাইপ করতে। করতে পারেননি। ফিতে ছিঁড়ে গেল। আজ সকালে আমিই টাইপ করে দিলাম। ঘণ্টাখানেক আগে নিয়ে গেলেন। ডাকে পাঠালে সময় মত বৌদির হাতে পৌঁছবে না অথচ আজই বৌদির চিঠিখানা পাওয়া বিশেষ জরুরী। বলেছেন, এক ফাঁকে চিঠিখানা ওদের লেটার বক্সে নিজেই ফেলে দেবেন।

"সব কিছু জানার পরও চিঠিখানা টাইপ করে দিলে তুমি?"

"দিলাম। এতকাল পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এসেছে কেলোটা। তার বিরুদ্ধেও যে চক্রান্ত হতে পারে এবার টের পাবে বাছাধন। এই দেখো, ড্রাফট আর টাইপ কপি। লিখেছেন—"গতকাল শহর ছাড়ার আগে সেই কালো মেয়েটিকে ওদের শান্তিপাড়ার বাড়া থেকে তুলে নিয়ে গেছেন মিঃ চৌধুরী। সম্ভবতঃ জোড়হাটই গেলেন তাঁরা।" গাড়ীর নম্বর ও দেওয়া হয়েছে—।"

"সর্বনাশ, এতো বড় মিথ্যে—"

"কেলোর মতিভ্রম হয়েছে। আজই মিসেস চৌধুরীর কাছে খবরটা পৌঁছানো দরকার। এর কারণ ব্যক্ত করতে রীতিমত তোতলাতে হয়েছে কেলোচন্দরকে। ব্যাপারটা স্পষ্ট। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। আজই আমরা অভিযান শুরু করবো। শোনো, চারটেয় ছুটি হ'বে। বেরোতে ধরো সাড়ে চারটে। ফোলিও ব্যাগে তোমার কাছে আগের ড্রাফট ও কার্বন কপিগুলি যা আছে নিয়ে, সাড়ে চারটের আগে, রেখা স্টোর্সের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করো। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় রাঙাবৌদির সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

"আমি যাব? বৌদি তো আমায় দেখলেই চটে যাবেন।"

"দূর বোকা! ভয় কি? আমি তো সঙ্গে থাকছি। হনুমানের সঙ্গে বাঁদরীকে দেখে রাঙাবৌদি খুসীই হবে না।"

"দ্যাখো বাঁদরী বলো না বলছি।"

"হনুমানের বউ বাঁদরী না হলে বলবে কি করে? ঠাট্টা তামাসা এখন থাক—। এখন পালাও। কাগজপত্র গুছিয়ে ঠিক সময়ে এসো।"

তারক অফিসের দিকে পা বাড়ায়—। অর্পনা ডাকে— "বাচ্চু, শোন একটা কথা।" ফিরে এসে তারক বলে, "কি হলো আবার?"

"আধঘন্টা আগে বৌদিকে রিক্সায় রেল গেটে দেখেছি। শুকনো কালো মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া—।"

"শান্তিপাড়া যাচ্ছিলেন?"

"না, ফিরছিলেন—"

"সর্বনাশ! নিশ্চয়ই কমলাবৌদির কাছে সব শুনে এসেছেন—"

"হে ভগবান—এখন?"

"যে করেই হোক সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় রাঙাবৌদির কাছে পৌছাতেই হবে।"

*　　　*　　　*

ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ গুছিয়ে একটু শুয়ে ছিল রমা। একটু তন্দ্রা এসেছিল। গ্রিলের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ধড়মড় করে উঠে বসে। কে এলো? কাজল? কিন্তু এভাবে তো কড়া নাড়ে না কাজল? তবে কে এলো? বিমলাই এসেছে—। ঘড়িতে তখন মাত্র দুটো।

"এতো তাড়াতাড়ি এলে আজ এখন তো মাত্র দুটো।"

"হ' তরাতরিই আইলাম। দিনের গতিক ভালো না। তরাতরি কাম সাইর‍্যা যামু গা। ঘরে দুইডা ছুটু মাইয়ার ল'গে পোলডা রইছে। ঝড় তুফান অইলে কান্‌ব।" কাজ করতে করতে আপন মনে বকর বকর করে চলে বিমলা।

রমা উঠে শেষবারের মতো গোছগাছ সেরে নেয়। দিবাকরের দেওয়া গয়নাগাটি, চন্দন কাঠের বাক্সে ভরে ভাল করে প্যাক করে দিবাকরের আলমারীর দেরাজে রাখতে গিয়ে চোখে পড়লো বাতিল হয়ে যাওয়া জামা কাপড়ের থাকের মধ্যে সযত্নে গোপন করে রাখা প্লাষ্টিকের কাভারওয়ালা ফাইলখানা। রহস্যের গন্ধ পায় যেন রমা। আশ্চর্য, এতদিন তো চোখে পড়েনি এই ফাইল। টেনে বার করে দেখে এক গুচ্ছ পারিবারিক চিঠিপত্রের দপ্তর। দাদা, মা, বৌদির চিঠির ঝাঁপি! কেন এতো সংগোপনে রেখেছে চিঠিগুলি? দেখতে হচ্ছে কি গোপন রহস্য লুকানো আছে এর ভেতর। নিজের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ফাইল খানা ঢুকিয়ে দেয় রমা।

দিবাকরকে চিঠি দিতে হবে। গায়নাগাঁটি মায় গত বছরের জড়োয়ার নেকলেসখানা রেখে যাচ্ছে, শাড়ী কাপড় সহ, কিছুই নিয়ে যায়নি সে—এ কথা জানানো দরকার। কাগজ কলম নিয়ে বসে রমা। অনেক কাটাকুটি করে কয়েকখানা কাগজ নষ্ট করে অবশেষে সফল হলো রমা।

কয়েক লাইনে বেশ গুছিয়ে লেখা হয়েছে। পড়ে ভাল লাগলো। লিখলো—"তোমার দেওয়া কাপড় জামা, সোনা দানা এবং গতবার উনিশে নভেম্বর তোমার দেওয়া সেই জড়োয়ার নেকলেশখানা রেখে গেলাম। চন্দন বাক্সে রাখা লিস্টের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ো। এগুলির স্বত্ব ত্যাগ করলাম আমি, চিরকালের জন্যে। যে মন নিয়ে এগুলি তুমি আমায় দিয়েছিলে সে মন তোমার হারিয়ে গেছে। আর যে মন নিয়ে এগুলি গ্রহণ করে নিজেকে গরবিনী বলে মনে হয়েছিল, অপমানে অসম্মানে সে মন আমার ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে। এগুলি রেখে গেলাম তারই উদ্দেশ্যে যে এখন তোমার মন প্রাণের দখল নিয়ে সগৌরবে বিরাজমান। প্রণাম রইল, বিদায়। ইতি— রমা।" না, কোন সম্বোধন ছিল না চিঠিতে।

চোখে পড়লো, দেয়ালে টাঙানো ওদের দুজনের সেই ফটোখানা। এখন আর কি কোনো প্রয়োজন আছে এর? হয়ত একদিন দিবাকর নিজেই নাবিয়ে ছিঁড়ে খুড়ে ফেলে দিবে ডাস্টবীনে। না সে সুযোগ সে দেবে না দিবাকরকে। চেয়ারে উঠে ফটোখানা খুলে নিজের ট্রাঙ্কে ভরে রাখে। কোন এক সুযোগে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

"বৌদিমণি গো, আইজ আমি তরাতরি যামু গা। মনে লয় তুফান আইল। পেরায় সব কামই সারছি, তয় দীপুবাবুর পড়নের ঘর, আর তুমার শোওনের ঘর ঝাড়াপুছা হয় নাই। কাইল এট্টু তরাতরি আইয়া কইরা দিমু। মাইয়া দুটার লগে পোলাডা—ঘর এক্কারে খালি। যামু? বৌদিমণি যামু?" বিমলার চোখে কাতর মিনতি।

"বেশ! কিন্তু মনে রেখো, কাল আমরা কোলকাতা যাচ্ছি। একটু সকাল সকাল আসতে হবে তোমায়।"

"কইলকাতা যাইবেন? কাইল? কথাডা তো শুনি নাই আগে?" শুকনো মুখে বলে বিমলা।

"দীপু আর আমি যাচ্ছি। তোমাদের দাদাবাবু থাকবেন—"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিমলা বলে, "হেই কথাডা কন। আমি ভাবছি বুঝি—"

"শোন, দেরী করো না। যেতে হয় পালাও। ও হ্যাঁ, শোন—" আলমারীর দেরাজ খুলে দুটো দশটাকার নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে রমা বলে—"বাচ্চাদের ভালমন্দ কিছু কিনে খাইয়ে দিয়ো।"

"ইয়ার আবার কি দরকার ছেল বৌদিমণি?" বিগলিত হাসি হেসে বলে বিমলা।

"কোন দরকারে নয়। এমনিই! কাল কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো।"

"কইতে আইব না। এক্কেরে ভুরেই আমু। তুয়ারডা বন্ধ কইর‍্যা ছাও বৌদিমণি।" ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় বিমলা।

পিছু পিছু বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমা। সামনের মাঠে জোড়া সুপুরি গাছের ফাঁকে ত্রস্ত বিমলাকে ছুটে যেতে দেখে। আহা বেচারী, মায়ের প্রাণ—বাচ্চাগুলির জন্যে ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। কেমন যেন গরম থমথমে ভাব। অস্বস্তি বোধ করে রমা। ঝড় হবে নাকি? কে জানে কেমন করে ঝড় তুফান হবে বলে ভবিষ্যৎ বানী করে বিমলা? সারা বছরই সব ঋতুতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এ অঞ্চলে, কিন্তু কদাচিৎ ঝড় হতে দেখেছে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়। বিশেষ করে বছরের এ সময়। তবে বিমলা এ কথা বলে কেন? হয়ত ওরা বুঝতে পারে। শুনেছে গ্রাম দেশের লোকেরা সকালের সূর্য দেখেই সেদিনের আবহাওয়া সঠিক বলে দিতে পারে। দেখা যাক বিমলার কথা ফলে কিনা!

কিছুই ভাল লাগছে না। এমনি একা একা থেকেছে আগেও কতবার কিন্তু কোন সময়ই এমন নিঃসঙ্গ মনে হয়নি নিজেকে। কেউ এলে ভাল হতো। কাজল সত্যি অদ্ভুত ছেলে। এত করে বলে দিলাম তবু কাল একবার এসে খবরও করলো না। ভোরে বেরিয়ে ছিল পিসিমাদের বাসে তুলে দিতে। দীপুর জন্য ফিরতে দেরী হলো। বাবু তু'ঘণ্টা বসে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন তাও জানিয়ে গেলেন না। সারাটাদিন কি নিয়ে এত ব্যস্ত? নাকি, বাইরেই চলে গেল হঠাৎ?

আশ্চর্য এখন বেলা মাত্র তিনটে অথচ সন্ধ্যার অন্ধকার যেন ঘনিয়ে এসেছে। ভারতের এই পূর্ব প্রান্তে ভোর হয় যেমন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যেও নামে তাড়াতাড়ি। বছরের এ সময় পাঁচটা সোয়া পাঁচটায় রীতিমত অন্ধকার হয়ে যায়। ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ ঢাকা বলেই এই তিনটেতে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা। ঝড় হবে কিনা কে জানে—? কিন্তু নির্ঘাৎ জোর বৃষ্টি হ'বেই।

দরজা বন্ধ করে খাবার ঘরে এসেই নজর পড়ে ফোনের দিকে। ফোনের নিচে এই ছেঁড়া কাগজটা গুজে রেখেছে আবার কে? বিরক্ত হয়ে তুলে নিয়েই দেখে কাজল লিখে রেখে গেছে দরকার হলে ১৬৯ নম্বরে রিং করতে।

নাঃ, বেশ লক্ষী ছেলে কাজল। সারাদিন নজরেই আসেনি তার।

কাজলের কোন দোষ নেই। দরকারে ফোন করতে বলেছে। দরকার? হ্যাঁ, দরকারই তো। কাজলকে এই মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন তার। দেরী করে না রমা। ফোন তুলে ১৬৯ নম্বরটা চায়। অপর প্রান্তে রিং হচ্ছে শুনতে পায়। কেউ যেন ফোন তুললো। ঢিপ ঢিপ করে ওঠে রমার বুক। সঙ্গে সঙ্গে শোনে হেড়ে মোটা গলায় কেউ যেন বলছে—"হেলু, হেলু, কৌন?"

"কাজলবাবু আছেন?"

"লাইন রাখিয়ে—" কিছু অস্পষ্ট কথা শোনা যায়—তারপরই কাজলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "কাজল বলছি। কে কথা বলছেন?"

"আমি, আমি রমা, তোমার মিষ্টি বৌ—" হঠাৎ যেন মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায়। কি ভাবছে কে জানে কাজল? ভাবুক।

"রমা? বাড়ী থেকে বলছো? কি খবর? আমি সেই তখন থেকে তোমার দেখার আশায় বসে আছি—"

"শোন দেরী করো না—এক্ষুনি চলে এসো—"

"মাত্র কয়েক মিনিট! কোলকাতার একটা কল ম্যাচিওর করেছে ওটা সেরেই—।"

"না, দেরী করো না লক্ষ্মীটি। আমি বড্ড একা—ভীষণ একা। কলকাতায় কালও ফোন করতে পারবে। চলে এসো এক্ষুনি—"

"এই এলাম বলে—"

"দেরী হবে?"

"কয়েক মিনিট—ব্যাস—"

"তাড়াতাড়ি এসো—"ফোন ছেড়ে দেয় রমা।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রমা। নিজের বুকের ভেতর ধুক ধুক শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। কান দুটো গরম হয়ে গেছে। এ কী করলো সে। এভাবে নিজেকে মেলে ধরা কি ঠিক হয়েছে? কি ভাবছে না জানি কাজল? ভাবছে? ভাবুক যা' খুশী!

শোবার ঘরে এলো। ঘরটা রীতিমত অন্ধকার। ড্রেসিং টেবিলের আলো জ্বেলে দিল। ঝলমল করে হেসে ওঠে সারা ঘর। কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরে বেতের সোফায় দু'পা তুলে বসে থাকে রমা।

দমকা হাওয়া এসে জানালার পর্দাগুলি নাচিয়ে দিয়ে গেল। ঝড় শুরু হলো কি? রমার মনেও ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। এভাবে কাজলকে আমন্ত্রণ না জানালেই কি চলতো না? বিদ্রোহী মন প্রতিবাদ

করে ওঠে—। না, চলতো না। এই নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী যদি বেছে নিতেই হয়, তবে কাজল ছাড়া আর কে আছে এমন মূল্যবান? কিন্তু দিবাকর? তার প্রতি আনুগত্য? ফুঃ, কে দিবাকর? কিসের আনুগত্য? দিবাকর যদি ছলনা করতে পারে, পারে বঞ্চনা করতে, সে কেন চুপ করে সইবে। না, সে সইবে না, কখনও না। শঠে শাঠ্যং—।

প্রবল বেগে বাতাসের ঝাপটা—দরজা জানালা কাঁপিয়ে দিল। ছুটোছুটি করে সব ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করলো রমা। রীতিমত সন্ধ্যার অন্ধকার অথচ ঘড়িতে মাত্র সাড়ে তিনটে। বাইরে ধূলোর ঝড়। ফিরে এসে, বেতের সোফায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে। উত্তেজনা ও ভয়ে শির শির করছে সর্বাঙ্গ। এখনও কাজল এলো না। কেন?

হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল আলো। সর্বনাশ এখন উপায়? ফিউজ জ্বলে গেল কি? সে তো ইলেকট্রিকের কিছুই জানে না। এখন যদি কাজল থাকতো? কাজল জানে। একদিন ফিউজ ঠিক করে আলো জ্বেলে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় এক মর্নিংশোতে দেখা ইংরিজি ছবি "কংকারড্" এর কথা। কাজল যেন জন, সেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, ভিক্টর দিবাকর। আর সে? সে কি রোজা—রোজালিন? সেই শাশ্বত ত্রিকোণ সমস্যা? কিন্তু রোজা কি জনকে ভালবেসে ছিল? কাজল বলে, "বোধহয় না।"- ঠিকই বলেছে কাজল। সে কি কাজলকে ভালবাসে? না, বোধহয় না। তবু কাজলকে ভাল লাগে। তার সঙ্গ উপভোগ করে, তরল প্রাণবন্ত সেই সঙ্গ। কিন্তু কাজলের জন্যে মন কাঁদে না—যেমন কাঁদে দিবাকরের জন্যে। দিবাকরকে ভুলতেই কাজলের সঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু ভালই যদি না বাসবে রোজা, তবে জনের সঙ্গে মিলিত হলো কেন? কিসের আশায়? জনের আলিঙ্গন চুম্বনে নিজেকে সঁপে দিয়ে তৃপ্তির হাসি ফোটে কেন রোজার চোখে মুখে? কাজল বলে, "যৌনতাকে ওরা পাপ বা অন্যায় বলে মনে করে না কখনও। নিত্য নৈমিত্তিক অসংখ্য দৈহিক প্রয়োজনের মত যৌনতাকে মেনে নিয়েছে ওরা। প্রয়োজনে ওরা উদ্বেল আবেগে ভেসে যায়—, কিন্তু প্রয়োজন শেষ হলেই ভুলে যায় সব। রোজা আসলে ভালবাসে পরনারী আসক্ত ভিক্টরকেই!" কথাটা কিন্তু ঠিক বলেনি কাজল। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক রোজা ভালবাসে ভিক্টরকেই -যেমন সেও ভালবাসে দিবাকরকে এখনও। রোজার ভালবাসাকে তুচ্ছ করে, অবহেলা করে পরনারীতে ভিক্টরের আসক্তিই রোজার ক্ষোভের কারণ, বেদনার কারণ। তার এই প্রাণভরা প্রেমের অপমানে বিক্ষুব্ধ রোজা

শুধু প্রতিশোধ নিতেই জনের আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছিল। তবে কি সেও তাই করতে চায়? দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রমা। যেন এ প্রশ্ন থেকে নিজেকে আড়াল করতে চায় সে।

অন্ধকার ছেয়ে ফেলেছে সারা পৃথিবী। অন্ধকার ঘরে নিঃসঙ্গ একা বসে রমা। ভয় ভয় করছে—ভীষণ ভয়। পৌনে চারটে বেজে গেল—কিন্তু কোথায় কাজল? কেন সে এত দেরী করছে? কতদূরে বজরঙ্গবাবুর গদি? তীব্র বিদ্যুতের ঝলকে সমস্ত ঘর ঝলসে উঠে—পর মুহূর্তে দ্বিগুণ অন্ধকারে ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় কড়াৎ—দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে বাজপড়ার প্রচণ্ড শব্দে চম্‌কে উঠে নিজের দু'কান চেপে ধরে রমা। বড্ড ভয় লাগছে তার। একা ঘরে বসে থাক্‌বে কি করে? বেরিয়ে যাবে বাইরে? কিন্তু তা কি করে হ'বে? ঐ আবার। কি আলোর ঝলকানি আর প্রচণ্ড শব্দ। হ'চ্ছে তো হচ্ছেই—। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। মনে হ'চে যেন টিনের চাল ফুটো হয়ে যাবে। কি করবে রমা? ঘর যে একেবারে অন্ধকার। কোথায় দেশলাই, কোথায় মোমবাতি, কোথায় কি? নড়ে চড়ে খুঁজে পেতে দেখবে এমন সাহসটুকুও অবশিষ্ট নেই আর। ভয়ে জড়সড় হয়ে বেতের সোফায় বসে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে রমা।

ঝন্ ঝন্ ঝন্। আৎকে ওঠে রমা। বারান্দার গ্রীলের দরজা ধরে টানাটানি করছে কে? ভয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় রমা বলে, "কে?" হাত পা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে তার। "খোল, খোল, আমি, কাজল। একেবারে ভিজে গেছি। শিগ্‌গীর—।" ভয় ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড উল্লাসে দুলে ওঠে রমার বুক। কাজল, কাজল এসেছে! চিৎকার করে বলে "যাই।" উঠে দাঁড়ায় রমা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যায় সে।

* * *

কোলকাতার অফিসের কলটা পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দীর্ঘ ছ'মিনিট কথা হলো। রাজী হলেন তিনি। সেনকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েই কোলকাতা অফিসে জয়েন করতে বল্লেন। জানালেন এই মর্মে কালই চিঠি পাঠান হ'বে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ভুঁড়ি বাগিয়ে ছুটে বেরিয়ে রিক্সায় উঠে বসে কাজল। প্রবল বাতাস—ধূলো উড়ছে—আকাশ মেঘে ঢাকা। বিকেলেই সন্ধ্যার অন্ধকার। দুর্যোগ আসন্ন। জোর বৃষ্টি নামবে। তার আগেই পৌঁছোতে হ'বে রমার কাছে। রমা-রমা-রমা, উঃ কার মুখ দেখে

ঘুম ভেঙেছিল আজ! তাকে কাজলের হাজার সেলাম। এতদিনে পাথর টলেছে। পুলকে রোমাঞ্চিত কাজল।

কণা যদি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে—যাক্ না। রমা তো আছে? রমা কোলকাতা যাচ্ছে। সেও যাচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই। দিবাকরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েই গেছে। দিবাকরের অন্নে রুচি নেই তার। সুতরাং শেষ পর্যন্ত উপার্জনের পথ দেখতেই হ'বে রমাকে। এই ব্যাপারে সেই হবে দিশারী একবার কোলকাতা নিয়ে ফেলতে পারলে—রমাকে মূলধন করে—। আঃ কি আনন্দ। শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো সে। ধরা দিল তবে বন-হরিণী। রমার গলায় কি আবেগ—কি আকুলতা! 'আমি, আমি রমা,—তোমার মিষ্টি বৌ।' হুং-বাবা—লেডি কীলার কাজলের হাত এড়াতে পারে এমন মেয়ে আছে ত্রিভুবনে? তবে হ্যাঁ। দারুণ শক্ত মেয়ে বটে, স্বীকার করতেই হ'বে। "এই রিক্সা-জোরসে। জলদি চলো—!" তর সয় না কাজলের। না, এই ধূলো বালি মাখা ময়লা জামা কাপড় পরে সে যাবে না। বাড়ী গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে—জামা কাপড় পাল্টে 'পিয়া মিলনকো যানা—।' সময় নেই দেরী করা চলবে না।

ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা হাত মুখ মুছে পরিষ্কার হলো কাজল। গায়ে পাউডারের ঘন প্রলেপ বুলিয়ে ধোপ দুরস্ত পা জামা পরে—দামী চকোলেট রংয়ের সার্জের পাঞ্জাবী গায়ে চড়ালো। এই পাঞ্জাবীতে নাকি চমৎকার মানায় তাকে। রমাই বলেছিল কথাটা একদিন। মুখে স্নো ঘষে সারা গায়ে সেন্ট ছড়ালো। চিরুণী দিয়ে চুল পাট করলো। তখনই নজরে পড়ে—কণার চিঠিখানা। সেদিনের ডাকে এসেছে। খাম খুলে চিঠি বার করে পড়তে গিয়েও পড়ে না। খামে পুরে পাঞ্জাবীর বুক পকেটে রেখে দেয়। চিঠিখানার বিশেষ কোন মূল্য আর নেই। অনুপ সব বলেছে ফোনে। নতুন কথা কিছু নেই এতে। অনুপ যা' বলেছে, সেই কথাটাই কণার ভাষায় শুনতে হ'বে এই যা তফাৎ। কণা এখন তার কাছে মৃত। মৃতের প্রতি কোন দরদ নেই কাজলের। এ অধ্যায় শেষ হলো। নতুন অধ্যায় শুরু হলো রমাকে নিয়ে। এখন শুধু রমা—রমা আর রমা। উঃ, শেষ পর্যন্ত জয়ের মালা গলায় তুলবে তার। কী আকুল আহ্বান রমার কণ্ঠে। তবে বাবা, আর দেরী করা চলবে না। টাইপ করা খামখানা নীচের পকেটে ভরে নেয় সে। এর প্রয়োজন আছে। একি চারটে বেজে গেল! আর এক মিনিটও নয়। ছুটে বেরিয়ে পড়ে কাজল।

তখনও ঝড়ো হাওয়া বইছে, বিদ্যুত চমকাচ্ছে। থেকে থেকে মেঘ গর্জনে তালা লাগছে কানে। গলির মুখে পৌঁছুবার আগেই হলো বিপত্তি। তোড়ে বৃষ্টি নামলো। ভিজে একসা কাজল। গেট খুলে ভেতরে ঢোকে সে। কিন্তু একি সারা বাড়ী অন্ধকার। রাস্তায়ও কোন আলো নেই। এ দিককার কোন বাড়ীতেই আলো নেই। হয়ত গাছের ডাল পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে। যাক্ অন্ধকারই ভাল, কাজ সহজ হ'বে। চক্ষু লজ্জার দায় থাকবে না। লেটার বক্সে টাইপ করা চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে গ্রীলের দরজা ধরে টানাটানি করে কাজল। "কে?" কাঁপা কাঁপা ভীরু গলা শোনা যায় রমার। বিরক্ত কাজল। আমন্ত্রণ করে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে বলে। "খোল, খোল, আমি। আমি কাজল। একেবারে ভিজে গেছি। শিগ্গীর।" উত্তরে রমার গলা শোনা গেল—"যাই।"

বারান্দার দরজা খুলে, বারান্দায় এসে গ্রীলের দরজা খুলেই কাজলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে রমা—"এত দেরী করতে হয়? সেই কখন থেকে বসে আছি তোমার জন্যে একা একা।" দু'হাতে রমাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খায় কাজল। বলে, "এই তো এসে গেছি আমি—আর কোন ভয় নেই তোমার—।"

"ওমা? একেবারে ভিজে গেছ তুমি? কী সর্বনাশ। এসো, ভেতরে এসো। ভিজে কাপড় জামা ছেড়ে ফেলো। ঠাণ্ডা বসে যাবে বুকে।" সেই স্নেহময়ী নারী কণ্ঠ। রোমাঞ্চিত কাজল।

রমা শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। গ্রীল এবং বারান্দার দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় কাজল। বাইরের কেউ এ ঘরে প্রবেশ করে, তা আদৌ পছন্দ করে না রমা। তাই অভ্যাস বশে দরজায় দাঁড়িয়ে কাজল বলে, "জলদি! ভীষণ শীত করছে!"

"বারে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এসো, ভেতরে এসো। দেশলাই আছে অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।"

"ছিলো তো দেশলাই—কিন্তু জ্বলবে কি? ভিজে যা অবস্থা হয়েছে—" ঘরে ঢুকে দেশলাই বার করে জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাজল বলে, "নাঃ, একেবারে ভিজে গেছে—।"

"দাঁড়াও, এক মিনিট। ড্রয়ারে একটা টর্চ ছিল মনে হ'চ্ছে—" বলে রমা। সত্যিই ছিল এবং পেয়েও গেল তা। কাজলের মুখে টর্চ ফোকাস করে রমা। ভিজে কাকের মত দশা কাজলের, ব্যাকুল কণ্ঠে রমা বলে, "করছো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? খোল জামাটা, খোল শিগ্গীর—" নিজেই

হাত লাগিয়ে টেনে খোলে পাঞ্জাবী। গেঞ্জি কাজলই খোলে। পাশের চেয়ারে পাঞ্জাবী ও গেঞ্জি ছুঁড়ে দিয়ে, তোয়ালের অভাবে আলনা থেকে নিজের শাড়ীখানা টেনে নিয়ে কাজলের গা মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে রমা বলে, "কী সর্বনাশ—বুকে সর্দি না বসে যায়।"

আলনা থেকে দিবাকরের লুঙ্গীখানা টেনে এনে বাড়িয়ে দিয়ে বলে "ভিজে পায়জামা ছেড়ে আপাতত: এইটেই পর। খুঁজে দেখি "

"না, না, এতেই হ'বে—" পায়জামা ছেড়ে লুঙ্গী পরতে পরতে বলে কাজল। নিজের শালখানা খাটের বাজু থেকে টেনে নিয়ে কাজলের গায়ে জড়িয়ে দেয়। কাজল বলে—"আর কিছু দরকার নেই—শুধু তুমি কাছে থেকো।" রমাকে কোলের কাছে টেনে নিযে বেতের শোফায় বসে কাজল। কাজলের ডান বাহু দু'হাতে জড়িয়ে অনুযোগের সুরে রমা বলে, "সারাদিন কোথায় ছিলো গো তুমি?"

"বারে, সকালে পাক্কা দু'ঘণ্টা তোমার বাইরের ঘরেই কাটলো। অফিসের জরুরী টেলিগ্রামখানা এলো। বাধ্য হয়ে ছুটতে হলো বজরঙ্গবাবুর গদীতে টেলিফোন করতে। যাবার সময় লিখে রেখে গেলাম—।"

"ইস্, যদি আগে চোখে পড়তো! সারাটা দিন কি বিচ্ছিরি কেটেছে আমার—"

"এখন?"

"খুব ভাল লাগছে"—সলজ্জ হাসি হেসে বলে রমা।

"লক্ষ্মী,মিষ্টি বৌ—আমার—" রমাকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বলে কাজল। কাজলের ঘাড়ে মাথা রেখে মৃদুস্বরে ডাকে রমা, "কাজল।"

"বলো মিষ্টি—"

"আজ সকালে কমলাদির বাড়ী গেছলাম। কি শুন্‌লাম জানো? সব কিছু হয়ে গেছে অপর্ণার সঙ্গে। স্বচক্ষে দেখেছেন কমলাদি। নির্জন দুপুরে ওদের বাড়ীতে জড়াজড়ি করে শুয়েছিল ওরা।" রমার গালে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কাজল বলে, "সেদিন বলি'নি। জানো, আমিও দেখেছিলাম, আমাদের রিহার্সেলের সময় একটু রাতে অপর্ণাকে বুকে জড়িয়ে দাদাকে রিক্সা করে যেতে। মনে আছে? সেই যে একদিন কাজে আটকে গেছেন বলে ফোনে জানালেন দাদা? মেয়েদের বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার পড়লো আমার ওপর? মনে আছে?" "এতদিন একথা বলোনি কেন?" রেগে উঠে, নিজেকে কাজলের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত

করার জন্য ছটফট্ করতে করতে বলে রমা। বাহু বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে কাজল বলে, "সেদিন এ কথা বিশ্বাস করতে তুমি ? রিক্সার ব্যাপারটা মনে আছে ? তখন এই কথাই ভাবতে যে তোমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে, এ আমার এক বদমায়েসী চাল। বলো ঠিক বলেছি কিনা ?" শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে রমা বলে, "ঠিকই বলেছ, সেদিন সত্যিই বিশ্বাস করতুম না তোমার এ কথা---" ঘন হয়ে বসে রমা। কাজল বলে, "আজই শুনলাম, সকালে ব্যাঙ্কে গিয়ে। কাল নাকি শান্তিপাড়া থেকে বেলা সাড়ে তিনটেয় অপর্ণাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছেন দাদা– "

"কি ? কি বল্লে ? যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে জোড়হাট ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে রমা।

"জোড়হাট না কোথায় তাত বলেননি ভদ্রলোক ? বলেছেন বেলা সোয়া তিনটে কি সাড়ে তিনটেয় তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। একটু তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তখন– "

"কি দেখেছেন তিনি ?" হঠাৎ যেন রমার পেলব দেহখানা শক্ত পাথর হয়ে গেছে। ভ্রূক্ষেপ করে না কাজল। এই তো হ'বে। আঘাতে আঘাতে দীর্ণ করে কাবু করতে পারলে, তবে না বশ হবে রমা। ভোগের পাত্র মেলে ধরবে সামনে ! তাই বলে, "তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন ভদ্রলোক। তখনই দেখলেন, অপর্ণাদের বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিখানা দাঁড়িয়ে। একটু পরেই দেখলেন একখানা সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগ নিয়ে দাদা ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। পেছনে সেজেগুঁজে অপর্ণা। পেছনের সিটে উঠে বসলেন দু'জনে। গাড়ী ছেড়ে দিল।"

"তাই ?" গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রমা বলে, "সত্যি বলছো তুমি ? আমার গা ছুঁয়ে বলো।"

রমার একটি স্তনে মৃদু চাপ দিয়ে, হাত না সরিয়ে কাজল বলে, "মিথ্যে বলে লাভ ? ভদ্রলোক যা' বলেছেন, তাই বল্লাম। দাদার কথা হচ্ছিল। কত সামান্য অবস্থা থেকে কত বড় ব্যবসা গড়ে তুলেছেন তিনি। আজ দাদা এই ব্যাঙ্কের বড় বড় ক্লায়েন্টদের মধ্যে একজন। ব্যাঙ্কের সবাই চেনেন তাঁকে। কথায় কথায় বলেছিলুম একটা কিছু ঘটেছে, তা না হলে অফিসের হিসেবের খাতা, ফাইল পত্র নিয়ে বাড়ীতে বসে এত ব্যস্ত কেন দাদা। তারই সূত্র ধরে কথা প্রসঙ্গে ভদ্রলোক কথাটা বল্লেন। ভদ্রলোক মাত্র কয়েকমাস আগে জলপাইগুড়ি থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে দাদাকে তেমন চেনেন বলে মনে হয় না। অপর্ণা নাকি ওঁর বাড়ীর

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমা। অর্ধ অচেতন একটা মানুষকে সিঁড়ির গোড়া থেকে তুলে ধরে বেদম চড় ঘুষি মারছে রামলাল, মুখে তার বুলি, "হঠ্ যা শালে, শুয়ার কা বাচ্চা—।"

"একি হ'চ্ছে রামলাল ? এ কি করছো ?" ধমক দিয়ে ওঠে রমা।

"দেখিয়ে না বহুদিদি। এহি বেতমিজ পুলিশ লাইনকা মেথ্‌থর বিশুয়া। দারু পিকে মাতোয়ালা হো কর—।"

"ব্যাস্ ব্যাস্ আর না। ওকে ধরে গেটের বাইরে রেখে এসো। আর শোন, না বলে তুমি বাড়ীর বাইরে যাবে না। খালি বাড়ী—"

"ঠিক হ্যায় বহুদিদি—"

রহস্যের কিনারা পাওয়া গেল। মাতাল বিশুয়া টল্‌তে টল্‌তে ছুটন্ত গাড়ীর সাম্‌নে পড়েছিল। গাড়ীর ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ী থামায়—ওকে বকাবকি করে। ভয়ে পালাতে গিয়ে গেট খুলে ছুটে এসে গ্রীলের দরজায় সশব্দে পড়ে যায় বিশুয়া। সেই শব্দে ভয়ে কুপোকাৎ কাজল। কাপুরুষ আর কাকে বলে ? এই সাহস নিয়ে অবৈধ পরকীয়া প্রেমে মেতেছিল কাজল ? দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ঢোকে রমা।

ভাগ্যিস বিশুয়া এসে পড়েছিল—তা না হলে কি জঘন্য পরিণতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হ'তো তাকে! কাজল হ'তো তার উপপতি ? কি ঘেন্না কি ঘেন্না। সত্যিই ভগবান আছেন। অসহায় পথভ্রষ্টের সাম্‌নে এসে দাঁড়ান তিনি, রক্ষা করেন সমূহ পতনের হাত থেকে।

এখন কিছু করার নেই তার। বিছানা পাট করে বালিশে মাথা গুঁজে চোখ বুজে শুয়ে থাকে। মাথায় চিন্তার জট্। ঘুরে ফিরে শুধু দিবাকর এসে দাঁড়ায় সাম্‌নে তার। কেন এই বিকৃতি তার। কিসের অভাব ছিল দিবাকরের ? অপর্ণার মতো নিম্নরুচির মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কি করে ? ভাবতে ভাবতে ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে মাথা। না এ চিন্তার শেষ নেই—নেই কোনো কিনারা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই চিঠির ফাইলের কথা। দেখা যাক্ কি রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ গোপন চিঠির ফাইলে। ড্রয়ার খুলে ফাইল নিয়ে বসে। ঘড়িতে তখন পাঁচটা।

ফাইল খুলে, পাতা উল্টাতেই যে চিঠিখানা চোখে পড়লো। সেখানা দিদি অর্থাৎ দিবাকরের বৌদির লেখা। লিখেছেন—"মাসীমা রমাকে 'অলক্ষ্মী' বলেছিলেন। মা এবং ঠাকুরঝি সামনে থেকেও কোন প্রতিবাদ না করে প্রকারান্তরে কথাটা সমর্থন করে সত্যিই খুব অন্যায় করেছিলেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখো ভাই, ঘটনা চক্রে তোমার বিয়ের পর পরই যে সব

অঘটন ঘটে গেল এ সংসারে তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেকেলে গ্রাম্য অশিক্ষিত মনে এ ধরনের চিন্তা আস্তে পারে কি না? রমাকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সহায় সম্বলহীন তুমি, চ্যালেঞ্জ করে একা লড়াই করতে মেতেছ। অবশ্যই রমার পক্ষে এ গৌরবেরই কথা। তবু ভেবে দেখো ভাই, এতদূরে বিদেশ বিভুঁই-এ নিতান্ত অনাত্মীয় পরিবেশে তোমার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু। রমার কথাও ভেবে দেখা কর্তব্য তোমার। কচি মেয়ে রমা। বড়লোক বাপমায়ের আদরে সন্তান, সে কি পারবে এই অভাব অনটনে খাপ খাইয়ে নিতে? ওকে কষ্ট দিয়ো না। তোমার এক রোখা জিদ্ ছেড়ে ওকে নিয়ে চলে এসো। তোমার দাদার সাহায্যে, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে তোমায় কাজ কর্মের সুযোগ সুবিধা অনেক। তোমার দাদা ও আমি সব সময়ই তোমার সমর্থন করে এসেছি, আজও করি। সেদিনও তোমার দাদা, এই অসংযত উক্তির জন্যে মা মাসীকে ছেড়ে কথা বলেননি—সে কথা তোমার অজানা নয়। তাই অনুরোধ, আমার এবং তোমার দাদার মুখ চেয়ে, সব অভিমান দূরে ঠেলে, রমাকে নিয়ে চলে এসো—ইত্যাদি ইত্যাদি।" চিঠিটা ঊনপঞ্চাশ সালের।

আশ্চর্য্য, তাকে নিকে নিয়ে এত কাণ্ড হলো, অথচ কই সে তো এর বিন্দুবিসর্গও জানে না। দিবাকর জানতে দিতে চায়নি, সে ব্যথা পাবে বলে? তার জন্যে এত দরদ যার সে কেন হীন হবে, নীচ হ'বে? কোথাও কি ভুল হয়েছে তার? গালে হাত দিয়ে ভাবে রমা। স্ত্রীর সম্মানের জন্য এত দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে পথে বেরিয়েছে যে মানুষটা সুখ শান্তি, আপদ বিপদ তুচ্ছ করে, সে কেন পথভ্রষ্ট হ'বে? তবে কি সব মিথ্যা? এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে তারা? তবে কি দিবাকরের কথাই ঠিক?

চিন্তায় বাধা পড়ে। গ্রীলের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। কে আবার এলো? কাজল? না, ওকে ভেতরে ঢুকতে দেবেনা কিছুতেই। ফাইল-খানা বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ায় রমা।

আলো জ্বেলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমা। মুখোমুখী অপর্ণাকে দেখে ভূত দেখার মত চম্‌কে ওঠে সে। ইস্পাত কঠিন সুরে বলে, "তুমি কোত্থেকে এসেছ? কেন এসেছ?" ঘাবড়ে যায় অপর্ণা। গ্রীলের বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, "আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল বৌদি।"

"বৌদি! কথা ছিল! হঠাৎ এমন সময় এলে কি করে? কেন এসেছ? ও কোথায়?" চিবিয়ে চিবিয়ে বলে রমা। একসঙ্গে অতগুলি

প্রশ্নের কিছুই বোধগম্য হয় না অপর্ণার। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, "আপনি কি বল্‌ছেন বুঝতে পারছি না আমি।"

"ন্যাকা! কচিখুকি! কিছুই বোঝ না তুমি, না?" হঠাৎ তীব্র ধমকের সঙ্গে বলে, "ও কোথায়?"

"কার কথা বল্‌ছেন?" কাঁপা কাঁপা গলায় বলে অপর্ণা।

"কার কথা বল্‌ছেন?" মুখ ভেংগিয়ে বলে রমা—"কিছুই বোঝ না, না? জোড়হাট থেকে কি চলে এলে একা? দিবাকর কোথায়?" কেটে কেটে দাঁত কিড়মিড় করে বলে রমা।

"বাচ্চু"—কান্নামাখা অসহায় স্বরে বলে অপর্ণা। পেছন থেকে এগিয়ে এসে ছেলেটি আড়াল করে দাঁড়ায় অপর্ণাকে। বলে, "দরজা খুলুন রাঙা-বৌদি, আমাদের ভেতরে আসতে দিন—" হক্‌চকিয়ে যায় রমা। রাঙা-বৌদি বলে ডাক্‌ছে কে ছেলেটি? তবু দৃপ্তভঙ্গীতে বলে, "কে আপনি? আমি চিনি না আপনাকে। উনি বাড়ী নেই। অচেনা অজানা কাউকে এ সময় খালি বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিব না।"

"আমি বাচ্চু। শান্তিপাড়ার বাচ্চু। আপনার সেই হনুমান।"

"বাচ্চু? হনুমান? কিন্তু সে তো কলকাতায়?"

"হ্যাঁ ছিল। কলকাতায় ছিল, জলপাইগুড়িতে ছিল। এখন কয়েক মাস যাবৎ এখানে—"

"বাচ্চুই যদি হ'বে তবে এতদিন দেখা করনি কেন?"

"সে কথা বল্‌বো বলেই তো এলাম—।" ইতস্ততঃ করে রমা। যে বাচ্চুকে সে চিন্‌তো সে ছিল হাল্‌কা পাত্‌লা। গোঁফের রেখা ছিল, কিন্তু এমন বিরাট গোঁফ ছিল না তার। কি উদ্দেশ্য নিয়ে অপর্ণাকে নিয়ে এসেছে কে জানে? তাই বলে, "কিন্তু উনি যে বাড়ী নেই—"

"জানি। রাঙাদা জোড়হাটে—"

"কি করে জান্‌লে?"

"আপনাদের কাজল বাবুর কাছে শুনেছি—"

"কাজলকে চেনো?"

"হ্যাঁ খুব ভাল করে। তার কথাই তো বল্‌তে এসেছি। কিন্তু আপনি কি আমাদের ভেতরে ঢুক্‌তে দেবেন না? শীতে জমে যাচ্ছি আমরা—"

"হনুমান কক্ষনো আমার সঙ্গে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলেনি। তুমি সেই থেকে আপনি আপনি করছো কেন?" দরজা খুল্‌তে খুল্‌তে বলে রমা। এতক্ষণ পরে সে বাচ্চুকে চিনেছে বাঁ চোখের নীচে কাটা দাগ

দেখে। এক কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায় কাছাকাছি বাড়ীর স্থপারি গাছ থেকে পিছলে পড়ে বেড়ার বাঁশে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। ফার্ষ্ট এইড দিয়েছিল রমা নিজে। দাগটা আছে। ভেতরে ঢুকে এক নজরে দেখে নিয়ে লেটার বক্স আড়াল করে দাঁড়ায় তারক। অপর্ণা তখনও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

"কি ভেতরে আস্‌বে, না বাইরেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?" অপর্ণাকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে। তারকের দিকে ফিরে বলে, "এ মেয়েটা জোড়হাট থেকে কখন এলো রে?"

"ও যে জোড়হাট গেছ্‌লো জান্‌লে কেমন করে? রাঙাদা বলেছিলেন বুঝি?"

"ইয়ার্কি মারতে হ'বে না। তোর প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না। তোর রাঙাদা না বললেও জানার উপায় আমার আছে—" নাক ফুলিয়ে রমা বলে।

"তা আর বল্‌তে?"

"কি বল্লি?"

"কিছু না। অপর্ণা উঠে এসো।" তারপর রমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আমরা কি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌বো? বস্‌তে বল্‌বে না আমাদের?" তারকের কথায় লজ্জা পায় রমা, বলে, "আয় ভেতরে আয় তোরা।" রমা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালায়। তারক ও অপর্ণা পেছন পেছন ঘরে ঢোকে। বারান্দার আলো নিভিয়ে রমা বলে, "বোস্ তোরা।" "এই তো নিজের ফর্ম ফিরে পেয়েছ রাঙা বৌদি! সে কথা এখন থাক্। কাজের কথায় আসি। এ মেয়েটা জোড়হাট গিয়েছিল দাদার সঙ্গে এখবর তুটি উপায়ে তোমার জানা সম্ভব। এক হলো কারও শ্রীমুখের বানী, তুনম্বর হলো চিঠি।" একটু থেমে তারপর বলে, "উড়ো চিঠি।"

"মানে?" হতভম্বের মত বলে রমা।

"মানে পরিষ্কার। চিঠিটা এখনও হস্তগত হয়নি তোমার। সুতরাং কেউ বলেছে তোমায়! কাজলবাবু বলেছে না?"

"হয়ত তাই।" তাচ্ছিল্যের সুরে কথাটা বলে যেন পাশ কাটাতে চায় রমা। গম্ভীর হয়ে যায় তারকের মুখ। রমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গম্ভীর সুরেই বলে তারক, "রাঙাবৌদি, আমরা মস্করা করতে এই তুর্যোগের মধ্যে তোমার কাছে আসিনি। তোমার বিপদের কথা তুমি অনুমান করতে পারছো না। কমলা বৌদির কাছে কিছু শুনেছ তুমি আজ। তাঁর প্রত্যক্ষ করা ঘটনা, না?"

চঞ্চল হয়ে ওঠে রমা বলে, "এত কথা তোমরা জান্‌লে কেমন করে?"

"আজ সাড়ে এগারটায় রিক্সা করে শান্তিপাড়া থেকে তুমি ফিরছিলে। পর্ণা তোমায় শান্তিপাড়া রেলগেটে দেখেছিল। তোমার শুক্‌নো ক্লান্ত মুখ দেখে ছুটে ব্যাঙ্কে গিয়ে আমায় জানিয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম, চরম বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছ তুমি। তোমাকে বাঁচাতেই এসেছি আমরা—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।" বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দোলায়মান রমা বলে, "কি জান্‌তে চাও?"

"পর্ণা, মানে অপর্ণা, গতকাল রাঙাদার গাড়ীতে জোড়হাট গিয়েছিলো এখবরটা পেলে কি করে তুমি?"

"কাজল বলেছিল—"

"আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে? নিজের চোখে দেখে কাজলবাবু কথাটা বলেছিলেন তোমায়?"

"না, কাজল বল্লো ব্যাঙ্কের এক ভদ্রলোক, কি যেন নাম! ও হ্যাঁ তারক সরকার। নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং কথা প্রসঙ্গে সে কথা কাজলকে বলেছিলেন—।"

"তারক সরকারকে তুমি চেনো?"

"কি করে চিনবো?"

"এখন আমি যদি বলি, আমার নাম তারক সরকার। তা হলে?"

"যা, তা কি করে হ'বে? তোরা তো থাকিস্ তরুন সমিতি লেনে। আমাদের পুরনো বাড়ীর দুটো বাড়ী পরে। কিন্তু এই তারক সরকার থাকেন অপর্ণাদের বাড়ীর উল্টো দিকে রাস্তার ওপাশে একটু বাঁ ঘেষে। নতুন এসেছেন এখানে জলপাইগুড়ি থেকে বদলী হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে।" হো হো করে হেসে ওঠে তারক। অপর্ণার দিকে চেয়ে বলে "আসলে তোমার কেলোটা একটা বুদ্ধু।" তারপর রমার দিকে চেয়ে বলে, "রাঙাবৌদি, আমরা তরুণ সমিতি লেনে থাক্‌তুম ঠিকই। কিন্তু দাদারা নতুন বাড়ী তোলার পর এখন যেখানে আছি সে বাড়ীটা অপর্ণাদের বাড়ীর উল্টোদিকে একটু বাঁ ঘেষে।"

"বল্লেই হলো"—শ্লেষের সঙ্গে বলে রমা।

"যা সত্যি, তাই বলছি। বাচ্চু নামে আমায় চিন্‌তে তুমি, আদর করে ডাক্‌তে হনুমান। কিন্তু স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্রেও তো আমার একটা নাম আছে? সে নাম হলো তারক সরকার। আমার বাবার নাম স্বর্গীয় রজনীকান্ত সরকার, রিটায়ার্ড ষ্টেশনমাষ্টার, ডি. এস. রেলওয়ে।

প্রমাণ চাও ? 'এই ছাখ।" পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতড়ে পাঁচ ছয়খানা চিঠি বার করে রমার সামনে মেলে ধরে। বিস্ফারিত রমার চোখ। একটা বিরাট ধাঁধার মধ্যে পড়ে কেমন জানি মিইয়ে যায়। একটু পরে বলে, "কি বল্‌তে চাস্ তুই ?" "ভয় পাচ্ছ কেন রাঙাবৌদি! ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার পাশে আছি। এখন যাও তো লক্ষ্মী মেয়ের মত সেই উড়ো চিঠিগুলি নিয়ে এসো তো ? শেষ চিঠিটা এখনও হাতে আসেনি তোমার কিন্তু এসে গেল বলে!"

"তুই, তুই উড়ো চিঠির কথা জান্‌লি কি করে ?" স্থির দৃষ্টি রমার।

"সবই জান্‌বে ধীরে ধীরে। নিয়ে এসো না চিঠিগুলি। ঐ কেলো মানে তোমাদের কাজলচন্দ্রের বদমায়েসীর কিছু নমুনা দেখিয়ে যাই—"

"বদমায়েসী—?" আপনার মনে কথাটা উচ্চারণ করে রমা। তারপর শোবার ঘর থেকে চিঠিগুলি নিয়ে আসে রমা। এক একটি চিঠি—সেই সঙ্গে টাইপ কপি এবং সেই সঙ্গে কাজলের লেটার হেডে তারই হস্তাক্ষরে খসড়াগুলি মেলে ধরে তারক রমার সামনে।

থর থর করে কেঁপে ওঠে রমা। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। মনে পড়ে দিবাকরের কথাগুলি—'চিঠিগুলি যে পাঠাচ্ছে সে আমাদের গতিবিধি ভাল করেই লক্ষ্য করার সুযোগ পাচ্ছে।' দিবাকর তো ঠিক কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন সে ভুল বুঝেছিল দিবাকরকে। দিবাকর আরও বলেছিল 'তুমি কিছু আঁচ করতে পারছো না ? তোমার পক্ষেই তো তাকে চিনে নেওয়া সহজ।' দিবাকর তো ঠিকই আঁচ করেছিল! কিন্তু সহযোগীতা না করে সব কিছু সেই তো বানচাল করে দিয়েছিল ভুল বুঝে!

অপর্ণা এক মনে রমার মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে, "কাজলবাবু কি আজ এসেছিলেন ?" মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে যায় রমার, কড়া স্বরে বলে, "সে কথা তোমাকে বল্‌বো কোন প্রয়োজনে ?" চুপ সে যায় অপর্ণা, কিন্তু প্রতিবাদের সুরে তারক বলে, "প্রয়োজন আছে বৌদি। তোমার বিপদের কথা সর্বপ্রথম ওর মনেই এসেছিল। কিন্তু কি করে প্রতিরোধ করবে সে ? তবু সাহস সঞ্চয় করে কাজলকে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেবার জন্যে রাঙাদাকে অনুরোধ করেছিল। কাজলের স্বপক্ষে সেদিন রাঙাদা সোচ্চার ছিলেন। তা স্বত্বেও মরিয়া হয়ে অপর্ণার বার বার অনুরোধে বিরক্ত হয়ে ওকে চড় মারেন। পাশের ঘরের বিছানায় পড়ে ও যখন কাঁদছিলো, অনুতাপদগ্ধ রাঙাদা ওকে শান্ত করতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তখনই কমলাবৌদি এক নজরে দেখে পেছন ফিরে

চলে যান। এই হলো কমলাবৌদির প্রত্যক্ষ করা ঘটনা, আর এ ঘটনা যাতে তোমার কানে পৌঁছোয় সে জন্য কাজলবাবুর সে কি যুক্তির বহর!"

"কমলাদিও কাজলের পরিচিত? কই, ঘুণাক্ষরে ওদের কেউ বল্লেননি যে ওরা পরিচিত?"

"এর পেছনেও আছে কাজলের যুক্তি ও পরামর্শ। যাক্ আমাদের কাজ আমরা করে গেলাম। এবার আমরা যাব। তোমায় বিরক্ত করলুম কিছু মনে করো না। কাজলবাবু সম্পর্কে সাবধান। ওকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিয়ো না। আমরা জানি আজই সে চরম কিছু করতে আস্‌বেই।"

"কিন্তু আমারও একটা প্রশ্ন আছে, কাজলের মতিগতি সম্পর্কে অপর্ণা সন্দিহান হলো কেন?" রমার এই প্রশ্নে লজ্জায় মাথানত করে অপর্ণা। কি বল্‌বে সে? কিন্তু এবারও এগিয়ে এলো তারক। বল্লো, "রাঙাবৌদি, অপর্ণা সম্পর্কে তোমরা নানা রটনা শুনেছ। যা শুনেছ তোমরা তার চেয়ে নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল অপর্ণা। রীতিমত এক পাপচক্রের শিকার হয়েছিল সে। যদি আরও কিছুদিন আগে রাঙাদা ওদের পরিবারের ভাল মন্দের সঙ্গে জড়িত হতেন তবে বেঁচে যেতো অপর্ণা। একদল চোরাকারবারী এবং গুণ্ডা ওকে ব্যবহার করেছিল নিজেদের ব্যবসায়ে টোপ্ হিসেবে। সেই সময়েই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের মনোরঞ্জনের জন্যে যখন উপস্থিত তখন সেখানে কাজলের দেখা পায় সে। ঐ মাইফেলে তোমার ফটো দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে যে সব কথা সে বলেছিল তা আদৌ ভদ্র ও রুচি সম্পন্ন ছিল না। কাজলের নামধাম সে জান্‌তো না। কিন্তু ক্লাবের শাপমোচনে তোমার পাশে কাজলবাবুকে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এবং তারপরই রাঙদাকে সাবধান করার কথা ভাবছিলো।"

অপর্ণার দিকে তাকায় রমা। মেয়েটাকে কেন জানি হঠাৎ বড় ভাল লাগে তার। বলে, "এখুনি যাস্‌নে। একটু বস্ তোরা চা করছি।"

"ওরে বাবা, দেরী হয়ে যাবে বৌদি।"

"কত আর দেরী হবে? দীপুকে নিয়ে সাংমাদের গাড়ী আসবে আটটায়। ঐ গাড়ীতেই তোরা চলে যাবি, কেমন?" ওরা রাজী হলো।

খাবারের ঘরে এসে হীটারে চায়ের জল চাপায় রমা। বাচ্চু আর অপর্ণা, তার বিপদের কথা আঁচ করে ছুটে এসেছে তাকে রক্ষা করার জন্য। একটু আগে অপর্ণা জিজ্ঞেস করেছিল যে কাজল এসেছিল কি না! কাজল তো এসেছিল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো তা চরিতার্থ করে যেতো যদি না ভগবানের আশীর্বাদের মত মাতাল বিশুয়া এসে না পড়তো। এই

সত্য সে স্বীকার করবে কেমন করে? একি বলা যায়? কিন্তু শুধু কি কাজলই দায়ী? সে নিজে? সে কি কামনা করেনি কাজলকে? আমন্ত্রণ করে ডেকে আনেনি তাকে? স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করে কাজলের অঙ্কশায়িনী হয়নি সে? দিবাকর যদি চরিত্রহীন, লম্পট হয় সে নিজে তবে কি? নিদারুণ আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে তার অন্তর। অথচ অপর্ণা? এতকাল ঘৃণা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছে যাকে, তার বিপদের আশঙ্কায় ছুটে এসেছে। কে যে ভাল, আর কে মন্দ শুধু মুখের কথায় আর চোখের ভাষায় বোঝা কি সম্ভব?

মাছভাজা আর চা টেবিলে সাজিয়ে ওদের ডাকে রমা। কথায় কথায় রমা বলে, "হনুমান, উড়ো চিঠির হদিশ পেলি কি করে তুই?"

"সে এক রামায়ণ। শোনো তবে--" তারক বলে যায় কি করে কাজলের সঙ্গে পরিচয় হলো। অপর্ণার প্রতি তার মনের আকর্ষণকে মূলধন করে রাঙাদা ও অপর্ণার কাল্পনিক অবৈধ সম্পর্কের কাহিনী রচনা করে রাঙাদার প্রতি তার মন বিষিয়ে তোলে কাজল। ধীরে ধীরে চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ে সে। কিন্তু ঘটনাচক্রে আকস্মিক ভাবে অপর্ণার সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ হলো এবং তারই ফলে এই ফাঁদ থেকে কি করে বেরিয়ে এলো সে সংক্ষেপে সব কথা জানিয়ে বলে, "পরে অবসর সময়ে বসে সব বল্‌বো তোমায়।"

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে অপর্ণার দিকে চেয়ে রমা বলে—"দাদাভাইকে তুমি খুব ভালবাসো, না?"

"হ্যাঁ" ঘাড় নেড়ে বলে অপর্ণা। "শুধু যে ভালবাসি তাই নয়—আমার কাছে দাদাভাই আর ভগবানে কোন তফাৎ নেই। যে নরকে ডুবে ছিলাম, দাদাভাই ছাড়া কে পারতো সে পাঁক থেকে আমায় তুলে আনতে? শুধু দুঃখ এই, আরও কয়েকমাস আগে কেন দাদাভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো না। তা হলে ঐ নরকে পচে মরতে হতো না।"

"কেন? মরে গেছ নাকি?" তারক বলে।

"না, সে ভয় এখন করি না। বাঁচার মন্ত্র দিয়েছ তুমি—"

"একী রে? ব্যাপার তো বেশ গভীর মনে হচ্ছে? কিন্তু এর শেষ কোথায়?" মিষ্টি হাসি হেসে বলে রমা।

"ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে", নির্বিকার চিত্তে তারক বলে। "বুঝলাম, কিন্তু অপর্ণার বাবা, মা, দাদাভাই? ওঁরা রাজী হবেন?" রমা বলে।

"এমনিতে রাজী হবেন না জানি। কিন্তু তুমি পেছনে থাকলে রাজী না হয়ে যাবেন কোথায়?"

"কিন্তু হনুমান, ওর বাবা মা আমার কথায় রাজী না হলে?"

"কান টানলেই মাথা আসে। তোমার কথায় রাঙাদা আর রাঙাদার কথায় ওর বাবা মা—"

"না, তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু একটু মুশকিল হলো যে! কাল আমি কোলকাতা যাচ্ছি।"

"কলকাতা? কাল? কেন?" বিক্ষিপ্ত হয়ে বলে তারক।

"যাবার কথা ঠিক ছিল যে। তোর রাঙাদাই তো টিকিট করে দিয়ে গেছেন।"

"তোমার যাওয়া হ'বে না।"

"বারে! বল্লেই হলো। অত টাকা দিয়ে কেনা রিটার্ণ টিকিট!"

"রাঙাদার কাছে ও কিছু নয়। তবু দেখি। কটা টিকিট?"

"দেড়টা—আমার আর দীপুর।

"ঠিক হ্যায়! ফোন আছে কাছাকাছি?"

"তোর পেছনেই তো রয়েছে। চেয়ে ছাখ্—"

"তাই বলো!" ফোন নিয়ে বসে তারক। পাঁচমিনিট কথাবার্তা বলে, উঠে এসে বলে, "টিকিট দুটো বার করে রাখো দেখি। এখনই লোক আস্‌বে নিতে। বাবুরাম ধানুকার শাশুড়ীর এখন তখন অবস্থা। বাচ্চা ছেলে আর বৌকে পাঠাতে চায় কলকাতায়। সাতাশ তারিখের আগে কোন সিট পাওয়া যাবে না। আসাম ট্রেভেল্‌সের কারগো ফ্লাইটে পাঠাতে দোনামনা করছে। পুরো টাকা দিয়ে টিকিট দুটো নেবে। ওর লোক আস্‌ছে টাকা নিয়ে। টিকিট দুটো নিয়ে যাবে।"

"তুই দেখি লায়েক হয়ে উঠেছিস।" টিকিট দুটো এনে তারকের হাতে দেয় রমা।

ঘুরে এসে অপর্ণার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রমা বলে, "অপর্ণা এতদিন তোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছি। লোকের মুখে নানা কথা শুনে তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম তোকে। আমায় ক্ষমা করিস্ ভাই।" "বৌদি গো"—আর কিছু বলতে পারে না—হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে রমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে অপর্ণা। সস্নেহে ওকে বুকে তুলে নেয় রমা। কান্না ভাঙা স্বরে অপর্ণা বলে, "তোমায় আমি ভালবেসে ছিলাম।

তোমার কাছে থাকতে চেয়ে ছিলাম। সেদিন তুমি দাদাভাইয়ের কথায় রাজী হলে এতো নোংরা কাদা ঘাটতে হ'তো না আমায়—।"

"কাদাতেই পদ্ম ফোটে। সুন্দর পবিত্র সে ফুল।" ওকে বুকে জড়িয়ে চুমো খায় রমা।

বাইরে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ। হরিরামের মুদিম এসেছে। টাকা গুনে নিয়ে টিকিট দুটো দিয়ে দেয় তারক। রমার হাতে টাকা দিয়ে বলে, "তোমার যাওয়া বন্ধ। এখন বলো, কবে তোমার পাতে বসে খাব। মনে নেই ছোটবেলায় তোমার পাতে বসে আমি খেতুম ?"

"মনে থাক্‌বে না আবার! খুব মনে আছে। কাল তো হ'বে না. পরশু! হ্যাঁ পরশু তোরা দুটিতে সন্ধ্যার আগে চলে আসিস্। তিনজনে মিলে এক পাতে বসে খাব। তোর রাঙাদাও থাক্‌বেন। সেদিন তোদের ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করা যাবে। আসবি তো ঠিক ?"

"আস্‌বো না আবার ? ঠিক এসে হাজির হ'বো দুজনে।

বাইরে গাড়ীটা এসে থামলো। মিঃ সাংমা ঘুমন্ত দীপুকে কোলে করে নেবে এলেন গাড়ী থেকে। দীপুকে কোলে নিয়ে, রমা মিঃ সাংমাকে অনুরোধ করে তারক ও অপর্ণাকে শান্তিপাড়া রেল গেটে নামিয়ে দেবার জন্য ? সানন্দে রাজী হোন্ মিঃ সাংমা। ওরা চলে গেল।

সারাদিন হইহুল্লোড়ের পর ক্লান্ত হয় গভীর ঘুমে। জামা কাপড় পাল্টিয়ে—হাত পা ভিজে তোয়ালেতে মুছে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

হীটারে নিজের ভাত বসিয়ে শোবার ঘরে ফিরে আসে রমা ফাইলখানার পাতা ওল্টাতে। চোখে পড়ে বেতের শোফার নীচে শাড়ীখানা। কাজলের শরীর মুছিয়ে দিয়েছিল ওটা দিয়ে। হাত দিতে ধরতেও ঘেন্না হ'ছে এখন তার। ঝাড়নের লাঠি দিয়ে তুলে ধরতেই—একখানা খাম ছিটকে পড়ে মেঝেতে। খাম ? চিঠি—! এখানে এলো কি করে ? এটাই কি সেই উড়ো চিঠি, যার কথা বলে গেল তারক ? শাড়ীখানা ময়লা কাপড়ের ঝুড়িতে ফেলে, খাম খানা তুলে নেয় হাতে। খোলা খাম—ওপরে গোটা গোটা সুন্দর মেয়েলি হাতে কাজলের নাম ঠিকানা লেখা। টিকিটে কালী ঘাট পোস্টাপিসের ছাপ। এইটে এখানে এলো কি করে ? নিশ্চয়ই কাজলের পকেটে ছিল। জামা ছাড়বার সময় পড়ে গেছে। কি আছে চিঠিতে ? দেখবে ? কৌতূহল দমন করতে পারে না। চিঠিখানা বার করে চিঠির নীচে নামটা পড়ে নেয়। কণা রায়। কণা রায় ? কে সে ? পড়তে শুরু করে।

"কাজলবাবু,

এই চিঠি পড়ার পর, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো না কোনদিন। গুরুর কৃপায় আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের পায়ে আশ্রয় নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

তোমার জানা দরকার যে, যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যা' উত্তরাধিকার সূত্রে আমার প্রয়াত স্বামীর কাছ থেকে আমি পেয়েছি, সে সবই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে দান পত্র করে দিলাম। ব্যাঙ্কে মজুদ সাড়ে চার লক্ষ টাকা বিজ্ঞান কলেজকে দান করে দিয়েছি, প্রতি বছর একটি বা দুটি ছাত্রকে গবেষণার জন্য উপযুক্ত বৃত্তি দেবার কড়ারে। এই বৃত্তি আমার স্বর্গত স্বামী শেখর রায়ের নামে দেওয়া হ'বে। এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব।

আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু বলে আমাদের সংসারে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তোমার। ঘটিয়ে ছিলেন সরল বিশ্বাসী দেবতুল্য আমার স্বামী। পঠন পাঠন এবং আপন গবেষণা নিয়ে সদাই ব্যস্ত আমার স্বামী তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে ছিলেন, নিঃসঙ্গ আমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গদান করার মানসে। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সে কাজ তুমি করেছিলে আমায় ব্যাভিচারিণীতে পরিণত করে। আর তারই ফলে, কৃতী, মেধাবী এবং এক অনন্য বিজ্ঞান-প্রতিভা আমার অতি ভালমানুষ স্বামী উদ্দাম পাগল হয়ে রাঁচীর পাগলা গারদে একটি বছর শৃঙ্খলিত পশুর মত জীবন যাপন করে অবশেষে দেহরক্ষা করলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু তুমি? তুমি কিছুই করবে না?

তোমায় অভিশাপ দেবো না। কোন প্রতিশোধ নেবারও ইচ্ছে আমার নেই। শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাবো যেন আর কোন নারীর জীবন তোমার পাপ সংস্পর্শে এসে কলুষিত না হয়। তোমার অগণিত শিকারের মধ্যে আমিই যেন সর্বশেষ বলে গণ্য হই। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় শুভবুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা।

আশ্রমের শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের নাম গান করে বাকী জীবন কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তে কাটাব। কিন্তু তুমি কি করবে?

ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিতা

কণা রায়।"

সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয় রমা। বার

বার পড়ে চিঠিখানা। কি জঘন্য চরিত্র কাজলের। আর একেই কিনা সে বন্ধু ও সুহৃদ ভেবে নিজেকে সঁপে দিতে উদ্যত হয়েছিল? এই চিঠি পড়ে, পকেটে রেখে—প্রেমের অভিনয় করে চরম সর্বনাশ ঘটাতে এসেছিল লোকটা? সত্যি, শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে কণা রায়ের প্রার্থনা কেমন অদ্ভুত ভাবে ফলে গেল। দু'হাত জোড় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় রমা, সেই সঙ্গে কণা রায়কেও।

ভুল কি শুধু তার একার? দিবাকরও তো মজেছিল কাজলের ভালমানুষী দেখে? সত্যি দুধর্ষ অভিনেতা বটে এই কাজল! ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এসে ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছে রমাকে কাছে টানতে। গান শেখানোর ছলে, সিনেমা থেকে ফেরার পথে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ছেলেমানুষীর ভান করেও দেখলো তাকে টলানো সহজ নয়, তখন অন্য পথ ধরলো কাজল। দিবাকরের প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে তোলার চক্রান্ত। এক এক করে উড়ো চিঠিগুলি এলো। নিজে দূরে দাঁড়িয়ে—অত্যন্ত নির্বিরোধী, নিঃস্বার্থ চরিত্র ফুটিয়ে তুলে লক্ষ্য করেছে সব। তারক ও কমলাদিকে পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রে সামিল করতে বাঁধেনি তার। কিন্তু তা হলেও সব ষড়যন্ত্রই ভেস্তে যেত যদি না প্রশান্তের সঙ্গে দেখা হ'তো। সে যাই হোক্ দুর্ভাগ্যজনক হলেও এর ফলে লাভও তো কম হয়নি? দিবাকরকে নতুন করে দেখা, নতুন করে পাওয়া, নতুন করে ভালবাসা। হ্যাঁ, এর জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। তাতে কি ক্ষতি? মূল্য না দিয়ে মূল্যবানকে পাওয়া কি মুখের কথা?

আর দিবাকর? দিবাকর এত ভীতু কেন? কেন সে বল্লো না মরান নয়—প্রফুল্লদা অপর্ণার একটা ভাল সম্বন্ধ এনেছে তাই কথাবার্তা পাকা করতে তার না গেলেই নয়। সবই তো বলেছে অপর্ণা। প্রফুল্লদাই বা কেমন মানুষ? সেও তো জানাতে পারতো? আহা রে, বিনা দোষে অপমান করে নাবিয়ে দিয়েছিল বিছানা থেকে দিবাকরকে। কালো মুখ করে নেবে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বেচারী। দেয়ালের দিকে চোখ পড়ে রমার। সেই ফটোখানা নেই স্বস্থানে। ফটোর জায়গায় থাকবে না কেন ফটোখানা? ট্রাঙ্ক খুলে ফটোখানা বার করে বুকে চেপে ধরে। চেয়ার টেনে এনে স্বস্থানে ঝুলিয়ে দেয় ফটোখানা। কাল উনিশে নভেম্বর। ওদের বিয়ের দিন। কাল সন্ধ্যায় মালা দিয়ে সাজাবে ফটোখানা। এই রে? পোড়া গন্ধ! ভাত বসিয়ে এসেছিল যে।

খাবার ঘরে ছুটে আসে রমা। যা' হবার হয়ে গেছে। পুড়ে গেছে

ভাত। যাক্ গে! মাছভাজা, ডাল, তরকারী, মাছের ঝোল আছে। দু' স্লাইস রুটিও আছে। ওতেই হয়ে যাছে।

খেয়ে দেয়ে শোবার ঘরে এলো। তৃপ্তির আমেজে মন ভরপুর। সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাকী শুধু দিবাকরকে শান্ত করা। সে খুব কঠিন নাকি? কিন্তু কাল কখন আসবে দিবাকর? নিশ্চয়ই বিকেলের আগে নয়। ও তো জানতেই পারবে না যে তার রুমি চলে যায়নি? মুখ কালো করে ঘরে ঢুকবে। উঃ কি মজা হ'বে। না, অনেক হয়েছে বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাল সারাদিন অনেক কাজ। এই এখনই যা' সময়। এই বেলা ফাইলখানা যতটুকু পারা যায় দেখতে হ'বে।

ফাইল খুলে বসে রমা। পাতা ওল্টাতেই একখানা চিঠি—মা অর্থাৎ তার শাশুড়ীর লেখা চোখে পড়লো। কাঁচা হাতের লেখা, অসংখ্য ভুল বানানে ভরা। তা হোক—দ্বিতীয়ভাগের বিদ্যা নিয়ে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? লিখেছেন, "অনর্থক রাগের বশে বধূমাতাকে লইয়া দূর বিদেশে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ কর নাই। বিপদ আপদে সাহায্য সহায়তা কি করিয়া, কাহার নিকট হইতে পাইবে? পত্রপাঠ তাহাকে লইয়া চলিয়া আস। প্রথম পোয়াতি, বিশেষ করিয়া বধূমাতার মত কচি অনভিজ্ঞার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। তথাপি লিখি, যদি এখানে আমার কাছে পাঠাইতে আপত্তি থাকে—তবে তোমার শ্বশুরালয়ে অন্ততঃ পাঠাইবার ব্যবস্থা কর। তোমরা দু'জনেই অনভিজ্ঞ; কাছাকাছি কোন নিকট আত্মীয়ও নাই। অযথা বিলম্ব করিও না—।" ইত্যাদি। কথাটা যতই তেঁতো হোক, সেকেলে মা মাসীদের অন্তর ছিল স্নেহ-মাখা। তা' না হলে যে বৌকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্যের জন্যে ছেলে সব ছেড়ে চলে গেল—সেই বৌয়ের ভালমন্দের জন্যে এতখানি চিন্তা ভাবনা একালের মা মাসীরা করবে? উঃ, সেই মিষ্টি কচি মেয়েটার মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মার উপদেশ শুনলে হয়ত অকালে এক রকম বিনা চিকিৎসায় মেয়েটা চলে যেতো না। চিঠির তারিখ বারোই জানুয়ারী ১৯৫২। মেয়েটার জন্মের ছ'মাস আগের চিঠি। দু'হাতে কপাল টিপে চোখ বন্ধ করে নীরবে কাঁদে রমা।

ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্। সামনের জানালায় কেউ টোকা দিচ্ছে! কে? কাজল কি? ডাকবে নাকি রামলালকে? নাকি, বাইরের ঘরে শোবে বলে রামলালই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে? পর্দা তুলে, সাসির ভেতর দিয়ে নজর চালিয়ে কিছুই ঠাওর করতে পারে না রমা। কাঁচে প্রতিফলিত ঘরের

আলোতে বাইরের কিছুই স্পষ্ট বোঝা যায় না। টর্চ খানা তুলে ফোকাস্ করে। কাজল! আর কে হ'বে! আবার এসেছে হতছাড়া! ঠিক আছে, এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হ'বে!

ছিটকিনি তুলে, জানালার পাট সামান্য ফাঁক করতেই শোনা যায় ফিস্‌ফিস্ করে কাজল বল্‌ছে—"বাথরুমের দরজাটা খুলে দাও আমি এসে গেছি—মিষ্টি।" মিষ্টি? রি রি করে ওঠে রমা, বলে, "বাথরুমের দরজা দিয়ে নয়, ও দিকে রামলাল আছে। সাম্‌নের দরজার দিকে যাও। আমি যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে। সেই ভাল। উঃ, তখন যে ভয় পেয়েছিলাম। এসে সব বল্‌ছি"—কাজল সরে যায়।

একটু চিন্তা করে রমা। পেছনের জানালা দিয়ে রামলালের ঘরের দিকে ফাঁক দিয়ে দেখে। রামলাল আছে, ঘরে আলো জ্বলছে। কথাও শোনা যাচ্ছে। দু'একজন সাঙ্গদ দিয়ে রামলাল ঘরেই আছে। তা'হলে কণা রায়ের চিঠিখানা, উড়ো চিঠিগুলির ড্রাফট কপিগুলি নিয়ে বাইরের ঘরের টেবিলে রাখে। তারপর বারান্দায় আলো জ্বেলে—বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। গ্রীল ধরে সিঁড়িতে কাজল বিকশিত হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘেন্নায় সঙ্কুচিত রমা। লেটার বক্সে চোখ পড়তেই নজরে আসে সাদা খামখানা। "এক মিনিট" বলে ভেতরে চলে যায়—ফিরে আসে চাবি নিয়ে। চিঠিখানা বার করে বলে—"আবার উড়ো চিঠি—শেষ নেই।" চিঠিখানা খোলে, নিজের মনেই বলে চলে—"এ যে দেখছি সেই তারক সরকারের বয়ান। অর্পণাকে নিয়ে ও গেছে জোড়হাট। সবাই খবরটা জানে দেখছি—।" তারপর কাজলের দিকে চেয়ে বলে, দেখলে? তোমার কথাই ঠিক। তুমি যা বলেছিলে, এতেও তাই লিখা আছে—।

"উঃ, বড্ড ঠাণ্ডা! শিগগীর দরজাটা খোল—" কাজলের তর সইছে না। ও. হরি! দরজায় যে তালা। দাঁড়াও চাবিটা আনি।" আবার ভেতরে চলে যায় রমা। ফিরে আসে চাবির রিং আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে, বলে—"আচ্ছা এই উড়ো চিঠিগুলি পাঠাচ্ছে কে বলোতো? তুমি নও তো?"

"আ-আ-আমি? ছিঃ ছিঃ-এ সব নোংরা ব্যাপার আমার দ্বারা—"

"ঠিকই তো, তুমি নেংরামিতে যাবে কেন? তা কি কখনও হয়?" কাজলের মুখে হাসি ফোটে, রমা বলে—"দেখ তো চিঠিটা একবার?" গ্রীলের ফাঁক দিয়ে চিঠিখানা বাড়িয়ে দেয় রমা। "এ আর দেখে কি হবে?

শুধু শুধু সময় নষ্ট—” মৃদু আপত্তি জানিয়ে কাজল চিঠিখানা নেয়। চোখ বুলিয়ে বলে, “এতো সেই একই কথা। এ নিয়ে নতুন করে মাথা ঘামাবার কি আছে? নাও, আর দেরী করো না। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।” চাবিটা ভাল করে দেখে রমা বলে, “এই যাঃ। কোন চাবি আনতে কোন্‌টা নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, আমি ভাবছি—এই চিঠিটা কে দিচ্ছে? কেন দিচ্ছে? কি তার উদ্দেশ্য? তোমার কি মনে হয়?’

“কি জানি? বুঝতে পারি না—কি স্বার্থে এ ধরনের চিঠি দেয় মানুষ!”

“কিছুই জানো না, না? সত্যিই তো জানবে কি করে? ও হ্যাঁঃ—একটা মজার জিনিষ দেখাই তোমায়, একটু দাঁড়াও।” ছুটে গিয়ে বাইরের ঘরের টেবিল থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এসে বলে, “দেখ তো কাজল এই লেখা তোমার? তোমার লেটার হেড ও শেষ উড়ো চিঠিটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—”

“এ-এ-এ-তুমি কোথায় পেলে?” ভয়ে বিবর্ণ কাজলের মুখ। একখানা পা নিচের সিঁড়িতে নাবিয়ে দেয়—।

“যাচ্ছ কোথায়? ভেতরে ঢুকবার ইচ্ছে নেই বুঝি? শোন তোমার হাতের সব খসড়া এখন আমার হাতে। অর্পণা আজ সন্ধ্যায় আমায় দিয়ে গেছে—”

“অর্পণা? মানে রঞ্জনা? ও তো বাজারের বেশ্যা—”

“তোমার মত লোকের পল্লায় পড়ে—যেমন কর্ণা রায় পড়ে ছিল তোমার খপ্পরে। স্বামীকে হারিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে যা ছিল সব রামকৃষ্ণমিশন আর বিজ্ঞান কলেজে বিলিয়ে দিয়ে তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। এই নাও সে চিঠি। পড়ো। তুমি আবার মানুষ? একটা জ্যান্তো শয়তান। সাবধান, আর কোনদিন এ বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে পা বাড়িয়ো না। কয়েক জোড়া জুতো আছে, তারই একখানা ছিঁড়বো তোমার পিঠে। উনি কাল আসছেন। উড়ো চিঠির খসড়াগুলি তুলে দিব ওর হাতে, ওর কব্জির জোর টের পাবে এবার। আর দাঁড়িয়ো না—পালাও। ডিব্রগড় ছেড়ে পালাও, যদি বাঁচতে চাও।” বলার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালায় কাজল। খিল্ খিল করে হেসে ওঠে রমা।

* * *

ঘুম ভাঙলো কাক-ডাকা ভোরে। গাছের আগায় সূর্যের আলো। সারা আকাশে এক চিল্‌তে মেঘের আভাস নেই। আজ উনিশে নভেম্বর। তেরো বছর আগে এই দিনটিতে তার জীবনে এসেছিল দিবাকর। তেরো

বছর পর—আবার আস্‌বে দিবাকর নতুন রূপে, নতুন সাজে। আনন্দের শিহরণ বয়ে যায় সর্বাঙ্গে। ঘুমে কাদা দীপু। ওর কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে রমা বলে, "এই দীপু ওঠ। কি সুন্দর দিন, চেয়ে দেখ।" আর দেখছে! পাশ ফিরে লেপের নীচে ঢুকে যায় দীপু। "দূর বোকা হাঁদা—ঘুমো।" লেপ সরিয়ে ওর গালে চুমু খায় রমা।

পার্কের মালির পিয়ারীকে দিয়ে তিন খানা বড় মালা আর ফুলের তোড়া এনে দেবার ভার নিল রামলাল। সুখেনকে পাঠাল বাজারে মাছ, মাংস তরিতরকারীর লিস্ট দিয়ে। বিমলা আজ কথা রেখেছে। ভোরেই এসে হাজির। ওকে দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করান, পর্দা, কুশন কাভার, বিছানাপত্র পাল্টে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে তোলে রমা।

কোলকাতা যাওয়া হবে না শুনে দীপু মহাখুশী। বলে, "ভালই হলো মামণি! কোলকাতাটা পচা।" হাসে রমা। হাল্কা মনে, হাল্কা পায়ে ছুটোছুটি করে। এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছে রমা। বিষণ্ণ গুমোট অবস্থার পরিবর্তনে চাকর-বাকররাও খুসী।

বেলা সাড়ে দশটায় গাড়ী হাঁকিয়ে প্রফুল্ল এসে উপস্থিত! অবাক হয়ে রমা বলে, "এ কী ফুলদা, ব্যাপার কি? একেবারে বিনা নোটিশে এসে হাজির?"

"কি কস্—বিনা নোটিশে? কইলেই হইল? আমার হইছে জ্বালা, শাঁখের করাতের মাঝে—আইতেও কাটে যাইতেও কাটে। এক, দিকে ভইন একদিকে বন্ধু। গোঁসা কইর‍্যা তো কইলকেতা যাইতাছস্। তোরে হাওয়াই জাহাজে তুইল্ল্যা দেওনের ভার আমার উপর পড়ছে। বুঝছস্? কাইল রাইত তর কর্তার অর্ডার। গোছগাছ শ্যাষ করছস ত?"

"আমি যাচ্ছি কে বল্লো? আমি তো যাচ্ছি না—"

"অঃ! কয় কি? ইয়ার্কি মারছ?"

"সত্যি সত্যি আমি যাচ্ছিই না—"

চটে ওঠে প্রফুল্ল, বলে, "তোরা কি সিনেমা করতাছস্? সুচিত্রা উত্তমের পাট? অখন টিকিটের কি হইব?"

"হয়ে গেছে। তোমায় ভাবতে হবে না। তোমার বন্ধুর একটা পয়সাও নষ্ট হয়নি। টিকিট ফেরৎ দিয়ে পুরো টাকা পেয়ে গেছি—"

"অঃ, পুরো টাকা পাইছস্? কয় কি?"

"ঠিকই বল্‌ছি—। ট্রিকস্ আছে, বুঝলে ট্রিক্‌স্।'

"তইলে তো কাম সারছস্। অখন আর থাকনের কাম কি? এক কাপ চা খাওয়া। চা খাইয়া যাইগা—"

"উহুঁ বাবা, এসে যখন পড়েছ সহজে তোমায় ছাড়ি? ভুলে যেয়ো না পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। এখন তোমার যাওয়া হবে না। চান করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে তোমায় ছাড়বো।

"হ' হ' বুঝছি, বুঝছি। তর হাতে পড়লে রেহাই পামু অত সহজে। যাউক, এক কাপ চা খাওয়া—।"

আগাগোড়া সব ঘটনা প্রফুল্লের মুখে শোনে রমা। প্রায় প্রতিটি বিয়ের সম্বন্ধই এনেছিল প্রফুল্ল নিজে এবং তার বাড়ীতেই মেয়ে দেখানো ও কথাবার্তা হয়েছিল। শেষবারের সম্বন্ধও সেই এনে ছিল এবং দিবাকরের ডিগবয় যাওয়া সেই বন্ধ করতে জোর করেছিল কোন জরুরী কাজের অজুহাতে। দিবাকর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ডিগবয় যেতে না পারার দুঃখে, মিথ্যে অজুহাত দেখানোর জন্য অনুশোচনায় দিবাকরের করুণ অবস্থাতো নিজের চোখেই দেখেছে প্রফুল্ল। সব শুনে দিবাকরের প্রতি গভীর মমতায় গলে পড়ে রমা। তবু মেজাজ দেখিয়ে বলে, "লুকিয়ে এ সব করতে গেলে কেন?"

"ঐ মাইয়ারে ত' তুই দেখতেই পারস্ না। সব শুইন্যা যদি রাগ করস্? হেই ডরে—"

"বাঃ কি চমৎকার অজুহাত। কিন্তু বলো দেখি ক্লাবের চিঠি জাল করার কি দরকার ছিল? যখন মিটমাট করতে এগিয়ে গেলাম তখন ও মেজাজ দেখালো কেন?"

"তুই দেখি একটা গর্দভ। বুঝতে পারতাছস্ না—ধরা পাইড়্যা একেরে ঘাবড়াইয়ে গেছিল। না পারে গলা দিয়ে ঢুকাইতে, না পারে উগ্‌রাইতে—" বলে হেঁ হেঁ করে হাসে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল তখন চানে গেছে বাথরুমে, দিবাকরের অফিসের পিওন কনক এলো। একটা পার্শেল আর সিলমোহর করা খামখানা রমার হাতে তুলে দিয়ে বলে, "ম্যানেজার বাবু জানতে চেয়েছেন কটায় গাড়ী পাঠাতে হবে?" রমা জানিয়ে দিল যে গাড়ী লাগবে না কারণ তিনসুকিয়া থেকে গাড়ী নিয়ে তার দাদা এসেছেন। কনক চলে গেল।

পার্শেলটা শক্ত কার্ডবোর্ডের বাক্স, কাপড় দিয়ে সেলাই করে, গালা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে সিল করা। ওটা আপাততঃ থাক, খুলে দেখার সময়

অনেক পাবে। পার্শ্বেলটা আলমারিতে ঢুকিয়ে চিঠিখানা নিয়ে বসে রমা। খুলতেই হাতে এলো তার নামে দশহাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট। কোলকাতার ওপর, সঙ্গে চিঠি। ড্রাফটখানা সরিয়ে রেখে চিঠি পড়তে শুরু করে রমা।

"রুমা,—কোলকাতা যাবার জন্যে এতো ক্ষেপে গেছ তুমি যে উনিশে নভেম্বরের কথা মনেই ছিল না তোমার। দীপুর পরীক্ষা শেষ হবার পরই কোলকাতা যাবার গোঁ ধরলে তুমি। বাধা দেবার মত জোরও আমার ছিল না। বুঝতে পেরেছিলাম আমার কথার কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে। তবু ভয়ে ভয়ে রিটার্ন টিকিট কেটেছি যদি কখনও মত বদলায় তোমার।

এ কথা সত্যি—আমি প্রবঞ্চনা করেছি তোমায়। হঠাৎ এবং নেহাৎ ঝোঁকের বশে—অন্য কোন পথ চোখে পড়েনি বলেই। ইচ্ছে ছিল, সময় ও সুযোগ মত সব খুলে বলে তোমার মার্জনা চেয়ে নেব সে সুযোগ এলো না, সময়ও পেলাম না আমি। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এই প্রবঞ্চনা প্রকাশ হয়ে গেল। বড় ছোট হয়ে গেলাম, শুধু তোমার কাছেই নয়, নিজের কাছেও তোমার চোখে ও মুখে ঘৃণার যে সুতীক্ষ্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি সেদিন—তখনই বুঝেছি আমার কোন কথাই সহজে মেনে নিতে পারবে না তুমি।

আজ আমাদের বিয়ের দিন। প্রতি বৎসর এ দিনটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছি আমরা। এবারই তার ঘটলো ব্যত্যয়। আমাদের জীবনে এ দিনটি আর সেই ব্যঞ্জনা নিয়ে ফিরে আসবে না। শাড়ী ব্লাউজের সঙ্গে পাঠালুম হীরের কানের দুল। হয়ত এরপর আর কোনদিনও কিছু দেবার অধিকার থাকবে না আমার। ফিরিয়ে দেবে না এই শুধু অনুরোধ।

যেখানে, যে ভাবেই থাকো, টাকার প্রয়োজন হ'বে তোমার। আপাততঃ দশ হাজার টাকার ড্রাফটা পাঠালাম। পরে ধীরে ধীরে আরও পাঠাব। ব্যবসাতে টাকাগুলি আটকে আছে। চট করে তুলে নেওয়া যায় না। ব্যবসা গুটিয়ে টাকাগুলি উদ্ধার করতে কিছু সময় লাগবে। যা' কিছু করেছি সে তোমার নামের গুণেই সম্ভব হয়েছে। এ সব কিছুর ওপর তোমার ষোল আনা অধিকার। তারই প্রথম কিস্তি এই দশহাজার টাকা।

তুমি চলে যাচ্ছ। মর্মান্তিক হলেও, এই সত্য আমায় মেনে নিতেই হ'বে—যে আমার জীবন থেকে তুমি নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে কৃত সংকল্প। মনে প্রাণে তা না চাইলেও, তোমায় বিরক্ত করতেও

চাই না আমি। এই সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপন করেও যদি আমায় পরিপূর্ণ ভাবে না চিনে থাকো, তবে শুধু মুখের কথায় নিজের নির্দোষীতা প্রমাণ করার হীনতা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না, মেনে নেবও না কোনদিন। বিকৃত তথ্যে ভরা উড়ো চিঠিগুলি অবশেষে লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হয়েছে, এটাই হলো আসল ট্রাজেডি। একটা কথা শুধু মনে রেখো, নিজের বিশেষ কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে, যে এই চিঠিগুলি রচনা করেছে, আমাদের খুব কাছাকাছি থেকেই তা সে করেছে। একটু ভেবে দেখলে—তাকে চিনতে না পারার কোন কারণই থাকতে পারে না। আমার চেয়েও তোমার পক্ষে তাকে চিনে নেওয়া সহজসাধ্য। তোমার চরম ক্ষতিই তার একমাত্র লক্ষ্য। সাবধান হ'তে চেষ্টা করো।

যেখানে, যেভাবে, যার কাছেই থাকো—যে সম্পদ এতদিন ধরে আহরণ করেছি, তার উপর পূর্ণ অধিকার শুধু তোমার এবং আমাদের দীপুর। জীবনে কোনদিন অভাব অনুভব করতে হ'বে না তোমাদের। কোলকাতার বাড়ী দু'চার মাসের মধ্যেই শেষ হ'বে। দীপুকে নিয়ে আপন কর্তৃত্বে সেখানেই থাকতে পারবে তুমি। তোমার নামে কাগজপত্র করে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'বে।

তোমাকে প্রাণ ভরে ভালবেসেছি আজও বাসি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত তোমাকেই ভালবেসে যাব। এর কোন দায় তোমার উপর চাপাবার অভিসন্ধি আমার নেই। সুখী হও, শান্তি পাও এই শুধু আমার কামনা। তোমার ঘৃণা মাথায় নিয়ে বিদায় নিলাম আমি। ইতি –দিবাকর।"

জলে ভরে যায় দুচোখ। চিঠিখানা বুকে চেপে ধরে রমা। সাদামাটা এ চিঠিতে কারুকার্য্য নেই, নেই নিজের ত্রুটি স্বীকার করে করুণা ভিক্ষার প্রয়াস, নেই হা হুতাশ। বলিষ্ঠ প্রাঞ্জল এ চিঠির দিবাকরেরই উপযুক্ত।

খেয়ে দেয়ে দুপুরে বিছানায় একটু গড়াবেই প্রফুল্ল। গেষ্টরুম খুলে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। লেপমুড়ি দিয়ে প্রফুল্ল বলে—"তুইটায় ডাইক্যা দিবি আমায়। চা খাইয়া আড়াইটার মধ্যে রওনা হওন লাগব।"

"জানি, জানি। কর্মবীরদের জানতে বাকী আছে নাকি? ভয় নেই ঠিক সময়ে ডেকে দেব তোমায়।"

দীপুর পাশে শুয়ে রমা। এক নতুন দিগন্তের পরিচয় পেয়েছে সে। এত কথা সে জানতো না। জানলে কি কখনও দিবাকরকে ভুল বুঝতে পারতো? দিবাকর ঠিক কথাই বলেছে। অথচ, আশ্চর্য্যের কথা এই যে

ঘুর্ণাক্ষরেও কাজলকে সন্দেহ করতে পারেনি সে। কাজল তার মনের দুর্বলতা গোপন করেনি। সুবিধামত প্রকাশ করতে পিছিয়ে যায়নি। কিন্তু তার জন্যে এত চক্রান্ত, এত ষড়যন্ত্র করবে ভাবতেই পারে না সে। কি চেয়েছিল সে? শুধু দেহ সম্ভোগ? তার জন্যে এতো? না কি আরও কিছু? কণা রায় চিঠিতে তার সম্পদ ও সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার কথা জানালো কেন কাজলকে? কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছে কণা রায়? সে কি এই জন্যে যে, কণা রায়ের সঙ্গে তার সম্পদও ভোগ করতে চেয়েছিল কাজল? কিন্তু রমার সে সম্পদ কোথায়? তবে কি কাজল জানতো দিবাকরের সম্পদের কথা? চেয়েছিল শেখর রায়ের মতো দিবাকরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়ে সেই সম্পদের সঙ্গে রমাকে ভোগ করতে? কি সাংঘাতিক শয়তানী বুদ্ধি! আর সে এমনই বোকা, যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারেনি?"

চিন্তায় বাঁধা পড়লো। তখনও দুটো বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। রিং এর শব্দ শুনতে পেলো রমা। শুনেই বুঝেছে এটা ট্রাঙ্ককল। ছুটে গিয়ে রিসিভার তোলে। এক্সচেঞ্জ জানালো প্রফুল্ল তলাপাত্রের ফোন জোড়হাট থেকে। "উনি আছেন, একটু ধরুন"—বলে রিসিভার নাবিয়েই দেখে গেষ্টরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার ধরে মাউথ পিস্ হাত দিয়ে চেপে রমা বলে, "তাড়াতাড়ি এসো ফুলদা—নিশ্চয়ই ওর ফোন। মনে রেখো আমরা চলে গেছি। ভুলেও বলো না যে আমরা যাইনি। দোহাই ফুলদা, বোনের মুখ চেয়ে একটু মিথ্যেই না হয় বল্লে। বলবে তো?" বলতে বলতেই ভেসে আসে দিবাকরের কণ্ঠস্বর, "হ্যালো, হ্যালো প্রফুল্ল।" প্রফুল্ল ফোন তুলে রমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসে। পাশে দাঁড়িয়ে রিসিভারে কান ঠেকিয়ে দিবাকরের কথা শোনার চেষ্টা করে রমা। স্পষ্ট শোনা যায় না—কিন্তু প্রফুল্লের জবাব থেকেই দিবাকরের প্রশ্নগুলি সহজেই আঁচ করতে পারে।

"হ' হ' আমি প্রফুল্ল, প্রফুল্ল কইতাছি—"

"হ' অগো প্লেইনে উঠাইয়া দিয়ে—এই অখনই আইয়া নামছি"—রমার দিকে চেয়ে চোখ মটকায় প্রফুল্ল—।"

"কি কলি? কান্দাকাটি। করবোই তো। হাউ হাউ কইর‍্যা না—এই টপাটপ্ চক্ষের জল ফালাইছে আর কি।"

"না, না—জানাশুনা কাউরে তো দেখি নাই। খালি মাউরার পালই ছাখলাম।"

"না, কোন কথাবার্তা হয় নাই। সময় পাইলে তো? হেও কয় নাই আমিও না। শ্যাষ সময়ে কথা কইয়া কি অইব। হালা মক্রুল—তুই নিজেই তো গণ্ডগোল পাকাইছস্—।"

"কি কস্—পার্শেল? চিঠি? কে জানে—আমি দেখি নাই—"

"না, কিছু কইয়া যায় নাই—"

"হ, শোওনের ঘরে তালা ঝুলাইয়া গেছে। চাবি আমারে দিয়া গেছে। তর লাগে তো ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

"শুন্, আমি অকখনই থামু গা।' তুই তো জানস ব্যাপারডা। কাইল কথা অইব—"

"ঠিক আছে। রামলালরে কইয়া যামুনে! তুই কটায় আবি?"

"উঁহু, তইলে সাতটার আগে কেমনে রওনা হবি?"

"হ' হ' রাত সাড়ে নয় দশটা অইব। তর খাওন রাখন লাগব না? কস্ কি? রমার নিজে রাইন্ধ্যা বাইড়্যা থুইয়া গেছে। সুখেনরে কইয়া গেছে রাইত থাইকা তরে খাওয়াইতে। না খাইলে চল্‌ব কেন্?"

"হেই কামই করিস্ না। রমায় মনে কষ্ট পাইব। অত যত্ন কইর‍্যা তর লাইগ্যা রাইন্ধ্যা গেল—" বলে রমার দিকে চেয়ে আবার চোখ মটকায় প্রফুল্ল। আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল প্রফুল্ল। নিজের বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রফুল্ল। দিবাকরকে কেমন ঘায়েল করে ছেড়েছে এই উল্লাসে সে মত্ত।

চা ও খাবার খেয়ে একটু পরেই বেরিয়ে গেল প্রফুল্ল। তিনটেয় সুখেন ও বিমলা এসে কাজে লাগ্‌লো। সুখেনকে মাছ মাংস কেটে তৈরী রাখতে বলে দীপুকে নিয়ে মারকেটিং-এ বের হলো রমা। দিবাকরের জন্যে কিছু কিন্‌তে হবে। দিবাকরের জন্য বাজারের সেরা ধুতি, তুধ গরদ, সাদা স্যাণ্ডেল, সাদা কাশ্মিরী শাল কিন্‌লো। দীপুর জন্যে সুট্, জুতো মোজা কেনা হলো। জুয়েলারের দোকান থেকে কিন্‌লো পোখরাজ বসান আংটি।

আজ নিজেই রান্না করবে সে। দিবাকর যা খেতে ভালবাসে তাই রাঁধলো রমা যত্নের সঙ্গে। সুখেন পাশে বসে সাহায্য করলো। সাড়ে আটটায় দীপুর খাওয়া হয়ে গেল। নটার মধ্যে নিজে খেয়ে রমা ও দিবাকরের খাবার হট্‌কেরিয়ারে ভরে টেবিল সাজিয়ে সুখেন বাড়ী চলে গেল।

দীপু আজ কিছুতেই ঘুমোবে না। বাপীর জন্য অপেক্ষা করবে সে।

অগত্যা মশারী খাটিয়ে ওকে বিছানায় বসিয়ে বাগাটেলী পেড়ে এনে বলে, "কি করবি? বাগাটেলী খেল্‌বি না ছবির বই দেখবি?" ও বাগাটেলীই খেল্‌বে। বেশ তাই সই। নিশ্চিন্ত হয়ে মশারীর নীচে ফাইলখানা নিয়ে বসে রমা। প্রথম দিকে একটা চিঠি নজরে এলো। গত অগাস্টের চিঠি। দিদি লিখেছেন—'তোমার সফলতায় গর্ব বোধ না করে পারলুম না। ধন্য তুমি। তোমার প্রতিজ্ঞা আজ সফল। রমা ভাগ্যবতী। এমন একনিষ্ঠ স্বামী যার তার চেয়ে ভাগ্যবতী আর কে আছে এ সংসারে? তোমাদের মঙ্গল হোক।

লিখেছ, আসামের ব্যবসা গুটাতে শুরু করেছ। এখানে এসে নতুন ধরনের ইণ্ডাস্ট্রি চালু করার পরিকল্পনা অনেক দূর এগিয়েছে। তোমার দাদা ও দিনান্তকেও এতে সামিল করতে চাও তুমি। শুনে ভাল লাগ্‌লো। এই দরাজ মন তোমারই উপযুক্ত। তোমার দাদাও মহাখুশী কিন্তু ক ধরনের ইণ্ডাস্ট্রি তুমি খুলে বলোনি। তোমার দাদা সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাতে বলেছেন। তাড়াতাড়ি জানিয়ো। উনি নিজে এতে জড়াতে চান না। তুমি আর দিনান্ত মিলে এটা কর, তাই তাঁর ইচ্ছে। উনি বাইরে থেকে তাঁর ক্ষমতা এবং প্রভাব খাটিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে চান। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সব রকম সুবিধা তিনি করে দেবেন।

তুমি যে চুপচাপ কোলকাতায় বাড়ী তৈরী শেষ করে এনেছ, তা তো জান্‌তান না। লিখেছ সবাই মিলে এ বাড়ীতে আমরা থাক্‌বো। কি যে আনন্দ হ'চ্ছে বলে বোঝাতে পারবো না। সত্যি রমারই জয় জয়কার। তুমি প্রমাণ করেছ অলক্ষ্মী নয় এ সংসারের লক্ষ্মী হয়েই সে এসেছিল। দুঃখের বিষয় মাসিমা এখন ইহ জগতে নেই। দেশের বাড়ীতে যে সম্পদ ও বৈভব সঞ্চয় হয়েছিল বংশ পরম্পরা, রমার প্রসাদে, তোমার একক প্রচেষ্টায় তোমার অর্জিত সম্পদ তার দ্বিগুণের বেশী।

লিখেছ, রমাকে এখন এ বিষয়ে কিছু না জানাতে। কেন ভাই? চমক্‌ দিতে চাও তাই, না? ঠিক আছে তোমার অনুরোধের মর্য্যাদা অবশ্যই রাখবো। তাকে আলাদা চিঠি দিচ্ছি। তোমরা দেবাদেবী আমার প্রাণ-ভরা আশীর্বাদ গ্রহণ করো। দীপু সোনাকে আদর জানাচ্ছি। ইতি—' তোমাদের বৌদি।"

গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে বসে রমা। তাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে দিবাবর শুধু সেই তা জান্‌তে পারেনি। দিবাকর জান্‌তে

দিতে চায় না—যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণ ভাবে সফল হচ্ছে। এটা কি ঠিক হয়েছে ? এই সব ব্যাপার জানা না থাকার জন্যেই এত কাণ্ড কারখানা ঘটে গেল, তা না হলে সাধ্য কি ছিল, কমলাদি, প্রশান্ত এবং সেই তারক সরকারের কার্যত বলে কাজলের বক্তব্য কোন ছাপ ফেলে তার মনে। যাক বাবা বিপদ তো কেটেছে এখন ভালয় ভালয় দিবাকর ফিরে এলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌বে রমা।

*　　*　　*

জোড়হাট এবং কোহিমাতে গিয়েও বিষয়ের নিস্পত্তি হয়নি। হিসাবের নানা গোলমালের জট ছাড়ানো, তুদিনের ব্যাপার নয়। নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার কথা যখন ভাব্‌ছে, ঠিক তখন কোহিমার ডেপুটি কমিশনার মিঃ দেব ফোনে জানালেন যে উনিশ তারিখ সন্ধ্যায় নেফার এড্‌ভাইজার টু দি গভর্নর আসাম মিঃ নাগ এবং সিজিওর একাউন্টস্‌ অফিসার মিঃ সেন, মোক্‌কচাঙের পথে বিকেলে জোড়হাট পৌঁছুবেন। মিঃ দেব নিজেও উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং সেদিন সন্ধ্যায় জোড়হাট সার্কিট হাউসে এলে ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধান হ'তে পারে।

উনিশ তারিখ প্লেন ছাড়ার আগে ডিব্রুগড় ফিরে আসার প্রশ্নই ওঠে না। এ যেনো শাপে বর হলো। চোখের সাম্‌নে রমা কোন কথা না বলে প্লেনে উঠে চলে যাবে—কি করে সহ্য করবে সে ? তুটোর একটু আগে ফোনে যোগাযোগ করে জান্‌তে পারলো ওরা চলে গেছে। ফোন করার আগেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল রমা হয়ত যাত্রা বাতিল করবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়াতে মুষড়ে পড়ে দিবাকর। রাত্রে সে ফিরে যাবে, এখানে বসে থাকার কোন মানে হয় না। কিন্তু গিয়ে কি দেখ্‌বে ? শূন্য ঘরের সর্বত্র রমার অসংখ্য স্মৃতি—শুধু মানুষটাই নেই। এ কথা তো মিথ্যে নয়, নাগা হিল্‌সের পরিবহন দপ্তরে আটকে পড়া পঞ্চাশ হাজার টাকা কখনই ওজনে রমার চেয়ে ভারী নয়। কিন্তু কি করবে সে ? রমার মনের পরিবর্তন হয়েছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস মনে পুষে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। কোন যুক্তির ধার ধারবার মত মনের অবস্থা রমা যেন একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। আর কিছু নয় শুধু সেই জাল চিঠির জন্য সে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না রমার দিকে। কী তুর্গতি যে হয়েছিল তার সেদিন।

কাগজপত্র গুছিয়ে ঠিক সময়েই সার্কিট হাউসে গিয়ে ছিল দিবাকর। কিন্তু তখন একটা গোপন কন্‌ফারেন্স চল্‌ছিল বলে অপেক্ষা করতে হলো

তাকে। সোয়া সাতটায় মিঃ দেবের সৌজন্যে মিঃ নাগ ও সেনের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। কাগজপত্র এবং হিসাবপত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মিঃ সেন বল্লেন—আগামী সপ্তাহে এ গুলি নিয়ে শিলং-এ গেলে সুবিধা হতো। যত শিগ্‌গীর সম্ভব গোলমাল মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন তিনি। মিঃ নাগও আশ্বাস দিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে মিঃ দেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে যখন এলো তখন রাত পোনে নটা। ট্যাক্সি যোগাড় করে সাড়ে নটার আগে জোড়হাট হ'তে বেরোনো সম্ভব হলো না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসে আছে দিবাকর। রমা—রমা—রমা—সরামন জুড়ে শুধু রমা। কেন তাকে ভুল বুঝলো রমা? লুকোচুরি করতে বাধ্য সে হয়েছিল, শুধু শুধু রমাকে উত্যক্ত না করার জন্যেই। জানে সে অপর্ণাদের ভাল চোখে রমা দেখে না। কেন যে এই বিরূপতা বুঝতে পারে দিবাকর। এই অসহায় নিঃস্ব পরিবার তারই মুখ চেয়ে থাকে। ওদের সে অবহেলা করতে পারে না। অপর্ণা বয়ে গেছে তাই বিয়ে দিয়ে ওকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই ছিল দিবাকরের উদ্দেশ্য। অপর্ণার বিয়ে হয়ে গেলে এ পরিবারের সমস্যা মোটামুটি মিটে যাবে, শুধু এই আশাতেই অন্যায় হলেও কিছু লুকোচুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। ভুল হলো চিঠি জাল করা, কিন্তু তাও কাটিয়ে ওঠা যেত। আসল ত্রুটি হলো রমার দেওয়া চিঠির রসিদখানা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট না করা। হাতে নাতে ধরা পড়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠ্‌লো চরম পরিণতির পথে।

কিন্তু এ ছাড়াও রমার বিরূপতার কি কোন কারণ ছিল না? ফেরীঘাটে অনেক কথাই বলেছিল অপর্ণা। নিজের অধঃপতিত জীবনে সেই পাঞ্জাবী ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে রমার ফটো নিয়ে যে নির্লজ্জ কথাবার্তা বলেছিল কাজল—সবই বলেছে অপর্ণা। শাপমোচনে রমার পাশে বসে কাজলের হাবভাব দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল অপর্ণা, অথচ আশ্চর্য্য এসব কিছুই তার চোখে পড়েনি। এ শুধু অপর্ণা কেন, নিখিলও তো শোর পরে এই ধরনের উক্তি করেছিল। রমাই কথাটা অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল—স্পষ্ট মনে পড়ে দিবাকরের। কেন রমা এমন করলো? ওর মনেও কি তবে দুর্বলতা ছিল! সন্ধ্যার অন্ধকারে জানালা দিয়ে যা দেখেছিল অপর্ণা সে কথাও তো সে বলেছে তাকে। অপর্ণার বক্তব্যে রমা সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু রমা কি একেবারেই নির্দোষ? শুনলে

ব্যথা পাবে ভেবে কি অপর্ণা কিছু গোপন করেনি? যদি রমার মনে কোন দুর্বলতা না থেকে থাকে তবে কাজলকে এত আস্কারা দিল কেন? এত সাহস পায় কি করে কাজল? রমা তো স্বভাবতঃ সংযত ও রক্ষণশীল বলেই সে জানে। কিন্তু সে সংযম এবং রক্ষণশীলতা তখন কোথায় ছিল? তাছাড়া কলিতার ফোনের ব্যাপারে রমা ও কাজলের অপরাধীভাব. লুকিয়ে চোখাচোখি এর কি কোন অর্থ নেই? ডিগবয় থেকে সারাটা পথ. সবার দৃষ্টির আড়ালে পাশাপাশি বসে এলো দুজনে। "ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা" তীব্র ঘৃণায় রমার ছিটকে সরে যাওয়া, দীপুকে নিয়ে গেস্টরুমে গিয়ে শোবার ইচ্ছা, গাড়ী থেকে নেবে নির্বাক কাজলের ঠাওায় দাঁড়িয়ে থাকা—এসব ঘটনার কি কোন মানে নেই?

উড়ো চিঠিগুলি নিয়ে মাতামাতি করার প্রবণতা তো ডিগবয় যাবার আগে রমার ছিল না। ডিগবয় থেকে ফেরার পরই চিঠিগুলি নিয়ে মাতামাতি শুরু হলো কেন? কাজলের সুদর্শন চেহারা, মন ভুলানো কথা বার্তায় কি আকৃষ্ট হয়নি রমা?

যত ভাবে, ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে দিবাকর। কি চায় রমা? ডিভোর্স? যদি তাই চায়? তবে কি নিয়ে থাকবে সে? তার অপরাধ? ঐ উড়ো চিঠিগুলির বক্তব্য? শুধু বিকৃত তথ্য ও ইঙ্গিত ছাড়া আর কি আছে ওগুলিতে? ঐ চিঠিগুলি আর মরানের চিঠি জাল করা এতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে সে রমার প্রেমের অনুপযুক্ত? অথচ সে তো শুধু স্বপ্ন দেখেনি, করেনি অলস কল্পলোকে বাস। ধীরস্থির গতিতে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সে আজ প্রতিষ্ঠার পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এর পেছনে একমাত্র প্রেরণা যুগিয়েছে রমা আর রমার প্রতি তার প্রেম। সেই রমা এবার তাকে ছেড়ে চলে যাবে কি কাজলের ঘর করতে? এ জ্বালা সে সহ্য করবে কেমন করে? সে কি তবে হেরে গেল—বাকপটু, সঙ্গীতশিল্পী সুদর্শন কাজলের কাছে?' ইনিয়ে বিনিয়ে সে কথা বলতে জানে না। সঙ্গীত ভালবাসলেও গলা দিয়ে কোনদিন সুর বার হবে না তার। আর সৌন্দর্য্য? পুরুষের সৌন্দর্য যদি কাটাকাটা নাক, মুখ, চোখেই থেকে থাকে, তবে সে কখনই সুন্দর নয়। এ ছাড়া বয়সের তফাৎ তো রয়েছেই। সুন্দরের প্রতি পক্ষপাত তো জগৎ জুড়ে। রমার কাছেও কি তাই? দীর্ঘ বারো তেরো বছর এক সঙ্গে বাস করার পর আজ সে এতো তুচ্ছ হয়ে গেল, যে সব ছেড়ে চলে যেতে বাঁধলো না রমার?

তীব্র জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে দিবাকর। রক্তচড়ে যায় মাথায়। মনে হয় এই মুহূর্তে হাতের ধারে পেলে চোয়াল আল্‌গা করে দেবে কাজলের। মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে ওঠে হাত নিজের অগোচরেই।

গাড়ী খোয়াং ব্রীজ' পার হলো। আর মাত্র আঠেরো মাইল পথ। প্রশস্ত মসৃণ পথ। গাড়ী তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। মাইল মিটারের কাঁটা পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মধ্যে কাঁপছে। এগারোটা। আর কতক্ষণ? কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ মিনিট! আর তার পরই রমার অসংখ্য স্মৃতি,—রমার গায়ের মিষ্টি গন্ধে ভরা শূণ্য মন্দিরে প্রবেশ করবে সে। উঃ অসহ্য।

না, কাজল তা'হলে সঙ্গে যায়নি। ও কি আর এখানে থাক্‌বে? যাবে সে শিগ্‌গীরই। যাক আপাততঃ ডিব্রুগড়েই আসে সে। কাল পাখী-ডাকা ভোরেই কাজলের সঙ্গে হবে মোলাকাৎ। হ্যাঁঃ নিশ্চয়ই। কারণ সে জানে আজকের এই দুভার্গ্য কাজলের কীর্তি। কিন্তু কালকের জন্য অপেক্ষা কেন? আজ রাত্রেই তা ঘটবে। দেরী সইছে না দিবাকরের উত্তেজনায় নিজেই নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে দিবাকর। রক্তের নোনা স্বাদে ভরে ওঠে তার মুখ।

ঐ ডিব্রুগড় পৌঁছে গেল গাড়ী। আমলাপট্টি পেরিয়ে গেল। ঐ তো রেলষ্টেশন। গাড়ী তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে। থানার সাম্‌নের চৌমাথা পেরিয়ে গাড়ী খলিয়ামারীর রাস্তা ধরে চলেছে। গাড়ীর গতি কিছুটা শ্লথ। 'কুয়ার পার' এসে বাঁয়ে মোড় নিল গাড়ী। কালভার্টও এসে গেল। কিন্তু এ কী? বাড়ীর বাইরের আলো শুধু শুধু জ্বলছে কেন? গ্রীলের দরজাও হাট করে খোলা। কি ব্যাপার? রামলালই বা কোথায়? গাঁজায়-দম দিয়ে পড়ে আছে নাকি কোথাও! কিন্তু নেশা-ভাঙ যাই করুক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে সে তো পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়! তবে?

ট্যাক্সির হেল্‌পার ওর হোট হোল্ড অল ও ব্যাগ নিয়ে বাড়ীর বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে এলো। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে গেট বন্ধ করে সিমেন্ট বাঁধানো পথে গ্রীলের দরজার দিকে শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহভার টেনেহিঁচড়ে এগিয়ে আসে দিবাকর। রমা-বিহীন এ বাড়ীতে এখন কি আর আকর্ষণ অবশিষ্ট আছে? ক্ষণেকের জন্যে থমকে দাঁড়ায় দিবাকর। একটু বাঁ দিকে হেলে কাজলদের ডেরায় নজর দেয়। অন্ধকার! ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত মুখে হিংস্র হাসি ফুটে ওঠে তার। 'কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো কাজল-আমি আস্‌ছি তোমার সঙ্গে হিসেব নিকেশ আজ রাত্রেই'—মনে মনে উচ্চারণ করে কথাগুলি দিবাকর।

বাগাটেলী খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে দীপু। ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মধুর হাসি হেসে এগিয়ে আসে রমা। শুইয়ে দিয়ে, লেপ টেনে, মশারী গুঁজে বিছানা থেকে নেবে আসে রমা।

পার্শেলটা খোলে। নীলাভ বালুচরী শাড়ীখানা বার করে ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে দেখে। হ্যাঁ, পছন্দ আছে বটে দিবাকরের। মনের মত জিনিস আনতে ওস্তাদ দুষ্টুটা। শাড়িটা কাঁধে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই মুখ ভেঙায় রমা।

হীরের দুল কানে পরে, গলায় গতবারের জড়োয়া নেকলেস পরে আয়নার সামনে বসে প্রসাধনে। সাজবে, প্রাণভরে আজ সাজবে সে। দয়িতের জন্যে নিজেকে মোহনীয় করে তুলবে আজ। এতদিনের পর সীমন্ত জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে সিঁদুরের ছটায়। কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে জ্বলে ওঠে গভীর রক্তলাল টিপ্। সায়া ব্রা বদলে-ব্লাউজখানা পরে। বালুচরী শাড়ী জড়িয়ে ঠাকুর ঘরে ঢোকে রমা। প্রদীপ উস্কে, ধূপকাঠি জ্বেলে ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করে। আজ তার নবজীবন শুরু হলো। সব পাপ সব মোহ ঘুরিয়ে নতুন সাজে সেজে ওঠে রমা।

ঘড়ির কাঁটা সাড়ে দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। দিবাকর এসে পড়লো বলে। পুজোর ঘরে ভিজে কাপড় জড়ানো মালা দুটো পেতলের থালায় রাখা আছে ঠাকুরের সামনে। নতুন করে মালা বদল হবে আজ। আনন্দ পুলকের শিহরণ সর্বাঙ্গে খেলে যায় তার।

ঘরের জোরালো আলো নিভিয়ে মৃদু নীল আলো জ্বেলে দিয়ে, জানালার পর্দা সরিয়ে কাঁচের জানালা একটুকু ফাঁক করে রাস্তার দিকে দিকে চেয়ে থাকে সে। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করে গাড়ীর শব্দ। কাছাকাছি এসে পড়েছে দিবাকর। এখন আর ঘন্টা নয়। মিনিটের প্রশ্ন। কিন্তু মিনিটগুলি যেন ভীষণ লম্বা হয়ে গেছে। সময় কাটতে চায় না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যার মানে হলো প্রতীক্ষিত কেটলীর জল কখনও ফুটে না। তাই হয়েছে এখন।

শীতের রাত। সারা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু অনেক দূরে হঠাৎ একটা দুটো ভারী মটরট্রাকের গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে, অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে আবার অস্পষ্টতায় মিলিয়ে যাচ্ছে নিবিড় নীরবতার মধ্যে।

দেয়াল ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বেজে গেল। চমকে ওঠে রমা। এত দেরী হচ্ছে কেন? জোড়হাট থেকে আটটাও যদি রওনা হয়, তবু সাড়ে দশটার মধ্যে না পৌছানোর কথা নয়। চুরাশি মাইল পথ খোলা

রাস্তায় আড়াই ঘণ্টা কেন দু ঘণ্টাও পার হওয়া যায়। ফুলদা তো তাই বলে গেল। তবে? কেন এত দেরী হ'চ্ছে? ভয়ে উৎকণ্ঠায় ওষ্ঠাগত প্রাণ রমার, ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ধরে থাকতে পারছে না। বারান্দায় এসে গ্রীলের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় রমা।

মিনিট তো নয় যেন এক এক ঘণ্টা পার হ'চ্ছে। অসহায় রমা উৎকণ্ঠ দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে চেয়ে থাকে আর কতক্ষণ দেরী করবে দিবাকর? কেন দেরী করছে সে? তবে কি দিবাকর জোড়হাটেই থেকে যাওয়া স্থির করেছে? তা হলে? কি ফল হলো এতো মাতামাতির? এত সাজ-সজ্জার? এই রাত্রি কি বিফলে যাবে? অস্থির হয়ে ওঠে রমা। গ্রীলের দরজা খুলে গেটে এসে দাঁড়াল রমা।

গায়ে গরম শাল তবু হি হি করে কাঁপছে সে। সে কি শুধু শীতের জন্য? ঐ তো সাড়ে এগারটার ঘণ্টা পড়লো। মনের মধ্যে ভীতি বাসা বেঁধেছে। স্তব্ধ হয়ে আসে নিঃশ্বাস। কোন বিপদ ঘটেনি তো? ঠাকুরকে স্মরণ করে বলে, "রক্ষে করো ঠাকুর, রক্ষে করো তাকে। ভালয় ভালয় পৌঁছে দাও আমার কাছে। কথা দিচ্ছি এতদিন ধরে অহরহ যা চেয়ে এসেছে সে, তাই দিব তাকে সানন্দে—একটি মেয়ে।" আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রমা। বারে বারে কপালে হাত ঠেকায় সে নমস্কারের ভঙ্গীতে।

হঠাৎ যেন আশার আলো জ্বলে ওঠে। দূরে একটা গাড়ীর ক্ষীণ শব্দ কানে বাজে। ভারী ট্রাকের শব্দ নয়। নিশ্চয়ই গাড়ী ট্যাক্সি। "হে ঠাকুর নিরাশ করো না। এই গাড়ীতে ওকে এনে দাও। আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে সুযোগ দাও। ওর পায়ে লুটিয়ে পড়তে দাও।" আকুল প্রার্থনায় মন একাগ্র করে রমা।

গাড়ীটা ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ঐ যে দূরে বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ীর হেড লাইটের আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হ'চ্ছে। ঐ গাড়ীতেই সে নিশ্চয়ই আসছে। হ্যাঁ, সে আসছে, সে আসছে, মন্ত্রোচ্চারণের মত বারবার উচ্চারণ করে রমা। ঠিক্ ঠিক্ সেই আসছে। এসে গেছে সে। গাড়ীটা মোড় ঘুরে এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছে। বন্য হরিনীর মত উল্লাসে, ত্রস্তে ছুটে এলো রমা গ্রীলের আড়ালে। গেটের উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে আমগাছের গায়ে পড়েছে গাড়ীর হেড লাইটের আলো। কালভার্টের কাছে এসে গেল প্রায়। গাড়ীর গতি এবার কমে আসছে। গেটের সাম্‌নে থাম্‌তে হ'বে তো? হাসিতে ভরে ওঠে রমার মুখ। বাইরের আলোর সুইচ টিপে বসার ঘরের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ায়

রমা। সারা দেহে রক্তের জোয়ার, উজান বইছে। আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় সারা দেহ প্রাণ জুড়ে। গাড়ীটা এসে গেটে দাঁড়াল। ঐ তো দিবাকর নামছে। উঃ কি আনন্দ। থর থর করে কেঁপে উঠ্ছে রমার দেহ।

পেছনের ক্যারিয়ার থেকে হোল্ড-অল্ ও ব্যাগ বার করে একটা লোক গেট খুলে ঢুকছে। দিবাকরের হোল্ড-অল, দিবাকরের ব্যাগ বারান্দায় নাবিয়ে রেখে চলে গেল লোকটি। গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছে দিবাকর। "দেরী করো না দিবাকর। শিগ্গীর এসো। আমি আর নিজেকে ধরে রাখ্তে পারছি না। আমার সমস্ত শরীর ভীষণ কাঁপছে—" মনে মনে বলে রমা। গাড়ীটা চলে গেল। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেট বন্ধ করলো দিবাকর। একটু থেকে এদিক ওদিক কি যেন দেখ্লো। কি যেন ভাব্ছে দিবাকর। "এটুকুতেই অবাক হয়ো না দিবাকর। অবাক হবার আরও কিছু রয়েছে এখানে। চলে এসো শিগ্গীর, দেরী করো না।" পা টেনে টেনে এগোচ্ছে দিবাকর। কেমন জানি নিৰ্জ্জীব, নিস্তেজ দিবাকর। "আহা বেচারী।"

বারান্দায় উঠে গ্রীলের দরজা বন্ধ করে দিবাকর। একবার যেন নাম ধরে ডাক্লো রামলালকে ক্ষীণ কণ্ঠে। বাইরের আলো নিভে গেল। অন্ধকার সব অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু। চকিতে সরে এসে শোবার ঘরের দরজার পর্দার আড়ালে চৌকাঠ ধরে দাঁড়ায় রমা। এখানে আলো আছে, স্নিগ্ধ মৃদু নীল আলো, আর আছে উষ্ণতা।

বাইরের ঘরের আলো জ্বলে উঠ্লো। টেনে হিচঁড়ে হোল্ড-অল আর ব্যাগ দুটো বস্বার ঘরে এনে একটু যেন হাঁপায় দিবাকর। অস্ফুটস্বরে কিছু যেন বলে সে। গ্রীল আর বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে, খাবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় দিবাকর। খাবার ঘরের কম পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে গেষ্টরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়ায় দিবাকর। এ কি শোবার ঘরের তালা দিয়ে এ ঘর বন্ধ করলো কে? চম্‌কে পেছন ফিরে তাকায়। তাইতো শোবার ঘর খোলা কেন? তবে কি রামলাল ওঘরে? কি করছে। ওখানে সে? চাবি পেলো কোথায়। প্রফুল্ল দিয়ে গেছে। সে তো চাবি নিয়ে চলে যাবার কথা। রামলালকে দেবে কেন। হঠাৎ যেন জেগে ওঠে দিবাকর, ঘুম ভেঙ্গে সজাগ হয়ে। ঝট্‌পট্ খাবার ঘরের সব কটা আলো জ্বেলে দেয়। আলোয় আলোময় চারধার। আর তখনই তার চোখে পড়ে শোবার ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রমা।

শুধু মাত্র এক লহমা। অবাক বিস্ময়ে রমার দিকে চেয়ে থাকে দিবাকর।

তারপরেই দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে ছুটে আসে রমার দিকে। আর দাঁড়ায় না রমা। চৌকাঠ ছেড়ে, পর্দার আড়াল ছেড়ে সেও ছুটে চলেছে দিবাকরের দিকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ে রমা দিবাকরের বিশাল বক্ষে। নিজেকে ভেঙ্গে-চূরে মিশিয়ে দিতে চাই দিবাকরের দেহের মধ্যে। দু'হাতে নিজের বুকে রমাকে চেপে ধরে, দুল্‌তে দুল্‌তে প্রলাপের মত বলে চলে দিবাকর—"আমি জান্‌তাম আমি জানতাম—ঠিক জান্‌তাম, আমার রুমি, আমায় ছেড়ে যাবে না—কোনদিন যেতে পারে না—" উন্মাদের মত রমার গালে, মুখে, ঠোঁটে, চোখে—চুম্‌ খেতে থাকে, গাল ঘষতে থাকে। দীর্ঘ দিনের অবরুদ্ধ চেতনা প্রাণ পেয়ে আগল-হারা বর্ষার প্লাবনের মত বয়ে চলেছে।

দুহাত দিয়ে সজোরে গলা জড়িয়ে ধরে দিবাকরের বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে ওঠে রমা। দুঃখের কান্না নয়—সুখের কান্না, আনন্দের কান্না। কান্না ভেজা তার অস্ফুট স্বর ভেসে আসে—"তোমায় ছেড়ে যেতে পারি না যে আমি—তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি না আমি। আমায় ক্ষমা করো তুমি—আমায় ভালবাসো তুমি! তোমার বুকে আরও জোরে চেপে ধরে ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে ফেলো আমায় তোমার মধ্যে।"

আমাদের অন্যান্য বই

অমরনাথের অমর কাহিনী—কানাইলাল চক্রবর্তী

জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান—বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত

বিক্রমাদিত্য ও বেতালের গল্প কথা—সুশীলকুমার দাসগুপ্ত

জীবজগতের বিস্ময়—ডঃ অরুণ চট্টোপাধ্যায়

ভিন গ্রহে মানুষ গোয়েন্দা—সুনির্মল রায়

সংখ্যা দিয়ে ভাগ্য বলা—সুনির্মল রায়

পারমাণবিক বোমা বনাম প্রফেসর সাম—রঞ্জিত সিংহ

পঞ্চতন্ত্রের গল্প—নীলকণ্ঠ

উত্তর বঙ্গের পথে পথে—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য